মহাত্মা গান্ধী

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

মহাত্মা গান্ধী

প্রথম প্রকাশ : ২রা অক্টোবর ১৯৬৩
মুদ্রণ-সংখ্যা : ৩৩০০

প্রকাশক : শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি, বা
১৪ রিভারসাইড রোড,
ব্যারাকপুর (২৪-পরগণা)

কলিকাতা শাখা :
প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলা
১২ডি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীঅমিত সরকার
আলোক-চিত্রশিল্পী : শ্রীমনুজ দাশ

মূল্য : ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)
৫·৫০ (সাধারণ বাঁধাই)

মুদ্রক : শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১।১ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যার ঐকান্তিক আগ্রহে এবং দৈনন্দিন তাগিদে এই পুস্তক লিখতে আরম্ভ করি আমার সেই মা কল্যাণীয়া সাধনাকে,—মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা চিরদিন তাকে অনুপ্রাণিত করবে এই আশায়।

গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলার প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ
গীতাবোধ
নারী ও সামাজিক অবিচার
পল্লী-পুনর্গঠন
সত্যই ভগবান
কর্মের সন্ধান
পঞ্চায়েত রাজ
সর্বোদয়

সূচীপত্র



মহাত্মা গান্ধী

ভূমিকা

মহাত্মা গান্ধীর জীবনী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী মাত্র নয়। আধুনিক ভারতবর্ষের এক যুগের রাজনৈতিক ও সমগ্র ইতিহাস এবং একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের কতকাংশে সার্থক প্রয়োগ। তার সঙ্গে জড়িত বহুলোকের কার্যকলাপ। তার সবটা উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। কতকটা বিপজ্জনকও। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মাজী নিজেই আমাকে বললেন, "সমসাময়িক ইতিহাস লেখা কঠিন। আমার আত্মজীবনী লিখতে লিখতে যখন ১৯২১ সালে এলাম তখন আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল 'মূর্খ কি করছ'। অমনি আমার কলম আপনিই থেমে গেল।" আর যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, প্রত্যেক ঘটনার ও লোকের কার্যাবলীর আলোচনার মধ্যে লেখকের মন প্রতিফলিত হতে বাধ্য। জিনিসের সৌন্দর্য দ্রষ্টার চক্ষু ও মনের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। আমার নিজের দুর্বলতা বা একদেশদর্শিতার জন্যও অনেক ভুল করতে পারি, কারো উপর অবিচারও করতে পারি। অতএব যথাসম্ভব বাদ দিয়ে চলব অন্য সকলের সম্বন্ধে বিতর্কমূলক বিষয় সমূহ। সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, ইতিহাস নিতান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মহাত্মাজীর জীবনীও যথাযথ ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব হবে। মহাত্মাজীকে আমি যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি এ পুস্তক তারই অভিব্যক্তি মাত্র।

মহাত্মাজী ছাত্র হিসাবে খুব কৃতী ছিলেন বলা চলে না। ছেলে বেলায় ছিলেন ভীরু। প্রথম জীবনে তাঁর চরিত্রে সাধারণ মানুষের দুর্বলতাও ছিল। তিনি লাজুক ছিলেন খুবই। বক্তৃতা দিতে পারতেন না। এমনকি ব্যারিস্টার হয়ে আসার পরও প্রথম বক্তৃতা দিতে উঠে পা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন। পরবর্তী কালের

গান্ধীকে দেখে কে বলতে পারেন পূর্বে তিনি অমনটি ছিলেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহেই তা সম্ভবপর হয়েছে।

তাঁর জন্ম বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের এক বৈষ্ণব পরিবারে। এই সম্প্রদায়ের মূল কথা ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন পরম পদ লাভ সম্ভবপর নয়। তাই একে 'পুষ্টিমার্গ'ও বলে। ভগবানের অনুগ্রহে পুষ্ট পথ বা পুষ্টিমার্গ। উপনিষদের নিম্নশ্লোক এই পথাবলম্বীদের মূল কথা :—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'

আত্মা প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ হয় না, মেধা বা বহু শাস্ত্র পাঠের দ্বারাও হয় না, এই আত্মা বা পুরুষ যাকে বরণ করে বা যার উপর অনুগ্রহ করে তার দ্বারাই লাভ হয়। মহাত্মাজীর নিজের মতও ছিল এই যে, ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন কিছু সম্ভবপর নয়।

এই অনুগ্রহ লাভ করেই 'মূক হয়ে উঠলেন বাচাল', ভীরু হয়ে উঠলেন তেজস্বী; দেখলাম পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন। অবশ্য এজন্য তাঁকে করতে হয়েছিল কঠোর তপস্যা। আগুনে পুড়েই খাঁটি সোনা করেছিলেন তাঁকে ভগবান। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী। এই সত্যের সেবা তাঁকে দিয়েছিল ভগবানের অনুগ্রহ। 'সত্যেন হি লভ্যঃ' উপনিষদের এই বাক্য সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবনে। সমস্ত জীবনটাই তাঁর সত্যের প্রয়োগ।

মহাত্মাজী ছিলেন পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবচূড়ামণি বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে বৈষ্ণবরা অধিকাংশ হয় কৃষ্ণভক্ত নয় ত রাম-উপাসক। তাঁর পরিবারের উপাস্য ছিল শ্রীনাথজী বা শ্রীকৃষ্ণ। ১৯৫৭ সালে রাজকোটে তাঁর দিদির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঘরে দেখি শ্রীনাথজীর ছবি। মহাত্মাজীর প্রিয় গান ছিল ভক্তকবি নরসিংহ মেহতার "বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে…।" নরসিংহ মেহতা ছিলেন

কৃষ্ণভক্ত। অবশ্য এই গানে রামনামের কথাই আছে। এত দীর্ঘকালের পরিচিতির মধ্যে মহাত্মাজীর মুখে 'কৃষ্ণনাম' কখনও শুনি নি, কেউ শুনেছেন বলেও জানি না। রামনাম ছিল তাঁর মুখে ও অন্তরে সর্বদা। এই রামনাম মুখে নিয়েই হয় তাঁর জীবন অবসান। এর কারণ কি সঠিক বলা শক্ত, আজ শুধু অনুমানই করতে পারা যায়। এ প্রশ্ন যখন মনে এল তখন আর তিনি আমাদের মধ্যে নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আর উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।

মহাত্মাজী ছিলেন পরম ভগবদ্‌বিশ্বাসী। বহুবার তাঁকে বলতে শুনেছি, "ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটি পাতাও পড়ে না।" এই নির্ভরতা যুগিয়েছে তাঁকে শক্তি। এই তাঁর শক্তির উৎস। সকল সত্য ও অহিংসার পূজারীর ইহাই একমাত্র উৎস বলে তিনি মনে করতেন। তাই ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিজ্ঞাপত্রের মুসবিদার শুরুতেই তিনি লিখেছিলেন—"ভগবানের নামে আমি এই শপথ করছি।" আমরা অনেকে তখন এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে করেছিলাম বিরোধিতা। কিন্তু তিনি ছিলেন এ বিষয়ে অচল, অটল। বেশ কিছুদিন পরে উপলব্ধি করি এর তাৎপর্য। একমাত্র ভারতবর্ষেই একজন উঁচুদরের রাজনীতিজ্ঞ ধর্মজগতের মানুষ। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর যেদিন তাঁর সঙ্গে প্রথম নিবিড়ভাবে আলাপ করার সুযোগ হয়, তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—"জেলেই আমি প্রথম উপনিষদ্ পড়ি, তখন উপলব্ধি করি যে আমি উপনিষদের জীবন যাপন করছি। সেই জীবন যাপন কর।" তিনি আমাকে সাধারণ রাজনীতির বড় বড় কথা উপদেশ দেন নি, উপদেশ দিয়েছিলেন উপনিষদের জীবন বা পবিত্র ধর্মময় জীবন যাপন করতে। রাজনীতিজ্ঞ হয়েও আসলে যে তিনি ধর্মজগতের মানুষ এ কথা তাঁর নিজের লেখায়ও পাওয়া যায়। "যে সমস্ত ধর্মজগতের মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই ছদ্মবেশী রাজনীতিবিদ্, আর

আমি যদিও রাজনীতির মুখোস পরে আছি, তথাপি বাস্তবে আমি একজন ধর্মজগতের মানুষ।" তাঁর আত্মকথার প্রস্তাবনায় লিখেছেন "আমার যা কাম্য, যার জন্য গত ত্রিশ বৎসর ধরে প্রাণপণ চেষ্টা ও আকুল আকূতি করছি তা হচ্ছে আত্মদর্শন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ও মোক্ষ। আমার চলাফেরা কাজকর্ম সমস্তই এই দৃষ্টি হতে। আমার লেখা সমস্তই এই দৃষ্টি হতে, এমনকি রাজনীতিক্ষেত্রে আমার সমস্ত প্রচেষ্টাও এই উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত।"

ভারতবর্ষে প্রতিভাবান নামী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে অবতার বলে ঘোষণা করার প্রবৃত্তি খুব সাধারণ। যুগ যুগ ধরে তা চলে আসছে। এমনকি মহাপুরুষদের স্পষ্টোক্তি থাকা সত্ত্বেও ভক্তরা সে চেষ্টা হতে নিবৃত্ত হন নি। মহাত্মাজীকেও অবতার করার প্রচেষ্টা যে না হয়েছিল তা নয়। এর প্রবল বিরোধিতা আসে তাঁর নিজের কাছ থেকেই। তিনি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে স্বরাজলাভের প্রধান অন্তরায় হবে তাঁকে অবতাররূপে প্রচার করার প্রচেষ্টা। তাই সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। মহাত্মাজী যদি অবতার হতেন তিনি আমাদের পূজার বস্তু হয়ে উঠতেন, কিন্তু আমাদের এত আপন জন প্রিয় বাপু হতেন না। আমরা তাঁকে মানুষ এবং সকলের আপন জন রূপেই দেখেছি। তিনি ছিলেন মানুষ। অধ্যাপক আইনস্টাইনের ভাষায় "এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ।" শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থ দোষত্রুটীহীন নন। যাঁর গুণের মাত্রা দোষের চেয়ে অনেক বেশী তাঁকেই আমরা বলি মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষদের মধ্যেও আবার যাঁর গুণের আধিক্য সবার চাইতে বেশী তাঁকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ মানুষ। একদিন বিখ্যাত ভারতপ্রেমিক পিয়ারসন সাহেবকে মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করি। তিনি নিজের কোন মত না দিয়ে বলেন—একই দুটি প্রশ্ন দুজনকে জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর যা পাই তা আপনাকে বলছি। প্রশ্ন দুটি ছিল : (১) আপনার সবচেয়ে বড় গুণ কি? ও (২) আপনার সবচেয়ে

বড় দোষ কি ? মহাত্মাজীর উত্তর : (১) অন্যে জানে, আমি জানি না, (২) আমার দোষের সংখ্যা এত বেশী যে তার মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় তা নির্ণয় করতে অসুবিধা বোধ করছি।

এ উত্তর ঠিক পরম বৈষ্ণবেরই যোগ্য। মহাত্মাজী নিজেও তাঁর হিমালয়ের মত সুউচ্চ ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'প্রফুল্ল', আমার মন বড় বেশী অনুভূতিপরায়ণ, অর্থাৎ সহজে বিচলিত হয়। কিন্তু বাইরে তার অভিব্যক্তি তেমনটা ছিল না। তিনি সে ভাবাবেগ চেপে রাখতেন। আমার মনে হয় এত মিতাহারী ও সংযমী ব্যক্তির রক্তের চাপ খুব বেশী থাকার এও একটি কারণ।

মহাত্মাজীর ধর্মমতে কোন গোঁড়ামি ছিল না। প্রতিদিনের প্রার্থনায় তিনি বলতেন 'সর্বধর্মে সমানত্ব'। 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম', এ কথাও প্রতিদিন প্রার্থনা সভায় উচ্চারিত হত তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর। সকলের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তিনি এ কথা। তাঁর কাছে মানুষের অন্তরাত্মা ছিল দেশ, ধর্মমত, জাতি ও বর্ণের গণ্ডীর সীমার উর্ধ্বে। তাই তিনি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন সকল মানুষের হৃদয়। তিনি জন্মেছিলেন ভারতের অন্তর্গত গুজরাটে, কিন্তু মৃত্যুকালে ছিলেন সমস্ত বিশ্বের।

তিনি মনে করতেন, যে ধর্ম সাধারণের সাধ্যের বাইরে বা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নয় তা ধর্মই নয়। ধর্ম সর্বব্যাপী। রাজনীতি বাদ দিয়েও ধর্ম নয়, ধর্ম বাদ দিয়েও রাজনীতি নয়। এই সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টি ছিল তাঁর। তিনি চেয়েছিলেন অধ্যাত্মভিত্তিক রাজনীতি বা রাজনীতিকে অধ্যাত্মময় করতে। ইহাই ভারতীয় কৃষ্টি। তিনি ভারতীয় কৃষ্টির ভাগীরথীতে স্নান করে জলধারা আকণ্ঠ পান করে যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলেন তা উপভোগ করতে আহ্বান করেছিলেন সকলকে। কিছু কিছু ধার্মিক লোক রাজনীতিকে দোষদুষ্ট বলে তা হতে দূরে থাকেন এবং অন্যকে দূরে থাকবার উপদেশ দেন। তাঁরা ভারতীয়

কৃষ্টির বিরোধী, গান্ধীমতের ত বিরোধী বটেই। ভারতের মাটিতে তাদের ভ্রান্ত প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে কিছু জল ঘোলা হয় তাতে। আজ দেশের দুর্দিনে এ কথা উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, রাজনীতিকে অধ্যাত্মময় করা ভিন্ন ভারতের কল্যাণ অসম্ভব। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সুদূর ভবিষ্যতেও সমাজজীবন চলবার সম্ভাবনা নেই। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ধর্মপ্রাণ লোকের প্রয়োজন, যেমন জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রেও। দিবা-অন্ধ ভিন্ন সকলের নিকটই তা সুস্পষ্ট। মহাত্মাজী সে কথা বুঝেছিলেন মর্মে মর্মে। আধুনিক যুগের রাজনীতির ইতিহাসে এই মহাত্মাজীর বড় দান।

রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু দুষ্ট লোক আছে এবং বহু অন্যায় কাজ হচ্ছে এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু সেটা রাজনীতিকে বাদ দেওয়ার যুক্তি হতে পারে না। বরং পরিশুদ্ধ করার ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। সবিনয়ে বলছি সাধুদের মধ্যেও দুষ্ট লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। স্বামী রামতীর্থ দুঃখ করেই বলেছিলেন, "বদ্ধ জলে যেমন শেওলা গজায় ভারতবর্ষে তেমনি সাধু গজিয়েছে। স্রোতজল প্রবাহিত হতে দাও, উপরের ময়লা ভেসে যাবে।"

পূর্বে বলেছি মহাত্মাজী ছিলেন সত্যের পূজারী বা সত্যাশ্রয়ী, এবং তাঁর সমগ্র জীবনটাই সত্যের প্রয়োগ। যেখানে সত্য সেখানে হিংসার স্থান নেই। হিংসা মিথ্যাশ্রয়ী। কাজেই প্রত্যেক সত্যের পূজারী অহিংসারও পূজারী। অতএব মহাত্মাজী সত্য ও অহিংসার পূজারী এই যে প্রচলিত ধারণা তা ঠিকই। কিন্তু মহাত্মাজীর অহিংসা শুধু হত্যা না করা নয়। তাঁর অহিংসা মানে সর্বজীবে প্রেম। সেই প্রেমবশতঃই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যন্ত্রণায় অস্থির গো-বৎসকে হত্যা করার উপদেশ দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি মন্দবুদ্ধি লোকের মত আক্ষরিক অহিংসার অনুসরণ করেন নি। সত্যিকারের অহিংসার পূজারী বলেই তাঁর পক্ষে এ উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। লালাজী (৺লালা লাজপত রায়) 'মডার্ন রিভিউ' নামক মাসিক

পত্রিকায় এক বার লিখেছিলেন, "আমার খুল্লপিতামহ জৈন ছিলেন। তিনি একটি সাপকেও মারতেন না পাছে হিংসা হয়। কিন্তু একজন দরিদ্র লোকের মুখের শেষ গ্রাস অন্ন কেড়ে নিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এই জৈনদের বিকৃত অহিংসা। যদিও আমি যাঁদের পূজা করি গান্ধী তাঁদের একজন, তথাপি তাঁর বিকৃত অহিংসার মতবাদ দিয়ে ভারতের যুবমনকে নষ্ট করতে দেওয়া যেতে পারে না।" পরে লালাজীর এই মতের পরিবর্তন হয়েছিল।

মহাত্মাজী এই বিকৃত অহিংসার পূজারী ছিলেন না। অবশ্য তিনি সাপ মারতেন না বা মারা পছন্দ করতেন না এ কথা ঠিক। দরিদ্রের মুখের শেষ গ্রাস অন্ন কেড়ে নেওয়া ত দূরের কথা, যাতে দরিদ্রের মুখে এক গ্রাস অন্ন জোটে সেদিকে ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

দরিদ্র নিপীড়িতদের প্রতি সমস্ত অন্তরের দরদ বা প্রেমই অহিংসার আসল স্বরূপ। তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় অত্যাচার খুলে দেয় তাঁর হৃদয়পদ্ম। তার পর নানা ভাবে সে প্রস্ফুটিত ফুল দেখতে পাই জীবনব্যাপী কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে। সেই প্রেমই দরিদ্র কৃষকদের জন্য চম্পারন ও খেড়ায় সত্যাগ্রহের পথে নিয়ে যায় তাঁকে। সেই প্রেমের জন্যই শোষিত শ্রমিকদের স্বার্থে আমেদাবাদে উপবাস করেন। ভারতের গ্রামগুলি আজ অবজ্ঞাত অধঃপতিত, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট উদাসীন। তাই তিনি বলতেন, গ্রামসেবাই ভারতের সেবা। গ্রামবাসী দরিদ্রের জন্যই মুখ্যতঃ চরখা ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের পরিকল্পনা। এই প্রেমবশতঃই হরিজনদের কল্যাণের জন্য পদব্রজে ভ্রমণ ও অর্থসংগ্রহ। দরিদ্র ভারতবাসী প্রয়োজনের চেয়ে কম কাপড় পরতে পায় তাই তিনি হলেন হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড়ধারী বা মিঃ চার্চিলের ভাষায় অর্ধনগ্ন ফকির গরু ও মহিষকে ফুকা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে দুধ বার করে কলকাতায়, তাই তিনি ছেড়ে দিলেন গরু মহিষের দুধ খাওয়া। জালিয়ানওয়ালাবাগের

হত্যাকাণ্ড ও সামরিক শাসনের নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারের পর সেই প্রেমই তাঁকে পাঞ্জাব তদন্ত কমিটীর মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করায়। হিন্দু মুসলমানের প্রতি প্রেমবশতঃই কয়েক বার উপবাস করেন। এই জন্যই বৃদ্ধ বয়সে অপটু শরীরে নোয়াখালী ও বিহারে ভ্রমণ করেন। এই প্রেমবশতঃই সাধারণের ঘৃণার পাত্র কুষ্ঠ রোগীর সেবা করেন নিজ হাতে। সর্বোপরি শোষিত অপমানিত ভারতবাসীর প্রতি প্রেমবশতঃই তাঁর স্বাধীনতার সংগ্রাম। সে সংগ্রামও প্রেমের পথে। অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় বা প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে জয়ের প্রচেষ্টা।

ভারতবর্ষে ধর্মক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ করেন মহাবীর ও বুদ্ধ। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেন মহাত্মাজী। যে ধর্ম সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নয় তা যেমন ধর্ম নয়, ঠিক তেমনি যে অহিংসা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নয় তাও অহিংসা নয়—এই ছিল মহাত্মাজীর দৃঢ় ধারণা।

তাঁর অহিংসা দুর্বলের অহিংসা ছিল না। তাঁর মতে অহিংসার পথেই সত্যিকারের স্বরাজ লাভ সম্ভবপর। হিংসার পথে জনগণের সামান্য অংশ বিদেশী শাসকদের হাত হতে দেশকে মুক্ত করতে পারে বটে, কিন্তু তারা নিজেদের শক্তিবলে জনগণের প্রভু হয়েও বসতে পারে। তাতে শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন হয় মাত্র, সত্যিকারের স্বরাজ লাভ হয় না। যদি জনগণের সমবেত প্রচেষ্টায় (তার মধ্যে দুর্বলেরও স্থান আছে) স্বরাজ লাভ হয় তবেই তা হয় সত্যিকারের স্বরাজ। তাতে শোষণের বা প্রভুত্বের কোন স্থান থাকে না। এই স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভই ছিল তাঁর কাম্য। অতএব অহিংসারূপ হাতিয়ার তুলে ধরেছিলেন দেশের সামনে।

তাঁর অহিংসায় ভীরুতার কোন স্থান ছিল না। তিনি পছন্দ করতেন নির্ভীকতা। অহিংসার পূজারী হয়েও এ কথা স্পষ্ট বলতে দ্বিধা বোধ করেননি "যখন কারো সামনে ভীরুতা ও হিংসার মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন আসে তখন আমি হিংসাকেই বেছে

নেওয়া পছন্দ করব।" অবশ্য তিনি নিজে কখনো হিংসার পথ গ্রহণ করতেন না। নির্ভীকতা ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। তিনি বহুবার বলেছেন যে বর্তমানে ভারতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন 'অভীঃ' বা নির্ভীকতা। ১৯২১ সালে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়ে যখন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয় তখন তিনি আশ্রমের নাম 'অভয় আশ্রম' রাখবার প্রস্তাব করেন। এ নামকরণ ছিল তাঁর।

তিনি নিজেকে অহিংসার অসম্পূর্ণ বা দুর্বল পূজারী বলে মনে করতেন। যদিও অহিংসায় বিশ্বাস ছিল তাঁর প্রগাঢ়। আশানুরূপ ফল লাভ না হলে তিনি অহিংসার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতেন না, অন্য কারো উপরও দোষারোপ করতেন না। নিজের অসম্পূর্ণতাকেই দায়ী করতেন।

হিংসার চেয়ে অহিংসার হাতিয়ারকে তিনি অনেক উন্নত বলে মনে করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ধারণা ছিল ভাল জিনিসেরও একটা সংক্রমণ ক্ষমতা আছে। অহিংসার পথে ঠিক ভাবে চললে গোড়ায় তার যে বিশ্বাসই থাকুক না কেন সে অহিংসার পূজারীতে পরিণত হবেই। ১৯২৪ সালে একজন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি অভিযোগ করে মহাত্মাজীকে আমার সামনে বলেন "প্রফুল্ল এক সময় সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করত, আজও তার বিশ্বাস বদলায় নি।" আমি তক্ষুনি উত্তর দিই "স্বরাজ লাভের জন্য হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক দুই পথই আমি কার্যকরী বলে মনে করি, তবে বর্তমানে আমি নিষ্ঠা সহকারে অহিংসার পথে চলছি।" এই উত্তরে মহাত্মাজী সন্তুষ্ট হন, অভিযোগকারীও চুপ হয়ে যান। মহাত্মাজীর বিশ্বাস ছিল যে, আমি যদি নিষ্ঠা সহকারে অহিংসার পথ ধরে চলি তবে একদিন এর শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় উপলব্ধি করব। শুধু বিশ্বাসের কথা নয়। এর মধ্যে রয়েছে মস্ত বড় উদারতা। মতের পরিবর্তন না হলেও সশস্ত্র বিপ্লবপথগামীরা যদি নিষ্ঠা সহকারে অহিংসার পথ ধরে চলে তাতেই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা

উচিত এ উদার মনোভাব তিনি পোষণ করতেন। এই উদারতার জন্যই আমার ন্যায় আরো কেউ কেউ তাঁর মতাবলম্বী হতে পেরেছে।

উদারতা অহিংস মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। তা ছিল গান্ধী-চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন "সাহসের জন্য আমি তাঁদের প্রশংসা করি, দেশপ্রেমের জন্য তাঁদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই হত্যা করা কি সম্মানজনক কাজ ?" অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদ সুবিদিত। কিন্তু ১৯২৫ সালে ব্যারাকপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে "ব্যারাকপুরের ঋষি" বলে ছোট নিবন্ধ লিখলেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ১৯২৪ সালে এমন আকার ধারণ করে যে তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে গঠন-মূলক কাজে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য কয়েকমাস প্রাণপণ পরিশ্রম করে অর্থ সংগ্রহ করেন। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর যুদ্ধের সময়কার হিংসাত্মক কার্য সমূহ তাঁর মনঃপূত না হলেও শ্রীবসুর কর্মক্ষমতা, সাহসিকতা, দেশপ্রেম প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী হয়েও জিন্না সাহেব সম্বন্ধে একাধিকবার আমাকে বলেছেন "তিনি (মিঃ জিন্না) লোভের অতীত।"

মহাত্মাজীর অহিংসার ধারণা ছিল খুব উচ্চ। হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব ফিরিয়ে আনবার জন্য নোয়াখালী যাওয়ার প্রাক্কালে আমাকে বলেছিলেন "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌবৈরত্যাগঃ"—'কোন ব্যক্তির ভিতর অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হলে তার নিকটে যে আসে তার মন হতে শত্রুভাব বা বিদ্বেষ ভাব দূর হয়ে যায়। পাতঞ্জল দর্শনের এই অহিংসাই আমার কাম্য। এখানেই অহিংসার চরম সার্থকতা।' কিন্তু দেশের পরম দুর্ভাগ্য যে, এমন

একজন অহিংসার পূজারীকেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক ভারতীয় হিন্দুর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়। তা ঘটল স্বাধীনতা লাভের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই। এই ঘটনার পর যখন পূর্ব পাকিস্তানে যাই সেখানকার এক বন্ধুস্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোক বলেন, "আমরা খারাপ হতে পারি। কিন্তু মুখ্যতঃ যাঁর প্রচেষ্টায় এবং যাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হল সেরূপ লোককে গুলি করে হত্যা করার মত দুর্বুদ্ধি আমাদের মধ্যেও কারো হয় নি।" লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। চিরদিনের মত ভারতের মুখে কলঙ্ক লেপে রইল। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভারতবর্ষকে করতে হবেই এবং আরও কতকাল করতে হবে তা কে জানে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য এই অভিনব পন্থায় দেশকে পরিচালিত করেছিলেন বলেই বহু ইংরেজও তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও একই কারণে যুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেছিলেন। ইংরেজ জাতির প্রতি গান্ধীর কোন বিদ্বেষ ছিল না। এক দেশের উপর অন্য দেশের প্রভুত্ব হিংসার নামান্তর মাত্র। তাই ইংরেজের প্রভুত্বের অবসান ছিল তাঁর কাম্য। নিজেদের মধ্যে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্যায় অবিচার রয়েছে তাও তিনি চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ দূর করতে। সামাজিক, অর্থনৈতিক অন্যায় অবিচার হিংসারই অভিব্যক্তি। সে হিংসাকে দূর করায় তাঁর ছিল দৃঢ় সংকল্প। এমনকি তাঁর মত ছিল আমাদের মধ্যেকার এই হিংসা ভাব অনেক পরিমাণে—যদি সম্পূর্ণ নাও হয়—দূর না হলে অহিংস পথে স্বরাজলাভ অসম্ভব। স্বরাজ লাভের পরও হিংসা ভাব দূরে রাখার প্রয়োজন জাতির কল্যাণের জন্য, এমনকি স্বরাজকে সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য। তাই কংগ্রেসসেবকের প্রতিজ্ঞাপত্রে ১৯২১ সালেই তিনি রেখেছিলেন "আমি সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাসী এবং তা রক্ষা করতে চেষ্টা করব, আমি হিন্দু হলে ব্যক্তিগত জীবনে অস্পৃশ্যতা বর্জন করব, আমি চরখায় সূতাকাটা জানি ও খদ্দর পরিধান

করি ইত্যাদি"। স্ত্রী পুরুষ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল প্রাপ্তবয়স্কেরই অধিকার ছিল স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার। অধিকার ছিল না নেশাখোর বা মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীর। মাদকদ্রব্য বর্জন ছিল স্বেচ্ছাসেবকের প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটি। আবার স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসকে যখন লোকসেবক সঙ্ঘে রূপান্তরিত করতে বলেন তখনও সেবকদের জন্য ওইরূপ প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন।

তাঁর মতে অহিংসনীতির এটা শাশ্বত দিক। এক কথায় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির নিবিড় যোগাযোগ। তাঁর দৃষ্টি ছিল সামগ্রিক। রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লব নিরর্থক। তাতে শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন হয় মাত্র। কাজেই তিনি খুব জোর দিয়েছিলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবাত্মক কাজের উপর। এই ছিল তাঁর গঠনমূলক কার্যক্রম। তাঁকে এ কথা জোর দিয়েই বলতে শুনেছি 'গঠনমূলক কাজেই স্বরাজ'। সবাই ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়েছিল বটে, কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ লোকের গঠনমূলক কাজে আস্থা ছিল না। তাদের মতে এ সবের অনেকটা মহাত্মাজীর 'বাতিক'। অথচ মহাত্মাজীর নেতৃত্ব চাই, অতএব তাঁর এই সমস্ত 'বাতিক' ভোট দিয়ে বা চুপ করে থেকে পাশ করিয়ে দিয়েছে। কার্যতও অনেকে পালন করে নি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করা ত দূরের কথা। তার ফল ভুগছে দেশ আজ। হিন্দু মুসলমানদের ভিতরে সৌহার্দ স্থাপিত হলে ভারত দ্বিখণ্ডিত হত না এবং তার অনিবার্য কুফলও ভোগ করতে হত না। মহাত্মাজীর সুস্পষ্ট মত ছিল যে ভারত খণ্ডিত হলে হিন্দু বা মুসলমান কারো কল্যাণ হবে না। গত ১৪ বৎসরের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। যত দিন যাবে যাদের চোখ খোলে নি তারাও এ জিনিসটা দেখতে পাবে। স্বাধীনতা লাভের সুফল আমরা অনেক পরিমাণে হারিয়েছি শুধু এজন্য।

অনেকে মনে করেন মহাত্মাজীর অহেতুক ও অযৌক্তিক মুসলমান-প্রীতি ছিল। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিকে মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকৎ আলী ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। তাঁদের খাতিরেও তিনি নিজ মত পরিবর্তন করেন নি। আলী ভাইরা যখন মহাত্মাজীর পথ পরিত্যাগ করলেন তিনি দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মত গ্রহণ করেন নি। এমন কি মৌলানা সৌকৎ আলীকে একবার জানিয়েছিলেন "আপনি ঠাণ্ডা হলে নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।" মৌলানা হজরত মোহানী সম্বন্ধে ত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় লিখেছিলেন "ধর্মের নামে অধর্ম অনুষ্ঠানই মৌলানা হজরত মোহানীর ধর্মীয় নীতি।" সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি উদার মনোভাব ছিল তাঁর। তিনি মনে করতেন জাতির অনিষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ না করে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি যতটা উদার হওয়া যায় ততই ভাল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের জবরদস্তি যেমন সহ্য করা উচিত নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও অযৌক্তিক আবদার বা দাবী মেনে নেওয়াও তেমনি অনুচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের উদার হওয়ার সুযোগ বেশী বলেই তাঁর বিশেষ আবেদন ছিল তাঁদের কাছে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ জুড়ে দেওয়ার অনিবার্য ফল হয় মৌলানা মৌলবীদের অস্বাভাবিক প্রভাব বৃদ্ধি। তাই গয়া কংগ্রেস বিষয়নির্বাচনী সমিতিকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় 'কাউন্সিল প্রবেশ হারাম না শুধু নিষেধ' এই বিষয়ে খিলাফৎ কমিটীর মতের জন্য। গয়া কংগ্রেসে মহাত্মাজী উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন জেলে। তিনি উপস্থিত থাকলে কি করতেন বলা শক্ত। তবে অনেকের কাছেই এ অবস্থা অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল।

ধর্ম হিসাবে পৃথক্ জাতিতত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীর মনে আঘাত না দিয়ে নিজের ধর্ম পালন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর থাকা উচিত এই ছিল তাঁর মত।

নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান থেকেও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কথাই তিনি বলেছেন। অনেকে আবার মনে করেন রাজনীতির মধ্যে মহাত্মাজী ধর্মের উপর এতটা জোর দেওয়াতেই ধর্ম হিসাবে পৃথক্ জাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। তিনি ভুলেও কখনো হিন্দু মুসলমানের দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রশ্রয় দেন নি, বিশ্বাস করা ত দূরের কথা। ভারতীয় হিন্দু মুসলমান জাতিতে এক, ধর্মে পৃথক্ এই ছিল তাঁর ধারণা। অন্য দিকে মানুষের জীবনে ধর্মের কোন স্থান নেই বলে যারা বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় কমিউনিস্টরাও মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠদের মুসলমান হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার দাবী স্বীকার করেছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের সমস্তটাই রাজনৈতিক। ঐতিহাসিক কারণে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে পরস্পরের প্রতি একটা অবিশ্বাসের ভাব জন্মেছিল। তাকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন একদল রাজনীতিবিদ্। তৎকালীন বিদেশী শাসকেরাও তাতে ইন্ধন জোগায়। তাদের কূটনীতির মস্ত বড় একটা হাত ছিল এর মধ্যে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে এদের মিলিত প্রচেষ্টা সফলকাম হয়। জানি না কবে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং সার্থক হবে মহাত্মাজীর স্বপ্ন।

সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও দেশের প্রতি সমান কর্তব্যবোধ জাতীয় উন্নতির জন্য অপরিহার্য—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জন্মের জন্যই কাউকে নীচু মনে করা হিংসা বা অধর্ম। অতএব হিন্দুসমাজের কলঙ্ক স্বরূপ অস্পৃশ্যতাকে দূর করা তিনি ধর্মকার্য বলেই গ্রহণ করেছিলেন। লোক স্বেচ্ছায় এই অস্পৃশ্যতাকে দূর করুক তাই এ বিষয়ে লোকমত গঠন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অপর দিকে তিনি আইনের সাহায্য নিতেও দ্বিধা করেন নি। তিনি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। তাঁর মতে আইন করাও হিংসা, যদিও অতি ক্ষুদ্রতম হিংসা। প্রয়োজন হলে সেটুকু হিংসা করা যেতে পারে বলে তিনি বলতেন। আইন করে কিছু হয় না এটা ভুল, আবার সব কিছু

হয় সেটাও ভুল। আইন ও জনমত গঠন একে অন্যের পরিপোষক। তিনি প্রয়োজন মত দুইয়েরই সুযোগ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। অস্পৃশ্যতারূপ অন্যায়কে যেমন দূর করতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি মেয়েদের অসুবিধা দূর করে তারা যাতে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করতে পারে সে চেষ্টা ছিল তাঁর। মেয়েরা নীচু স্তরের কিছুদিন পূর্বেও হিন্দু সমাজে এই ধারণা প্রচলিত ছিল। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য-মর্হতি"—মেয়েরা স্বাধীনতার যোগ্য নয়—মনুস্মৃতির এই বাক্যের হিন্দু সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মহাত্মাজী মেয়েদের শুধু সমান স্থান দেন নি, তাঁরা অনেক বিষয়ে পুরুষের চেয়ে যোগ্যতর বলে মনে করতেন। মেয়েদের সহনশীলতা, নম্রতা ও স্বাভাবিক প্রেমভাবের জন্য তাঁরা অহিংসার যোগ্যতর পূজারী বলেই তিনি মনে করতেন। অবজ্ঞার বদলে মেয়েদের প্রতি ছিল তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা। তাই তাঁর আহ্বানে হাজার হাজার মেয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে হাসিমুখে নির্যাতন সহ্য করেছিল। দেখেছি তখন মেয়েদের অভূত-পূর্ব জাগরণ।

ভারতের জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্য এবং ধনী দরিদ্রের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান তাঁর প্রাণে দিত দারুন ব্যথা। ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে এক ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন "যখন ভারতের কোন এক প্রান্তে একখানা বিরাট অট্টালিকা দেখি তখনি মনে হয় উহা দরিদ্র কৃষকের রক্ত দিয়ে তৈরী।" তারপর সেখানে সমবেত রাজন্যবর্গের পরিধেয় হীরা জহরৎ প্রভৃতি দেখে বলেছিলেন কে বলতে পারে এই আমাদের দরিদ্র ভারতবর্ষ! ধনী দরিদ্রের এই বৈষম্য ও জনগণের দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি দেশবাসীর সামনে রাখেন চরখা, খদ্দর ও পরে গ্রামোদ্যোগের পরিকল্পনা। ভারতের শতকরা ৮০ জনের উপর গ্রামে বাস করে এবং গ্রামের কৃষকদের অধিকাংশই বৎসরের অন্ততঃ কয়েকমাস থাকে বেকার। অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করেই যদি দরিদ্র ভারতবাসীর

বস্ত্রসমস্যার সমাধান হয় তা হলে মস্তবড় লাভ। অন্য কোন উপায়ে এত সহজে দরিদ্রের এত প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ অসম্ভব। আর ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সবাই কাটতে পারে সূতা, সে শহরের লোকই হোক আর গ্রামবাসীই হোক। তাই তিনি অর্থনৈতিক কার্য-ক্রমের মধ্যবিন্দু করেছিলেন চরখায় সূতা কাটা ও খদ্দর পরিধান। অল্প সময়ের জন্য হলেও তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও সূতা কাটতে বলতেন যেন সাধারণ লোক তাঁদের অনুসরণ করে। একদিন দিল্লীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপ করছি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এলেন। নানা কথার মধ্যে তিনি বললেন 'মহাত্মাজী, আমি সন্ন্যাসী, আমি কেন সূতা কাটব?' মহাত্মাজী এক কথায় উত্তর দিলেন —'লোকসংগ্রহার্থং'—লোকশিক্ষার জন্য। মহাত্মাজী নিজেও নানা ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা সূতা কাটতেন। সকলে কাটুক এটাও তিনি চাইতেন। তথাকথিত প্রগতিশীলদের কাছ থেকে এসেছিল এর প্রবল বিরোধিতা—আজও তা চলছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, যান্ত্রিক যুগে চরখা অচল, শুধু তাই নয় মহাত্মাজী বৃহৎশিল্পের বিরোধী—এ প্রচার হতে লাগল। তিনি বৃহৎশিল্পের বিরোধী ছিলেন না মোটেই, কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের বর্তমান বেকারীর পরিপ্রেক্ষিতে যা কুটিরে উৎপন্ন করা যায় তার জন্য বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়, বৃহৎশিল্পের মারফতে জনগণের যে শোষণ হয় এবং অর্থ পুঞ্জীভূত হয় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, তিনি তারও বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিরোধিতার তৃতীয় কারণ—কারখানার বর্তমান পরিবেশ, যাতে শ্রমিকদের চারিত্রিক দুর্বলতা প্রসার লাভ করে। যন্ত্র মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষ যন্ত্রের জন্য নয়। সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতি যদি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিয়ে হয় ত তা মোটেই কল্যাণকর নয়। জাতি বা ব্যক্তি কারো পক্ষেই নয়। কিন্তু নৈতিকতা বা আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক অবনতির

চরম স্তরে রেখে দেওয়ার যুক্তি তিনি কখনো দেন নি। তিনি জোর দিয়েই বলেছেন যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় ভগবানকেও খাদ্যরূপে অবতীর্ণ হতে হবে। দরিদ্রের মুখে অন্নের ব্যবস্থা না করে উচ্চাঙ্গের ধর্মোপদেশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তিনি চেয়েছিলেন ভগবানকে খাদ্যরূপে। কিন্তু অনেকে চান ভগবানকে বাদ দিয়ে খাদ্য। এইখানেই তাঁর সঙ্গে তফাৎ।

তাঁর গঠনমূলক কার্যক্রমের অর্থনৈতিক দিক্‌টাও ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে। প্রথম চরখা ও খদ্দরের উপর জোর দেন। ক্রমে তিনি গ্রামশিল্পের পুনরুদ্ধারের কথা বলেন। আসল লক্ষ্য যাতে প্রত্যেক ভারতবাসী অন্ততঃ সুষম খাদ্য ও প্রয়োজন মত বস্ত্র পায়। এ জন্য প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য ছিল তাঁর সর্বাধিক। তাঁর নিশ্চিত মত ছিল, যে কোন-না-কোন উৎপাদনমূলক কাজ করে না তার ভোটের অধিকার থাকা উচিত নয়। অধিকার ও কর্তব্যবোধ যে সমাজে এক সঙ্গে চলে সে সমাজের অগ্রগতি সুনিশ্চিত। অন্যথায় সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। ভারতীয় সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আসল কথা কুটিরশিল্প বা বৃহৎশিল্প নয়— আসল জিনিস হচ্ছে জনগণের অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। গ্রামবাসীদের বুদ্ধির মান উঁচু না হতে পারে। কিন্তু আধুনিকতা বা প্রগতির নামে তারা কুটিরশিল্পের মাধ্যমে যা-কিছু আয় করত, অন্য কোন আয়ের পথ বের না করে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা মোটেই বুদ্ধিমানের নিদর্শন নয়। আজ তারই অভিনয় দেখছি প্রগতির নামে। এ প্রগতির বহিরাবরণের অন্তরালে প্রতিক্রিয়াশীলতা।

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ আজও কৃষির মারফতে। কাজেই ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধেও মহাত্মাজীর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। তিনি বলতেন

'ভূমি গোপালকী'—জমি ভগবানের বা সমাজের। যদি জমির মালিকরা স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থায় রাজী না হয় তবে আইন করে সে ব্যবস্থা করার উপদেশ দিয়েছেন। শিল্পে ও কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টি ছিল খুবই। যাতে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করতে পারে সে জন্য তিনি ছিলেন সচেষ্ট। পুঁজিপতি ও শ্রমিক উভয়েই কারখানার যুক্ত মালিক। সেভাবেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত কারখানার কার্যাবলী। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যেই আমেদাবাদে তাঁর প্রথম উপবাস। শুধু কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতি সম্বন্ধে নয়, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার জন্যও ছিল তাঁর পরিকল্পনা। ধনী নিজেকে নিজের সঞ্চিত অর্থের মালিক মনে না করে ভাববে জনগণের কল্যাণের জন্য অছি স্বরূপ। ধনী যদি সে ভাবে উদ্বুদ্ধ না হয়, আইন করে সে অর্থ জনকল্যাণে নিয়োগ করতে হবে। ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো শোষণ বা হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর পরিবর্তন না করে শুধু আক্ষরিক অহিংসা পালন করার উপদেশ দিলে সমাজে হিংসা আরো ব্যাপক হয়ে উঠবে এ কথা তিনি ভাল করেই উপলব্ধি করতেন। ধনী লোকেরা তাঁকে সম্মান দেখালেও তাঁর কথায় বিশেষ একটা কর্ণপাত করেন নি। আজ ভারতবর্ষে একজন বড় ধনীও নেই যিনি নিজেকে অছি মনে করেন ও সেরূপ আচরণ করেন। তাই আইন করে জনকল্যাণে সে অর্থের নিয়োগ প্রয়োজন। তবে তার সুপ্রয়োগ হওয়া চাই। নইলে বিশৃঙ্খলা হবে আরো বেশী। পূর্বেই বলেছি তিনি আদর্শের দিক দিয়ে নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। অহিংসার সার্থক প্রয়োগের পরিণতি শোষণ ও শাসনহীন সমাজ। তার প্রথম ধাপ হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন বিকেন্দ্রীকৃত সমাজব্যবস্থা। অর্থাৎ যাতে সরকারের কেন্দ্রীভূত শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন খুব কম হয়। এক জায়গায় বহু ধন সঞ্চিত হওয়া হিংসা, কেন্দ্রীভূত শক্তিরূপী সরকারও হিংসার প্রতিমূর্তি। সরকারের হস্তক্ষেপ জাতীয় জীবনে যত কম হয়

ততই মঙ্গল। বৃহত্তর হিংসা প্রতিরোধের জন্য যেটুকু অত্যাবশ্যক, সেটুকু সরকারী হস্তক্ষেপ তিনি অনুমোদন করতেন বাস্তবের দৃষ্টিতে। কোন জাতির প্রতি স্তরে সরকারী হস্তক্ষেপ মস্ত বড় অভিশাপ। তা মনে প্রাণে অপছন্দ করতেন তিনি।

শোষণ ও শাসনহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে ছেলেমেয়েদের মন ছোটবেলা থেকে সে ভাবে গড়ে উঠতে পারে। তবে তা হয়ে উঠে সহজ ও স্বাভাবিক। তাই তাঁর সমস্ত আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্য উদ্ভাবন করলেন বুনিয়াদী শিক্ষা। এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা শেষ বাতিক।

বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম। জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য প্রার্থনা, সঙ্গীত ও ড্রিল এর আঙ্গিক। হাত পা কান চোখ মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা। 'সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্'কে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা। ছয় হতে চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলে মেয়ের জন্য এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। পুথিগত বিদ্যার দিক দিয়েও ছাত্ররা ইংরেজী বাদে অন্য সব বিষয়ে ম্যাট্রিক পাশের সমান জ্ঞান লাভ করবে। এর অর্থ এই নয় যে, ইংরেজী বা অন্য কোন আন্তর্জাতিক ভাষা ভারতীয় ছেলেরা শিখবে না। তিনি স্বীকার করতেন ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, এর সাহিত্যসম্পদ্ উঁচু-দরের, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি প্রশস্ত ভাষা। কাজেই কিছু লোকের ইংরেজী শিক্ষণীয় হওয়া উচিত, যাঁরা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। তা হবে মাধ্যমিক বিদ্যার স্তরে নয়, কলেজ বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে অর্থাৎ চোদ্দ বৎসরের পর। লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য ইংরেজী শিক্ষণীয় নয়, অল্পসংখ্যক লোকের জন্য। ইহাই ইংরেজীর যথাযোগ্য স্থান।

ভারতবর্ষে শতকরা ৯০ জনেরও উপরে চোদ্দ বৎসর বয়সের

মধ্যেই পড়াশুনা শেষ করবে। কাজেই তাদের ওই সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বাধিক জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করাই সংগত। ভাষা শিক্ষা জ্ঞান নয়, জ্ঞানলাভের বাহন মাত্র। আসল উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ। আজ আমাদের পয়সা নেই চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলে মেয়ের বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করবার মত। এই অবস্থায় ছোটবেলা হতে ইংরেজী চালু করার জন্য পয়সা খরচ কেন এই প্রশ্ন তিনি করেছেন। খুবই সংগত প্রশ্ন। অর্থাভাব ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এমত অবস্থায় সকলের জন্য আট বৎসর বয়স হতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। ফলে দাঁড়াবে মুষ্টিমেয় তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পাবে তাদের ভাল করে শিক্ষার জন্য সকলের উপর আট বৎসর বয়স হতে ইংরেজীর বোঝা চাপানো জাতির বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অন্তরায়। ছোটবেলা হতে ইংরেজী না শিখলে ইংরেজী খুব ভাল করে শেখা যায় না এ যুক্তি মেনে নিলেও স্বভাবতই এ প্রশ্ন মনে আসে ইংরেজী খুব ভাল করে না শিখলে ক্ষতি কি? ইংরেজী পুস্তক পড়ে বুঝতে পারা, সহজ সরল ইংরেজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারাই কি যথেষ্ট নয়? প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে ভারতে ইংরেজীর প্রভাব চলেছিল। কত সুপণ্ডিত ও হৃদয়বান ইংরেজ অধ্যাপকও এসেছিলেন এদেশে। কিন্তু ভারতে একজন সেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রন, টেনিসন, গলস্ওয়ার্দি বা সমারসেট মম হওয়া ত দূরের কথা, কয়জন শুদ্ধ ইংরেজী লিখতে পারেন? একদিন এ বিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলছিলেন, মাত্র তিনজন লোক ভারতবর্ষে শুদ্ধ ইংরেজী লিখতে পারেন। একজনের নাম করেছিলেন। তিনি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ ইংরেজীতে হয় নি। হয়েছিল বাংলায়—তাঁর মাতৃভাষায়। মাতৃভাষার স্থান অন্য কোন ভাষা গ্রহণ করতে পারে না, যেমন পারে না গরুর দুধ মায়ের দুধের

স্থান গ্রহণ করতে। এ জগতের শাশ্বত সত্য। ইংরেজী ভাষায় সেক্সপীয়র, জার্মান ভাষায় গ্যয়টে, আর বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ প্রতিভার নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। অন্য ভাষায় তা সম্ভবপর নয়। এ সহজ সরল সত্য মহাত্মাজীর নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিল। তাই তিনি লিখেছেন "আমি নিশ্চিত মনে করি দেশের যে সমস্ত ছেলে নিজের ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করে তারা সোজাসুজি আত্মহত্যা করছে। রাজ্য পরিচালনার একচ্ছত্র ক্ষমতা যদি আমার হাতে আসে তা হলে ভিন্ন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সেই মুহূর্তে বন্ধ করে দিব। এমনকি শিক্ষক তথা অধ্যাপকদের যদি বরখাস্ত করতে হয় তা হলে সে পর্যন্ত গিয়েও তাদের দ্বারা এ বিষয়ে ঝটপট বদল করাব। পাঠ্য-পুস্তক তৈরী হোক সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথাও আমি শুনব না। এ পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক আপনা আপনি তৈরী হতে শুরু হবে। ভিন্ন ভাষা-মাধ্যম এমন ভয়ানক অনিষ্টকারী যে এর অতি দ্রুত চিকিৎসা হওয়া উচিত।·· বালকদের মানসিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা তার উপর জোর করে চাপাবার প্রচেষ্টা আমি মাতৃভাষার প্রতি দ্রোহ বলেই মনে করি।" ইংরেজীর প্রতি অস্বাভাবিক প্রেম প্রগতির নামে দেশের বুদ্ধিবৃত্তি বিনাশের পন্থা। মহাত্মাজীর ভাষায় "ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দ্রোহ"। জাতি যখন আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবে ইংরেজী মাধ্যম চালাবার অপচেষ্টাকে ক্ষমা করবে না।

যেমন ইংরেজীর যথাযোগ্য স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি হিন্দী-হিন্দুস্থানীরও। তাঁর মতে "হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হবে, কিন্তু তা প্রাদেশিক ভাষার স্থান দখল করতে পারে না। রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার মাধ্যমের স্থান নিতে পারে না, ইংরেজী ত কখনই নয়।" শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা। আন্তঃপ্রাদেশিক কাজ যাঁরা করবেন তাঁদের হিন্দী অবশ্য শিক্ষণীয়। ইংরেজীর বদলে হিন্দী কৌলীন্য

প্রতিষ্ঠারও ছিলেন তিনি বিরোধী। তাঁর পরিকল্পনায় মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার যথাযোগ্য স্থান ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলির উন্নতিই ছিল তাঁর কাম্য। সমস্ত ভারতে মাত্র একটি ভাষা প্রচলনের কল্পনাও তাঁর ছিল না। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। মহাত্মাজী ছিলেন তার ধারক ও বাহক। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু গ্রামাঞ্চলেই চালাবার প্রচেষ্টা হয়েছে। তাও অধিকাংশ স্থলে শ্রদ্ধাহীন ফুল-বেলপাতা দেওয়ার ব্যবস্থা। দীর্ঘদিনের বাবু তৈরী করা শিক্ষায় অভ্যস্ত শ্রমবিমুখ শিক্ষিত সমাজ এ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে নূতন বাবু হওয়ার জন্য উন্মুখ অশিক্ষিত সমাজ। এমনকি গান্ধীবাদী বা সর্বোদয় কর্মীরাও খুব সামান্য সংখ্যা বাদে মনে প্রাণে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করে নি। তাই অল্পসংখ্যক বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাসী ও সে কাজে নিযুক্ত কর্মী ভীষণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন। উজান নৌকা বাইতে হচ্ছে তাঁদের। তবে এ কথা জোর করেই বলতে চাই যে, এ শিক্ষা-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে প্রচলিত হলে ভারতের পরম কল্যাণ সাধিত হত। কিন্তু তার বদলে দেখছি, 'কালো ইংরেজ' হওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, নূতন এক অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রচেষ্টা। জাতির শুভবুদ্ধি হোক এই কামনা করা ভিন্ন আর কী বলব।

এই সব গঠনমূলক কাজের জন্য মহাত্মাজীর নেতৃত্বে চারটি স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত হয়—(১) নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ, (২) হরিজন সেবক সঙ্ঘ, (৩) অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ ও (৪) হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ। স্বরাজ লাভের পূর্বে মহাত্মাজী বলতেন 'গঠনমূলক কাজই স্বরাজ, স্বরাজ লাভের পর তাঁর শেষ দলিলেও এ কথার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু স্বরাজ লাভের চোদ্দ বৎসর পর দেখছি তাঁর গঠনমূলক কার্যক্রম একপ্রকার জীবন্মৃত। তাতেও দুঃখিত হবার কিছু ছিল না, যদি দেখতাম অন্য পথে

জনকল্যাণ সাধিত হচ্ছে। হয়ত দেশ ঠেকে শিখবে, তবে তার মূল্য দিতে হবে অনেক।

তিনি ভাষাভিত্তিক প্রদেশে বিশ্বাস করতেন। তার মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের ভাষায় রাজনৈতিক ও সর্বপ্রকারের কাজকর্ম পরিচালনা। যেন ওই ভাষা সে প্রদেশের শিক্ষা ও আদালতের ভাষা হয়। প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্ম ত সে ভাষায় অবশ্যই চলবে। প্রাদেশিক বিধান সভার কাজ প্রাদেশিক ভাষায়, আর যেখানে প্রদেশের মধ্যে একাধিক ভাষা প্রচলিত সেখানে ওই সব ভাষায় চলবে। কেন্দ্রীয় আইন সভা বা লোকসভার কাজ চলবে হিন্দী-হিন্দুস্থানীতে, ইংরেজীতে নয়।

স্বরাজ লাভের জন্য তাঁর অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনা প্রথম ১৯২০ সালে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসে এবং পরে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয়। তখন তিনি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে ভাষাভিত্তিক কংগ্রেস প্রদেশ গঠন করেন। প্রত্যেক প্রদেশে কাজ চলবে সেখানকার ভাষায়, কারণ তাতে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভবপর। আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হবে হিন্দী-হিন্দুস্থানী, ইংরেজী নয়। এর উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। একবার মহাত্মাজীর সহিত দেখা করতে গিয়েছি সবরমতী আশ্রমে। ৩১শে জুলাই বৈকালে আমাকে ডেকে বললেন "আগামী কাল লোকমান্য তিলকের মৃত্যুবার্ষিকী। আমেদাবাদ শহরে সভা, সর্দার সভাপতি, তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে।" সর্দার অসুস্থ হওয়ায় মহাদেবভাই দেশাই সভাপতি হলেন। সভায় উপস্থিত প্রায় সকলেই ইংরেজী বুঝতে পারেন, তথাপি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করা হল। হিন্দীতে না পারলে বাংলায় দিতে বলা হল, কিন্তু ইংরেজীতে নয়। ১৯২৫ সালে মহাত্মাজী আসেন বাংলা সফরে। গ্রামে এক জায়গায় ইংরেজীতে অভিনন্দন পাঠ করি। তিনি তা অপছন্দ করেন এবং বাংলায় অভিনন্দন ও রিপোর্ট দিতে বলেন। তার পরের দিনের

সভায় সেরূপ করা হয়। মহাত্মাজী জবাব দেন হিন্দীতে। তা বাংলা অনুবাদ করা হয় সভার শ্রোতাদের জন্য। তাঁর জবাব হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হল যে তিনি বাংলা অভিনন্দন ও রিপোর্টের সারাংশ বুঝতে পেরেছেন। আমাদের ভয় ছিল যে তিনি হয়ত বাংলা বুঝতে পারবেন না, তাই প্রথম দিন অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল ইংরেজীতে। কিন্তু এটুকু বাংলা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা, এ ছাড়াও অন্য দু'একটি ভারতীয় ভাষার সাধারণ জ্ঞানও রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কর্মীদের থাকা উচিত বলেই তিনি মনে করতেন। বেশ কিছুদিন পূর্বেকার কথা। একদিন সেবাগ্রামে বসে মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলছি। সর্দার বল্লভভাই এলেন, আসা মাত্রই মহাত্মাজী গুজরাটীতে কথা আরম্ভ করলেন। আমি হেসে হেসে বললাম, "বাপু, গুজরাটীরা বড় সংকীর্ণ, যেই একজন গুজরাটী এলেন অমনিই আপনিও গুজরাটীতে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ভুলে গেলেন যে আর এক ব্যক্তি আছে যে গুজরাটী জানে না।" বাপু অমনি বলে উঠলেন, "ব্যাপার কি—তুমি এইটুকু গুজরাটী বুঝতে পারনা!" সাধারণ ভাবে গুজরাটী ভাষায় জ্ঞান লাভ করার পর বুঝতে পারি বাংলা গুজরাটীর কত কাছাকাছি। শুধু কানটা শুনতে অভ্যস্ত নয় বলে মহাত্মাজীর কথা তখন বুঝতে পারি নি।

মহাত্মাজী ভারতীয় ঐক্যের জন্যই চেয়েছিলেন ইংরেজীর প্রাধান্য দূর করতে। কিন্তু আজকাল শুনছি ইংরেজী ভাষাই নাকি ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সে ঐক্য বজায় রাখবার জন্য ইংরেজী শিক্ষা অপরিহার্য। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার কাজে অগ্রণী ছিলেন ইংরেজীতে সুশিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তিরাই। সম্প্রতি আসামে যে জাতীয় সংহতি বিনষ্টকারী দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল তার মধ্যেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা। দক্ষিণ ভারতকে পৃথক্ করার অন্দোলনও ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা পরিচালিত। উড়িষ্যায় ডাক্তারের অভাবে হাসপাতালে রোগীদের

চিকিৎসা সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই উড়িষ্যা সরকার বাঙালী ডাক্তার নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। ফলে উড়িষ্যা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে, এই আশঙ্কায় যে ভবিষ্যতে তাঁদের চাকুরী মিলবে না। এরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভবিষ্যতের সমাজসেবী ডাক্তার!

আসল কথা হচ্ছে এই যে, পরাধীনতার অপমানে ভারতবাসী অনেকটা একত্র হয়েছিল ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে। সে অপমানের জ্বালা দূর হওয়ার অল্প পরেই সে কথা ভুলে স্বার্থবুদ্ধি-প্রবল হয়ে পড়েছে লোকজন। ফলে একত্র থাকার প্রেরণাও হয়েছে অনেকাংশে শিথিল। আজ বুঝবার দিন এসেছে যে, ভারতবর্ষের অগ্রগতির জন্যই বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, মালয়ালী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতিদের একত্র থাকা দরকার। প্রত্যেক প্রদেশের লোকেরই কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য আছে। সে সবের সার্থক প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন ভারতবর্ষের অগ্রগতির জন্য। মহাত্মাজী ভাল করেই বুঝতেন সে জিনিসটা। তাই তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সকল প্রান্তকে সংযোজিত করার সিমেণ্ট বা গাঁথুনি স্বরূপ। সে সিমেণ্টের মালমসলা ছিল সকলের প্রতি প্রেম, চরিত্রবল ও উঁচু নৈতিক মান। আজ দেশে আসল সংকট চরিত্রের দেউলিয়াপনা। সেটা বেশী করে প্রকট শিক্ষিত সমাজে। সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যদি চরিত্রের দিক দিয়ে আদর্শস্থানীয় হওয়ার চেষ্টা করেন তবেই এ অধঃপতনের গতিরোধ সম্ভব। নতুবা প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে দেশ গিয়ে পৌঁছবে অবনতির নিম্নতম স্তরে। দ্রুত সেদিকে চলছে দেশ। ব্যাধির মূল কারণ দূর না করে উপর-উপর প্রলেপ দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ মহাত্মাজীর মত একটি লোকের প্রয়োজন দেশে সর্বাধিক, যিনি হতে পারেন ঘন অন্ধকারে দীপবর্তিকা।

রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর প্রথম প্রবেশ দক্ষিণ আফ্রিকায়। কোন পরিকল্পনা করে তিনি সেখানে যাননি। বোম্বেতে ও রাজকোটে

ব্যারিস্টার হিসাবে ব্যর্থতার দরুন তাঁকে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর মামলা নিয়ে যেতে হয় নিছক অর্থোপার্জনের জন্য। সেখানে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় ও অমানুষোচিত আচরণ দিল তাঁকে নূতন পথের সন্ধান। তিনি আবিষ্কার করলেন সত্যাগ্রহ। দীর্ঘ কয়েক বৎসরের সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পর জয় ঘোষিত হল গান্ধী-স্মাটস্ চুক্তিতে। এখানেই রূপ নিল তাঁর জীবনদর্শন যা ১৯০৯ সালে 'হিন্দ্ স্বরাজ' নামক পুস্তকে হল লিপিবদ্ধ—লণ্ডন হতে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরবার পথে জাহাজে। আজ সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো সাদার বিদ্বেষ আরো তীব্র করে তুলেছে সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা। বিংশ শতাব্দীতেও সেখানে প্রকট নগ্ন জাতিবিদ্বেষ। এক বার জয় হলেই যে তা স্থায়ী হয় না দক্ষিণ আফ্রিকা তার প্রমাণ। অনেক সময় রূঢ় আঘাত আসে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, মানুষের প্রভুত্বস্পৃহা নূতন ভাবে তীব্ররূপে দেখা দিতে পারে। নানা ভাবে নানা আকারে দুনিয়ায় আজ চলছে প্রভুত্বস্পৃহা বা হিংসার অভিব্যক্তি। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব ও দ্রুত উন্নতির সঙ্গে মানবীয় বৃত্তির বিকাশ তাল রেখে চলতে পারেনি বলেই দুনিয়ায় ঘটছে নানা অঘটন। শান্তির নামে ধ্বংসের বিপুল আয়োজনে সমস্ত মানবজাতি আজ ভীতত্রস্ত। উপলব্ধি করবার দিন এসেছে যে, হিংসা দ্বারা হিংসা জয় হয় না বরং হিংসা আরও রুদ্ররূপ ধারণ করে। অহিংসা বা প্রেমই হিংসাকে জয় করতে পারে এবং সে জয়ই হয় সকলের কল্যাণের। ভারতের চিন্তানায়কদের আজ বেছে নিতে হবে কোন পথে ভারত চলবে। যদি নিষ্ঠা সহকারে মহাত্মাজীর পথ ধরে আমরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমূহের সমাধান করতে পারি তবে পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান করতে পারব সে পথে। আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে হবে তা ভারতের শ্রেষ্ঠ দান—"সর্বপ্রদানেষু অভয়প্রদানম্"—সমস্ত মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা। আধুনিক বিজ্ঞান যা পারেনি তা করতে

সমর্থ হবে প্রেম। তা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞানঘন। এই মহাত্মাজীর জীবনদর্শন।

১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হতে বিদায় নিয়ে এলেন ভারতে। প্রথমে তাঁর রাজনৈতিক গুরু মহামতি গোখলে ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স আশ্রমের ভারতীয় সহকর্মীরা পূর্বেই এসেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিলও ছিল অনেক, অমিলও ছিল অনেক; কিন্তু একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল অপারসীম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহাত্মাজী কবিকে সম্বোধন করতেন 'গুরুদেব' বলে, আর কবিও তাঁকে 'মহাত্মাজী' বলতেন। সেই সময় মহাত্মাজীর কার্যাবলী লক্ষ্য করতে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমাদের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে যান। দুই-তিন দিন থেকে আমাদের সব কথা লিখে পাঠান। তিনি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত কি এ প্রশ্ন করেন। সংক্ষিপ্ত উত্তরে মহাত্মাজী বলেন, "যেখানে শিল্পকলা, সেখানেই জীবন।" দুজনেরই ছিল শিল্পী মন। এইখানেই দুই সৃষ্টিধর্মী মহাপ্রতিভার মিলনক্ষেত্র।

ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করেন তিনি প্রথম চম্পারনে (বিহার)। এখানেও তিনি আইন অমান্যের পরিকল্পনা করে যান নি। সরকারী কর্মচারীর অন্যায় আদেশ তিনি অমান্য করেন। ফলে চাষীদের প্রাণে আসে বল। অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। আবার নীলের চাষ উঠে যেতই। আলকাতরা চুঁইয়ে প্রাপ্ত ন্যাপথলিন হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সস্তা দরে কারখানায় নীল তৈরীর প্রণালী জার্মেনীতে আবিষ্কৃত হয়ে সেই নীল বাজারে আসায় নীল চাষ লাভজনক ব্যবসাও ছিল না। এই দুই কারণে চম্পারনে সহজে জয়ী হলেন মহাত্মাজী। ভারতবর্ষের ঘটনাপরম্পরা ক্রমে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল ব্যাপক গণ-আন্দোলনের দিকে। রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী কালের সরকারের দমননীতি প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সহযোগীকে ১৯২০ সালে করে তুলল অসহযোগ মন্ত্রের উদ্‌গাতা। তার মাত্র কয়েকমাস পূর্বে অমৃতসর কংগ্রেসেও মণ্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য তিনি লোকমান্য তিলকের নিকট আবেদন করেছিলেন "অবশেষে ভগবদ্‌গীতার লেখকের নিকট সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করার আবেদন জানাচ্ছি।"

তিনিই অহিংস অসহযোগের দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে সমস্ত জাতিকে আহ্বান করলেন। মহাত্মাজীর মন মোটেই স্থিতিশীল ছিল না, পুরাপুরি গতিশীল ছিল। অবশ্য তাঁর মন স্বভাবতঃ ছিল সহযোগিতাপ্রবণ, অবস্থার দরুন অসম্ভব হলে অসহযোগ অস্ত্র ব্যবহারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। পরবর্তী জীবনেও দেখেছি তাঁর সে নীতি। এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হবে এই ছিল তাঁর দৃঢ় প্রতীতি। অবশ্য তিনি এ কথা ঘোষণা করেছিলেন যে কতকগুলি কাজ যদি করা হয় তবে এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হবে। সে কাজ জাতির পক্ষে করা অনেকাংশে সম্ভবপর কি না তা বিচার করেই কার্যক্রম উপস্থিত করা সঙ্গত। নইলে তা হয় অবাস্তব। নাগপুর কংগ্রেসের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে মহাত্মাজীর সঙ্গে কলিকাতায় প্রথম দেখা করবার সৌভাগ্য হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে এক বৎসরে স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করি। যদিও আন্দোলনের ফলে দেশ স্বরাজের দিকে অনেকদূর এগিয়ে যাবে এ কথা বলি। তখন তিনি দৃঢ় কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন "আমার ভগবানে বিশ্বাস আছে, আমার নিজের উপরও বিশ্বাস আছে, আমি বলছি তোমাকে যে এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হবে।" সেখানে হলেন মহাত্মাজী ব্যর্থ।

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময় আবার নেতৃত্বের ভার পড়ে তাঁর উপর। এবারও ডাণ্ডি যাত্রার পূর্বে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, স্বরাজ লাভ না করে তিনি আর সবরমতী আশ্রমে ফিরবেন না। হয় তাঁর মৃতদেহ আরব সাগরের জলে ভাসবে, নয় ত স্বরাজ লাভ হবে। কিন্তু তিনি হলেন ব্যর্থ, স্বরাজ লাভ হল না। অবশ্য ১৯৩১ সালের

গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী সমুদ্রোপকূলবর্তী লোকেরা বিনা শুল্কে লবণ তৈরী করার অধিকার পেল। তিনি আর সবরমতী আশ্রমে ফিরলেন না। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স হতে ফিরে আসার পর ১৯৩২ সালে পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাও হয় ব্যর্থ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্টের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব অনুযায়ী আন্দোলনও ফলপ্রসূ হয় নি। যুদ্ধে অসহযোগিতার এই প্রস্তাবের ফল সম্বন্ধে বৃটেনের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চিল দম্ভ করে বলেছিলেন যে, বৃটেনের যত সৈন্য ও লোকবল দরকার ছিল ভারত হতে তার চেয়ে বেশী পেয়েছেন। মোট কথা ১৯২১ সালের অহিংস অসহযোগ হতে আরম্ভ করে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সবই হল আশু ফললাভের দিক দিয়ে ব্যর্থ। কিন্তু এই সব ব্যর্থতার সমষ্টির সঙ্গে মহাযুদ্ধজনিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যর্থ অভিযান সব মিলে ভারতে এল স্বাধীনতা। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তখন বৃটেনে শ্রমিক সরকার না থাকলে ভারত স্বাধীন হতে আরও দেরী হত। এর পূর্বে রক্ষণশীল সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন "আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটাবার জন্য রাজার প্রধান মন্ত্রী হই নি"। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, আপাতব্যর্থতাই সত্যের সবখানি নয়, তার মধ্যে লুক্কায়িত থাকতে পারে জয়ের ইঙ্গিত। অতীত ব্যর্থতা যে জাতিকে ভীত ত্রস্ত করে সে জাতি চিরদাসত্বেরই অধিকারী। কিন্তু তাই বলে একবার একটা ঠিক করলে নির্বিচারে তা ধরে থাকা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, কল্যাণকরও নয়। আসল কথা উদ্দেশ্য ঠিক কিনা, অবলম্বিত উপায় সৎ কিনা, সে উপায়ের প্রয়োগে কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে কিনা এসবই বিচার্য। বিচার করেই আমাদিগকে সর্বদা চলতে হবে। গান্ধী নীতির বৈশিষ্ট্য—উদ্দেশ্য বা ধ্যেয় এবং পন্থা বা উপায় দুইই সৎ হওয়া চাই। ভাল উদ্দেশ্য

সাধনের জন্যও অসৎ উপায় অবলম্বন সমর্থনীয় নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই গান্ধীনীতির গোড়াকার কথা।

ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে এল সফলতা বা স্বাধীনতা। তার মধ্যেও সুস্পষ্ট ব্যর্থতার ছাপ। অহিংস উপায়ে স্বরাজ লাভের মূল কথা সাম্প্রদায়িক ঐক্য। খণ্ডিত ভারত হিন্দু মুসলমান অনৈক্যের চরম পরিণতি। ভারত ও পাকিস্তানের পৃথক্ অস্তিত্ব সে নিদারুন সত্যকে ধরে তুলেছে সমস্ত জগতের কাছে। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই আসে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করবার প্রস্তাব। বাংলাকে ভাগের অপকারিতার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ভারত ও পাকিস্তান হতে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব হয়। বাংলার এই হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাবের সঙ্গে মহাত্মাজীর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের পেছনে জনমত ছিল না। ভারত ভাগ হলে বাংলা ভাগ অনিবার্য এই ছিল তখন বাংলার জনমত। তাই এই প্রস্তাব স্বল্প কয়েকজনের আলোচনার বস্তু হয়েই থাকে। আর বেশী দূর এগোয় নি। হিন্দু মুসলমানের অনৈক্য—যার নগ্ন অভিব্যক্তি হয় ব্যাপকভাবে খুন, জখম, লুট, গৃহদাহ, নারীনির্যাতনের ভিতর দিয়ে—শেষ জীবনে মহাত্মাজীর প্রাণে দেয় দারুন ব্যথা। একের পর এক কলিকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব ও দিল্লীর নিদারুন ঘটনাবলী তাঁকে ভীষণ বিচলিত করে। কিন্তু তিনি অহিংসায় বিশ্বাস হারান না, যথাসাধ্য অহিংস শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করেন। তবে এক এক সময় তাঁর মনে হয় সব ব্যর্থ হতে বসেছে—জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হতে চলেছে। আবার কখনও বা ভাবেন তবে কি তিনি ভগবানের অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হলেন! এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর শেষ উপবাস। উপবাস সমাপ্তির মাত্র কয়েকদিন পরে ২৬শে জানুয়ারী শেষ সাক্ষাতের সময় বুঝতে পারি তাঁর মনের অবস্থা। তখন আর ১২৫ বৎসর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা নেই। সরকারের উপরও

সন্তুষ্ট নন। মন যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করছে। মনে হল আলো দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্য তখনও মনে কোন কার্যক্রম স্থির করেন নি। অন্ততঃ তার কোন ইঙ্গিত দেন নি। বললেন "২রা ফেব্রুয়ারী হতে সাত দিনের জন্য ওয়ার্ধায় একত্র হচ্ছি—আসতে হবে, সাত দিনই থাকতে হবে। অন্য কোন কার্যক্রম রেখো না।" সে ২রা ফেব্রুয়ারী আসবার পূর্বে ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় নাথুরাম গডসের গুলিতে নিভে গেল তাঁর জীবনদীপ। মুখে রাম নাম। মর দেহ গেল—রেখে গেলেন অনির্বাণ দীপ—তাঁর জীবন ও বাণী। কিন্তু সে দীপশিখা আজ মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় নিষ্প্রভ। মেঘ কেটে যাবে—শুধু ভারত নয় সমস্ত দুনিয়াকে আলোকিত করবে। জগতে বিরাজ করবে শাশ্বত শান্তি প্রেম ও মৈত্রী। জগৎ বুঝবে গান্ধী মরে নি—গান্ধী অমর।

আঁধারে আবৃত আমি, এস জ্যোতির্ময়
দয়ানিধি, সম্মুখেতে নিয়ে চল মোরে।
রাত্রি অন্ধকার, ঘর বহু দূরে রয়,
জ্যোতির্ময় সম্মুখেতে নিয়ে চল মোরে ॥

দূর দৃশ্য দেখিবার আশ
নাহি কভু অন্তরে আমার।
এক ধাপে মানিব সন্তোষ
অচঞ্চল রেখো পদ মোর ॥

— নিউম্যান

প্রথম অধ্যায়

জন্ম, বংশ ও বাল্যজীবন

ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের তীরে ছোট্ট শহর সুদামাপুরী বা পোরবন্দর। কাথিয়াওয়ার তথা গুজরাটে আরব সাগরের তীর ধরে কাথিয়াওয়ারের এই অঞ্চলের অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। দ্বারকা, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থ এই অঞ্চলে। শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলার বন্ধু সুদামার নামে এই শহরটি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই শহরে সংবত ১৯২৫ ভাদ্র বদ ১২ বা কৃষ্ণাদ্বাদশী (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ ২ অক্টোবর) তারিখে জন্মগ্রহণ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইনিই পরে মহাত্মা গান্ধী নামে খ্যাতি লাভ করেন।

গুজরাটে চান্দ্রমাস প্রচলিত। শুক্ল ও কৃষ্ণ বা গুজরাটী ভাষায় সুদ ও বদ এই দুই পক্ষে মাস বিভক্ত। গুজরাটী পাঁজি অনুযায়ী মোহনদাসের জন্ম ভাদ্র কৃষ্ণা দ্বাদশীতে। বাংলার পাঁজি অনুযায়ী আশ্বিন কৃষ্ণা দ্বাদশীতে।

প্রথম নিজের নাম, তারপর বাবার নাম ও শেষে উপাধি এই ভাবে পুরা নাম লিখবার প্রথা তখন গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। অবশ্য আজকাল কেউ কেউ মাঝখানে বাবার নাম লেখার প্রথা বাদ দিচ্ছে। অতএব মহাত্মাজীর নিজের নাম হল মোহনদাস। পরিবারের সকলে আদর করে ডাকত 'মোহনিয়া' বলে। বাবা করমচাঁদ—পুরানাম করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী, ডাক নাম কাবা গান্ধী। এঁরা জাতিতে বেণে। গান্ধী শব্দের অর্থ মুদী। কিন্তু মহাত্মাজীর উর্ধ্বতন তিন পুরুষ বেণের কাজ করতেন না। কাথিয়াওয়ারের দেশীয় রাজাদের দেওয়ানের কাজ করতেন।

কাবা গান্ধী এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর এক এমনি করে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর চতুর্থবারে বিয়ে করেন পুতলী বাইকে। পুতলী বাইয়ের

গর্ভে তিন ছেলে এক মেয়ে জন্মে। প্রথম লক্ষ্মীদাস, তার পর রলিয়াৎবেন বা গোখীবেন, তৃতীয় কর্ষণ দাস, সবার ছোট মোহনদাস।

পুতলী বাই ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণ। প্রার্থনা না করে খেতেন না, মন্দিরে যেতেন নিয়মিত। ব্রত, উপবাস ইত্যাদি খুব নিষ্ঠা সহকারে পালন করতেন। কাবা গান্ধী ছিলেন সাহসী, সত্যবাদী, উদার, স্বজাতিবৎসল কিন্তু ক্রোধী। তিনি লেখাপড়া অল্পই করেছিলেন, তবে ব্যাবহারিক বুদ্ধি ছিল প্রখর। তাঁর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব বা দুর্নীতি-পরায়ণতা ছিল না মোটেই। এজন্য তাঁর সুনামও ছিল। কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সের পর চতুর্থবার বিয়ে করাকে কতকপরিমাণে ইন্দ্রিয়াসক্তির নিদর্শন বলেই উল্লেখ করেছেন মহাত্মাজী।

কাবা গান্ধী প্রথমে পোরবন্দরে দেওয়ান ছিলেন, পরে রাজকোটে রাজস্থানিক কোর্টের সভ্য হয়ে সেখানে যান। এই দুই জায়গায়ই এঁদের বাড়ী ছিল। বাড়ী ঘর দেখে বেশ সঙ্গতিপন্ন পরিবার বলেই মনে হয়। ছেলেদের পড়বার পৃথক্ ঘরও ছিল কিন্তু কাবা গান্ধীর অর্থ জমাবার প্রবৃত্তি ছিল না। তাই তিনি মৃত্যুকালে বিষয় সম্পত্তি বেশী কিছু রেখে যান নি।

মোহনদাস ছেলেবেলায় প্রথম পোরবন্দরেই পাঠশালায় ভর্তি হন। অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে পাঠশালার গুরুমশায়ের নামে ছড়া কাটতেন। আমার ছেলেবেলায় বাংলাদেশেও গুরুমশায়দের নিয়ে ছড়া কাটতে দেখেছি। আজকালও সে রেওয়াজ কিছু কিছু আছে। গুরুমশায়কে নিয়ে ছড়া কাটলেও মোহনদাস তাঁর ভাই বোনদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করতেন না বলেই গোখীবেন আমাকে বললেন। এদিক দিয়ে স্বভাব ছিল নরম ও শান্ত। ছাত্র হিসাবে যে এই সময় ভাল ছিলেন তা বলা চলে না। অতি কষ্টে 'নামতা' আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

সাত বৎসর বয়সে বাবার সঙ্গে চলে যান রাজকোটে। সেখানে প্রথম এক পাঠশালায়, পরে শহরের উপকণ্ঠের এক স্কুলে এবং শেষে

বারো বৎসর বয়সে শহরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্র হিসাবে তিনি মাঝারি রকমের ছিলেন। কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। ঠিক ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে তিনি স্কুলে ঢুকতেন আর ছুটি হওয়া মাত্রই এক প্রকার দৌড়িয়ে বেরিয়ে যেতেন। যেন কারো সঙ্গে মিশতে না হয়। ভয় পাছে তাঁকে নিয়ে কেউ হাসি-তামাসা করে। তদুপরি খুব লাজুকও ছিলেন।

মাঝারি রকমের ছাত্র হলেও একবার ডবল প্রমোশন পান, পুরস্কার এমনকি কাথিয়াওয়ারের সোরঠ বিভাগের উত্তম ছাত্র হিসাবে দুই বার মাসিক চার টাকা ও দশ টাকা হারে বৃত্তি পান। অবশ্য ক্লাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছাত্রের মধ্যে এই বিভাগের ছাত্রসংখ্যা অল্পই ছিল। প্রতি বৎসর স্কুল হতে মা বাপের কাছে ছাত্রের প্রগতিপত্র পাঠানো হত, কিন্তু কোনদিন তাঁর সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য যায় নি। তিনি যথাসাধ্য পড়াশুনা করেই স্কুলে যেতেন। ছাত্র বা শিক্ষক কারো কাছেই কখনো মিছে কথা বলতেন না। বাইরের বই পড়বার বড় একটা সময়ও থাকত না, সাধারণতঃ পড়তেনও না। কিন্তু একবার তাঁর বাবা 'শ্রবণ পিতৃভক্তি' নামক একখানা নাটক কিনে আনেন। সেই নাটক খানা পড়ে তাঁর খুব ভাল লাগে। সেই সময় কাচচিত্র দেখাবার জন্যও লোক যেত ঘরে ঘরে। সেখানেও কিভাবে পিতৃভক্ত শ্রবণ অন্ধ মা বাপকে কাঁধে ঝোলায় করে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন তা দেখেন। শ্রবণের মৃত্যুতে অন্ধ মা বাপের করুণ বিলাপ তাঁর কোমল হৃদয় গলিয়ে দেয়। মনে মনে এইরূপ মা-বাপের ভক্ত হওয়ার কথা ভাবেন। বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে ওই বিলাপের করুণ সুর বাজিয়ে বালক মোহনলাল মত্ত হয়ে যেতেন।

যাত্রা দেখবার শখ ছিল তাঁর। কিন্তু বাবার অনুমতি ভিন্ন যেতে পারতেন না। অর্থাৎ কি পালা হবে তা বুঝেই অনুমতি দেওয়া হত। ওই সময় এক যাত্রা কোম্পানী এল। হরিশ্চন্দ্র পালা। বাবার অনুমতি নিয়ে দেখতে গেলেন। এই যাত্রা তাঁর মনের উপর গভীর

প্রভাব বিস্তার করে। যাত্রা বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়। হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী কেন বেশী হয় না এই কথা ভাবেন। এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করেও হরিশ্চন্দ্রের সত্যরক্ষাই খাঁটি সত্যপালন। হরিশ্চন্দ্রের দুঃখ দেখে তাঁর কান্না আসে। শ্রবণ বা হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না কে বলতে পারে। কিন্তু তাঁদের উপাখ্যান নিছক সত্যরূপে মোহনদাসকে প্রভাবান্বিত করে। হাতের লেখা ভাল করার দিকে তাঁর মোটেই লক্ষ্য ছিল না। প্রথম দিকে এটা সুশিক্ষার একটা অঙ্গ বলেও মনে করতেন না। যখন সে জ্ঞান হল তখন আর শোধরাতে পারেন নি। শেষ পর্যন্তও তাঁর হাতের লেখা পড়তে অনেকেরই বেশ কষ্ট হত।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঢুকবার প্রথম বৎসরেই মিঃ জাইলস নামক এক ইংরাজ স্কুলপরিদর্শক আসেন। তিনি মোহনদাসদের ক্লাসে গিয়ে পাঁচটি ইংরেজী শব্দের বানান লিখতে দেন। অন্য সব ছেলেই বানান ঠিক ভাবে লেখে, শুধু মোহনদাসের একটি বানান ভুল হয়। শিক্ষক মশায় তা লক্ষ্য করে পায়ে জুতার ঠক্কর দিয়ে পাশের ছেলের খাতা দেখে বানান শুদ্ধ করার ইঙ্গিত দেন। মোহনদাসের স্বাভাবিক সরলতার জন্য সে ইঙ্গিত বুঝতেই পারেন না। পরে যখন শিক্ষক মশায় তাঁকে ইঙ্গিত না বুঝার নির্বুদ্ধিতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক মশায়ের কার্যকে অসঙ্গতই মনে করেন—শিক্ষকদের কাজ নয় ছাত্রকে নকল করতে শেখানো।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ মান হতে শিক্ষার মাধ্যম হয় ইংরেজী। এটা হয় তাঁর পক্ষে মস্ত বড় অসুবিধা। এ অসুবিধা তাঁর মনের উপর এমন দাগ কেটে যায় যা তিনি বড় হয়েও ভুলতে পারেন নি। তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটী মাধ্যম হলে তিনি সব জিনিস আরো সহজে আয়ত্ত করতে পারতেন বলে মনে করেন।

স্কুলে ব্যায়াম বা খেলাধুলা তিনি বড় একটা করতেন না। এদিকে তাঁর মনও ছিল না। তিনি কোন বইতে পড়েছিলেন যে বেশী দূর

হাঁটা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। সেই হতে হাঁটা অভ্যাস করেন এবং মনে করেন আর কোন ব্যায়াম বা খেলার প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও তাঁর হাঁটা অভ্যাস ছিল। বুড়া বয়সে হাঁটাটাই যথেষ্ট, কিন্তু বাড়ন্ত বয়স বা যৌবনে আরো বেশী কিছু দরকার। দৌড়, সাঁতার, খেলা, কৃষি-খেতে কাজ প্রভৃতি শরীরকে আরো সবল ও সুদৃঢ় করে। এটা উপলব্ধি না করাই হয়েছিল তাঁর ভুল।

সংস্কৃত কঠিন এবং কেবলি মুখস্থ করতে হয় তাই তিনি এক সময় সংস্কৃত ছেড়ে পারসী ভাষার ক্লাসে যান। মৌলবী সাহেব খুব সহজে পাশ নম্বর দেন, এমনকি যথেষ্ট নম্বর দেন এই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা। আমরাও ছাত্রজীবনে দেখেছি পারসীতে আমাদের সহপাঠী সাধারণ মুসলমান ছাত্রেরা কেউ কেউ ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯০-৯৫ পেয়েছে, যা খুব ভাল ছাত্রের পক্ষেও সংস্কৃতে পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণশঙ্কর পাণ্ড্যাজী মোহনদাসের এই কার্যে খুব দুঃখিত হন এবং ডেকে বলেন, "তুমি কার ছেলে তা ভাব, এক বৈষ্ণব পরিবারে তোমার জন্ম, সংস্কৃত তোমার ধর্মের ভাষা। যদি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় আমাকে বলো। আমি তো সকল ছাত্রকে সাধ্যমত সংস্কৃত শিখাতে চাই। ভবিষ্যতে এর রসপান করতে পারবে। তোমার হার মানা উচিত নয়। আমার ক্লাসে এসো।" পণ্ডিত মশায়ের এই সহৃদয় ব্যবহারের অবমাননা তিনি করতে পারেন নি। পুনরায় সংস্কৃত পড়তে গেলেন। এজন্য তিনি জীবনে পাণ্ড্যাজীর কাছে কৃতজ্ঞ বলেই মনে করেন। সংস্কৃত শিখেছিলেন বলেই হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র পড়তে পেরেছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রের—মেয়ে এবং পুরুষ—উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত পড়া উচিত।

মোহনদাস ছাত্র বা শিক্ষক কারো কাছে মিছে কথা বলতেন না। একবার তিনি ব্যায়ামের ক্লাসে সময়মত না যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত বলে গণ্য হন। প্রধান শিক্ষক অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

উত্তর বিশ্বাস না করে মোহনদাসকে করেন জরিমানা। ওই সামান্য জরিমানার জন্যে তাঁর দুঃখ হয় না, কিন্তু দুঃখ হয় প্রধান শিক্ষক তাঁর কথা বিশ্বাস করেন নি বলে। তিনি এজন্য একাকী কাঁদেন। পুনরায় গিয়ে শিক্ষককে তাঁর কথা নিবেদন করেন। নিবেদনের ফল হল জরিমানা মাপ, কিন্তু ভবিষ্যতে সময়মত আসবার নির্দেশ রইল। এই ঘটনা হতে বিশেষভাবে শেখেন সময়নিষ্ঠা। যা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। এমনি করে গড়ে উঠেছিলেন ভবিষ্যতের মহাত্মা গান্ধী।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কয়েকটি জিনিসের প্রভাব পড়ে ঃ— (১) বংশ, (২) পরিবেশ, (৩) আবহাওয়া, (৪) খাদ্য ও (৫) শিক্ষা। এর উপরও একটি জিনিস আছে যার হদিশ মানুষ এখনো পায় নি—তাই তাকে বলে 'দৈব'। মানবপ্রকৃতি বাস্তবে এক হলেও এই সব কারণে তার অভিব্যক্তি বিভিন্নরূপ। বাবা-মায়ের শারীরিক সামর্থ্য এবং অসুখ অনেক সময় ছেলেমেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। তাদের নৈতিক গুণাগুণও পায় বলে মনে হয়। তাই গীতায় আছে "শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পবিত্র বিভূতিসম্পন্ন লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। এর অর্থ এই যে, পবিত্র বিভূতিমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে আরো সদ্‌গুণের অধিকারী হবে। আবার দেখতে পাই এক বাপ-মায়ের দুই ছেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মহাত্মাজী জগদ্বিখ্যাত কিন্তু তাঁর দুই সহোদরের নামও খুব কম লোকে জানে। এক বাপ-মায়ের ছেলে, একই রকম পরিবেশে থেকে একই রকম খাওয়া-দাওয়া শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি পেয়েও এক রকম হয় না এ ত আমরা হামেশা দেখছি। মানুষ যে কি, বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও তা আমাদের কাছে এখনো রহস্যময়। আমরা মানুষ সম্বন্ধে খুব কমই জানি। আবার শিশুমন যে কি ভাবে অবাঞ্ছনীয় জিনিস গ্রহণ করে তাও দেখতে পাই মহাত্মাজীর জীবনে।

কাকা বিড়ি খেতেন। তিনি যে বিড়ি খেয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তেন, বারো তেরো বৎসরের মোহনদাসের সেরূপ করার ইচ্ছা হয়। বিড়ির গন্ধ ভাল, কিংবা বিড়ি খেলে কোন উপকার হয় এ ধারণা থেকে নয়, নিছক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করার উদ্দেশ্যেই বিড়ি খাওয়া শুরু করেন। প্রথমতঃ কাকার ছুঁড়ে ফেলা বিড়ির গোড়ার দিকটা দিয়ে খেতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তা সব সময় পাওয়া যায় না, আর পেলেও ধোঁয়া ছাড়বার পুরা সুবিধা হয় না। অতএব পুরা বিড়ি চাই। কিন্তু পয়সা কোথায়! তাই আরম্ভ হল বাড়ীর চাকরদের পকেট হতে দু এক পয়সা চুরি। আবার বিড়িও খেতে হয় বড়দের অসাক্ষাতে। সব বিষয়ে অভিভাবকদের উপর নির্ভরতা মনে হল অসহ্য। অথচ উপায় নেই। তাই এল জীবনে বীতস্পৃহা। বিড়ি খাওয়ার সাথী আত্মীয়টির সঙ্গে মিলে সংকল্প করলেন আত্মহত্যা করবার। সেজন্য জঙ্গল থেকে ধুতরাবীজ সংগ্রহ হল, এমনকি খাওয়ার স্থানও স্থির হল। শেষ পর্যন্ত অল্প ধুতরা বীজ খেয়েই থেমে গেলেন। আত্মহত্যা করার সাহস হল না। আত্মহত্যার সংকল্প যত সহজ তা কার্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। এই ধারণা তাঁর জীবনে খুব দৃঢ়মূল হয়ে ছিল। একবার গিয়েছি দেখা করতে সবরমতী আশ্রমে। একটি চিঠি পড়ছিলেন। বললেন 'দেখ, অমুকে চিঠি লিখেছে যে এত টাকা পাঠান, নইলে আত্মহত্যা করব। আত্মহত্যা করা কি এতই সহজ!' এই বলে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আত্মহত্যা প্রচেষ্টার ফল হল বিড়ি খাওয়া বন্ধ।

শিশু অভিভাবকদের ভাল মন্দ দুইয়েরই অনুকরণ করে। কাজেই বাড়ীর শিশুদের কল্যাণের জন্যই অভিভাবকদের সংযত হওয়া উচিত। কাকা যদি ওইরূপ ভাবে ছেলেদের সামনে বিড়ি না খেতেন তা হলে হয়ত মোহনদাসের মনে বিড়ি খাওয়ার ইচ্ছা হত না। বাংলা দেশে ছোটবেলায় দেখেছি অনেক ছেলে তামাক খাওয়া শিখেছে অভিভাবকের হুকুমে তামাক সেজে আনতে গিয়ে।

বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস কেবল সাথীর প্রভাবে হয় নি। কিন্তু এই একটি কেন, আরও বেশী অবাঞ্ছিত অভ্যাস হল সাথার প্রভাবে। তাঁর দাদা কর্ষণদাসের এক সহপাঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। সে কেবলি বুঝাতে থাকে নিরামিষাশীরা দুর্বল আর মাংসভোজী সবল। ইংরেজরা মাংস খায় বলেই ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করতে পারছে। মাংস খেয়ে বলীয়ান্ হলে ইংরেজের প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে পারবে। তাঁর দাদাও এ মত সমর্থন করেন। বন্ধুটি খুব সবল ও পরিশ্রমী। উঁচু লাফ দিতে পারদর্শী। এ গুণ ছিল না মোহনদাসের। মাংস খাওয়ার উপরই এ গুণ আরোপ করা হল। অবশেষে মোহনদাস মাংস খাওয়া স্থির করলেন। তিনজনে মিলে মাঝে মাঝে মাংস খাওয়া চলল। অবশ্য গোপনে। গান্ধী পরিবার গোঁড়া বৈষ্ণব। তদুপরি গুজরাটে জৈনদের প্রভাব খুবই। অতএব মাংসাহার করতে হত গোপনে। মাংসাহার করে বাড়ীতে এসে ক্ষুধা নেই বলে মাকে ধোঁকা দিতে হত। এ মিথ্যাচার তাঁর প্রাণে দিল দারুন ব্যথা। অথচ মা বাপকে বলে মাংস খাওয়া যাবে না। তাঁদের প্রাণে লাগবে বিষম আঘাত। তাই স্থির করলেন বাপ মা জীবিত থাকা পর্যন্ত আর মাংস খাবেন না। যখন তাঁদের মৃত্যুর পর প্রকাশ্যে খেতে পারবেন তখন খাবেন। কিন্তু সে সময় যখন এল তখন তিনি নিরামিষ আহারের গুণমুগ্ধ।

মাংস খাওয়ার খরচের কর্জ শোধ হল কর্ষণদাসের হাতের সোনার বাজুর খানিক অংশ কেটে। এই চুরিও তাঁর প্রাণে এনে দিল দারুন অনুশোচনা। বাবা তখন রুগ্ন। তাঁকে মুখে বলতে পারলেন না। খোলাখুলি সব কথা লিখে তাঁর হাতে কাগজখানা দিলেন। ভবিষ্যতে এমন আর হবে না এ প্রতিশ্রুতিও ছিল তাতে। বাবা লেখা পড়ে উঠে বসলেন। গভীর দুঃখে চোখের জল ফেললেন। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। কাগজ ছিঁড়ে ফেললেন। মোহনদাসও কাঁদলেন। সত্যিকারের অনুশোচনা ও পুত্রস্নেহ ঘটাল শুভ পরিসমাপ্তি।

কিন্তু বন্ধুটির সঙ্গ ছাড়লেন না। এমনকি বাড়ীর সবার পরামর্শও

শুনলেন না। বরং বললেন বন্ধুর দোষ আছে ঢের, গুণও আছে তেমনি। তার দোষ সংশোধন হলে সে একজন মস্ত বড় লোক হবে, তাই সংশোধনের চেষ্টাই হচ্ছে তাঁর কাজ। এখানে হয়েছিল তাঁর মস্ত বড় ভুল। বন্ধুর সংশোধন ত দূরের কথা—বন্ধুর প্রভাবে মোহনদাস চললেন ক্রমাবনতির পথে। এমনকি বন্ধু একদিন তাঁকে প্রলুব্ধ করে বেশ্যাবাড়ী পাঠিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। কোন অদৃশ্য হস্ত যেন তাঁকে রক্ষা করলেন।

এর কয়েক বৎসর পূর্বে মাত্র তেরো বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। দাদা কর্ষণদাস ও কাকার ছেলেরও একই সঙ্গে বিয়ে হয়। তিন জনের একত্র বিয়ে হলে বার বার খরচ ও ঝামেলা হবে না, অথচ মর্যাদাও রক্ষা করা যাবে তাই হল এ ব্যবস্থা। ছেলেদের কথা চিন্তা না করে অভিভাবকরা শুধু নিজেদের সুবিধা অসুবিধা, খরচ ও মর্যাদার কথাই চিন্তা করেছিলেন। এর ফলে মোহনদাসের এক বৎসর পড়া বন্ধ, আর কর্ষণদাসের ত একেবারেই সমাপ্তি।

পোরবন্দরেরই শ্রীগোকুলদাস মাকনজীর মেয়ে কস্তুরবাইয়ের সঙ্গে হল মোহনদাসের বিয়ে। দুই পরিবারে এই বিয়ের কথা হয়েছিল প্রায় ছ'সাত বৎসর পূর্বে। বর কন্যার এর মধ্যে কোন হাতই ছিল না। কস্তুরবাই মোহনদাসের সমবয়সী ছিলেন। কে বড় কে ছোট তা সঠিক জানা নেই। এর অর্থ কস্তুরবাইয়ের জন্ম সন ও তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা নেই। কস্তুরবাই বিয়ের সময় নিরক্ষর ছিলেন। পরে অবশ্য মাতৃভাষা গুজরাটীতে চিঠি লিখতে পারতেন ও সহজ গুজরাটী বুঝতেন। মোহনদাসের চোর, ভূত ও সাপের ভয় ছিল খুব। অন্ধকারে ঘুমাতে পারতেন না। কিন্তু কস্তুরবাইয়ের এসব ভয় ছিল না। ধাত্রী 'রম্ভা' ভূতের ভয় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মোহনদাসকে 'রামনাম' করতে বলে। সেই হতে হয় তাঁর 'রামনাম' অভ্যাস। বন্ধুটির কুপ্রভাবে কস্তুরবাইয়ের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ জাগে

মোহনদাসের মনে। এই সন্দেহ বাতিক অনেক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত করে, এমনকি বেদনাদায়ক পরিণতিও ঘটে। এখানেও ঘটেছিল তিক্ততা। স্বামীর প্রভুত্বস্পৃহা আদিকাল হতেই চলে আসছে। মোহনদাসের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কস্তুরবাইয়ের মন্দিরে যাওয়া, সকলের সঙ্গে মেলামেশা এ সবের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে চাইলেন মোহনদাস। কস্তুরবাই তা শুনবার পাত্র নন। তা খুব সঙ্গতই। এজন্য কখনো কখনো উভয়ের মধ্যে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত।

ষোল বৎসর বয়সে কস্তুরবা সন্তানসম্ভবা হন। সেই সময় কাবা গান্ধী খুবই অসুস্থ। কিছুদিন যাবৎই তিনি ভগন্দর রোগে ভুগছিলেন। স্কুল থেকে এসে মোহনদাসের প্রধান কাজ ছিল বাবার সেবা। অনেক দিনই চলছিল এরূপ। বাবার সেবার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল আবার স্ত্রীর প্রতি আসক্তিও ছিল। কোন রকম সুযোগ পেলে স্ত্রীর কাছে চলে যেতেন। বাবার মৃত্যুর সময়ও এমনটি ঘটল। বাবার সেবা ছেড়ে চলে এসেছেন স্ত্রীর কাছে। অল্প পরেই চাকর এসে তাঁকে ডাকল। দরজা খুলতেই জানলেন বাবার মৃত্যুসংবাদ। মোহনদাসের দুঃখের সীমা রইল না।

স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে তিনি কোন ধর্মশিক্ষা লাভ করেন নি। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। মাঝে মাঝে বৈষ্ণব মন্দিরে যেতেন। কিন্তু এই সব মন্দিরের জাঁকজমক ও ভিতরকার ব্যভিচারের গুজব মোহনদাসের মনে জন্মায় বীতশ্রদ্ধার ভাব। ধাত্রী রম্ভার কথা বলেছি। লাধা মহারাজের রামায়ণ পাঠ তাঁর মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। কাবা গান্ধীর অসুখের সময় তিনি সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ পাঠ করতেন। লাধা মহারাজ ছিলেন রামভক্ত। এরূপ লোকমুখে শোনা যায় যে তাঁর কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল। তা সারাবার জন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করেন নি। বিলেশ্বরের মন্দিরে মহাদেবের অর্পিত বেলপাতা লাগিয়ে ও রামনাম করেই তাঁর অসুখ সেরে যায়।

তাঁর সুকণ্ঠে রামায়ণ গান মুগ্ধ করে মোহনদাসকে। তিনি শুধু গান গাইতেন না—ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন। এই রামায়ণ পাঠ শুনেই মোহনদাসের মনে রামায়ণের প্রতি গভীর ভক্তিভাবের বুনিয়াদ গড়ে উঠে। পরবর্তী কালে তিনি তুলসীদাসের রামায়ণ রামচরিতমানসকে সর্বোৎকৃষ্ট ভক্তিমূলক গ্রন্থ বলে মনে করেন। বাস্তবিকই এটি অপূর্ব গ্রন্থ। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর পাঠ করা উচিত।

তাঁর মা ও বাবা শুধু যে বৈষ্ণব মন্দিরে যেতেন তা নয়, শিব মন্দিরেও যেতেন। বাবার কাছে অনেক জৈন সাধু আসতেন। এমনকি মুসলমান ও পার্শী বন্ধুরাও আসতেন। এঁরা নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। কাবা গান্ধী খুব মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কথা শুনতেন। মোহনদাস বাবার পরিচর্যাকারী হিসাবে উপস্থিত থাকায় সে সব শুনবার সুযোগ পেতেন। ফলে অল্প বয়সেই তাঁর মনে সকল ধর্মের প্রতি একটা উদার মনোভাব গড়ে উঠে। কিন্তু ওই সময় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে জন্মে বিরূপ ভাব। এর কারণ মুখ্যতঃ খৃষ্টান ধর্মযাজকদের আচরণ। তারা রাজকোট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দুধর্ম ও দেবদেবীদের অকথ্য গালাগালি করত। একবার শুনে আর দ্বিতীয়বার তাদের কথা শুনতে যাওয়ার প্রবৃত্তি হয় নি তাঁর। আর ওই শহরের একজন সুপরিচিত হিন্দু খৃষ্টান হন। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সময় তাকে গো মাংস ও মদ খাওয়ানো এবং নিজের পূর্বের পোশাক বদলিয়ে প্যান্ট, কোট ও হ্যাট পরানো হয়। এই যদি খৃষ্টধর্ম হয় তবে তা কোনক্রমেই কল্যাণকর নয় এই ধারণা জন্মে তাঁর। জীবনে পরে অবশ্য ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানদের সম্পর্কে এসে তাঁর ধারণা বদলায়।

ছেলেবেলায় মোহনদাস 'আচার' খুব পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ গুজরাটী বাড়ীতে খাওয়ার সময় আচার পরিবেশন করা হয়। গোখী-বেনের কাছে শুনেছি একবার তিনি রাজকোট হতে বম্বে যাচ্ছেন।

মোহনদাসও বাহানা ধরলেন যাওয়ার জন্য। ভাল আচার নিয়ে আসার সর্তে মোহনদাস যাওয়া বন্ধ করতে রাজী হলেন। অথচ পরিণত বয়সে এসব ঝাল মশলা যুক্ত টক জিনিস মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "মহাত্মাজী, ভারতবর্ষের কোন প্রান্ত বা প্রদেশ আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?" উত্তরে বলেন—'বিহার'। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "বিহারের লোক সবচেয়ে মশলা কম খায়।" পরিণত বয়সে তিনি মশলা কম খাওয়া শরীর ও মন উভয় দিক দিয়েই ভাল মনে করতেন।

আঠারো বৎসর বয়সে মোহনদাস ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। সে সময় রাজকোটে ম্যাট্রিক পরীক্ষার কোন কেন্দ্র ছিল না। ওখানকার ছেলেদিগকে যেতে হত আমেদাবাদ বা বোম্বে। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় মোহনদাস একাকীই আমেদাবাদ যান। ম্যাট্রিক পাশ করে বোম্বের তুলনায় কম খরচ হবে বলেই ভবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যাপকদের বক্তৃতার মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন না। এজন্য পড়ায় কোন রসও পান না এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হন চিন্তিত। ছুটিতে বাড়ী আসেন এমন সময় পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরামর্শদাতা পণ্ডিত ও কুশলী ব্রাহ্মণ মাওজী দাভে বা যোশীজীও আসেন। তিনি মোহনদাসের পড়াশুনা সম্বন্ধে খোঁজখবর করেন। তিনি পুতলীবাই ও লক্ষ্মীদাসকে পরামর্শ দেন মোহনদাসকে বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়াবার জন্য পাঠাতে। শ্যামলদাস কলেজ হতে বি. এ. পাশ করে বা পরে আইন পাশ করেও সে সুবিধা হবে না যা হবে ব্যারিস্টার হয়ে এলে। আর টাকা খরচ ত খুব বেশী হবে না এই কথাও বলেন। এবং ব্যারিস্টারী পাশ করাও কষ্টকর নয়। সেই বৎসরই বিলাত পাঠাতে পরামর্শ দেন। মোহনদাসকেও বললেন সেই কথা। তিনি ত প্রস্তাব লুফে নেন। মা প্রথম ইতস্ততঃ করেন। বিলাত গিয়ে যুবকেরা নষ্ট হয়ে যায়, মদ মাংস খায় ইত্যাদি কত কথাই না

আসে পুতলীবাইয়ের কানে। ছেলের কল্যাণের কথা চিন্তা করা স্বাভাবিক। অবশেষে পরিবারের হিতৈষী বেচারজী স্বামী নামক এক জৈন সাধুর প্রস্তাব অনুযায়ী মোহনদাস মদ, মাংস ও স্ত্রীসঙ্গ হতে দূরে থাকবেন এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার পর মা যাবার অনুমতি দেন। দাদা লক্ষ্মীদাস যেভাবে হোক খরচের টাকার ব্যবস্থা করবেন বলেন। যাওয়া সব স্থির। এমন সময় এঁদের জাতভাইদের কেউ কেউ আপত্তি তুলল। সামাজিক বয়কট বা জাতিচ্যুত করার হুমকী এল। পুতলীবাই, লক্ষ্মীদাস বা মোহনদাস কেউ তাতে ভীত হলেন না। ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বোম্বে হতে জাহাজে বিলাত রওনা হলেন মোহনদাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিলাতের জীবন

জুনাগড়ের বয়স্ক উকিল শ্রীত্র্যম্বক রায় মজুমদার ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য এই জাহাজে বিলাত যাচ্ছিলেন। তাই এই জাহাজে যাওয়ার এবং তার সঙ্গে একই কেবিনে থাকবার ব্যবস্থা করা হয় যেন তিনি একটু দেখাশুনা করতে পারেন উনিশ বৎসরের বালক মোহনদাসকে। আর সব যাত্রীই ছিল ইংরেজ। একে ত লাজুক, তারপর ইংরেজীতে কথা বলতে অনভ্যস্ত। ইংরেজদের মন্তব্যও সব সময় বুঝে উঠতে পারতেন না। তাই কারো সাথে বড় একটা মিশতেন না মোহনদাস। প্রায় সারাক্ষণই থাকতেন কেবিনে। ডেকে যেতেন যখন যাত্রী-সংখ্যা কম থাকত। খাওয়ার টেবিলেও যেতেন না। কারণ, ছুরি-কাঁটার ব্যবহার জানতেন না এবং কোন জিনিসে মাংস আছে কি নেই এই সব প্রশ্ন টেবিলে বসে জিজ্ঞাসা করার অসুবিধা। তখন বিলাতগামী জাহাজে নিরামিষাশীদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল না। কেবিনেই খেতেন। সঙ্গে নিয়ে আসা মিষ্টি ও ফলই ছিল তাঁর প্রধান খাদ্যবস্তু। ত্র্যম্বক রায় ছিলেন ঠিক উল্টা। সবার সঙ্গে মিশতেন। ডেকে অধিকাংশ সময়ে থাকতেন, টেবিলে খেতে যেতেন। তিনি মোহনদাসকে পরামর্শও দিতেন সেরূপ করতে। ভুল হলেও ইংরেজীতে আলাপ আলোচনা করার উৎসাহ দিতেন। বলতেন একটা বিদেশীভাষায় ভুল ত হতেই পারে, আর এই ভাবেই ইংরেজীতে আলাপ আলোচনা করা শিক্ষা হয়। কিন্তু মোহনদাস কিছুতেই লাজুকতা কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। একজন তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ইংরেজ যাত্রী স্নেহপরবশ হয়ে আলাপ করতে আরম্ভ করেন। কখন কি খান, কোথায় কি জন্য যাচ্ছেন, এবং এত লাজুকতার কারণ কি এসব প্রশ্ন করেন। তাঁকে খাওয়ার টেবিলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মদ খেতে বলেন না কারণ মদ না খেলেও

চলে। কিন্তু ইংলণ্ডে মাংস খাওয়া অত্যাবশ্যক বোধে মাংস খেতে বলেন। যদি মাংস না খেয়ে ইংলণ্ডে থাকা অসম্ভব হয় তবে তিনি বরং ভারতে ফিরে যাবেন তবু মার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারবেন না জানান মোহনদাস।

বিলাতে পৌঁছে প্রথম প্রথম তাঁর ভারী অস্বস্তি বোধ হল। সব জিনিসই আলাদা—লোকজন, তাদের আচার ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া ঘর বাড়ী সবই যেন ভিন্ন রকমের। সর্বদাই মা, বাড়ী ও দেশের কথা মনে পড়ত। রাতে চোখের জল পড়ত, ঘুম হত না। ইংলণ্ড কিন্তু অসহ্য মনে হল। কিন্তু তিন বৎসর থেকে পড়া শেষ করেই দেশে ফিরবেন স্থির করলেন।

এখানেও তাঁকে মাংসাহারী করার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ অপরাধ করতে চান না। নিছক প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই তখন ছিলেন নিরামিষাশী। যদিও মত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তিনি তখন মনে করতেন প্রত্যেক ভারতবাসীর মাংস খাওয়া উচিত। খোলাখুলি ভাবে খেতে পারার সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন তিনি নিজেও। সেই সময় পড়ার চাপও ছিল না বেশী। খুব হেঁটে বেড়িয়ে বেড়াতেন এবং খোঁজ করতেন একটি ভাল নিরামিষ ভোজনালয়। একদিন হঠাৎ সাইন বোর্ড দেখে ঢুকে পড়লেন ওইরূপ এক ভোজনালয়ে। দরজার সামনে কাচের খুপরিতে রাখা মিঃ সল্টের নিরামিষ সমর্থনে বইখানা কিনলেন। খাওয়া হল খুব তৃপ্তিকর। বিলাতে এসে এই সর্বপ্রথম পেট পুরে আনন্দ সহকারে খেতে পেলেন। বইখানা আগাগোড়া পড়লেন খুব মনোযোগের সঙ্গে। ভারী ভাল লাগল। অপরিসীম প্রভাব হল মনের উপর। সমস্ত অন্তর দিয়ে হলেন নিরামিষাশী। বইখানা এনে দিল তাঁর পরিবর্তন। জৈন প্রভাবান্বিত গুজরাটে এক বেণে বৈষ্ণব পরিবারে জন্মেও অল্প বয়সেই হয়েছিল মাংসাহারের পক্ষে তাঁর মত। আর বিলাতে যেখানে অধিকাংশ লোক মাংসাহারী সেখানে একখানা বই

পড়ে সে মতটা উল্টে গেল। এ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ভূমিকা। এই বই পড়বার পর নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আরো বই পড়বার আকাঙ্ক্ষা হল এবং তা পড়লেন। বিলাতে যে অল্প সংখ্যক নিরামিষাশীদের সমিতি ছিল তার সভ্য হলেন। এরূপ আহারের পক্ষে প্রচারক হয়ে উঠলেন। লণ্ডন শহরেরই বেজওয়াটার অঞ্চলে একটি নিরামিষাশী সমিতি গঠন করে তার সম্পাদক হলেন। তাঁর অনুরোধে সেই অঞ্চলের অধিবাসী বিখ্যাত লেখক স্যার এডুইন আর্নল্ড হলেন সহকারী সভাপতি। খাদ্য খাওয়া নিয়ে নানারূপ প্রয়োগ আরম্ভ করলেন নিজের উপর। এই সত্য উপলব্ধি করলেন খাদ্যবস্তুর স্বাদ জিভে নয়, মনে। খাদ্য খাওয়া নিয়ে প্রয়োগ তিনি প্রায় জীবনের শেষ পর্যন্তও করেছেন। পুষ্টিকর খাদ্য কম খরচে তিনি কি খেতে পারেন তাই ছিল বিলাতে প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য। শেষ জীবনে দরিদ্র ভারতবাসী কম খরচে কি পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পারে সেদিকে ছিল লক্ষ্য।

বিলাতে প্রয়োগের সময় কয়েকদিন ডিমও খেয়েছিলেন। বিলাতে একদল নিরামিষাশী আছেন যাঁরা ডিম খান। কিন্তু মার নিকট মাংসাহার না করার প্রতিজ্ঞার মধ্যে মার মনে ডিম না খাওয়াও ছিল ভেবে তা বন্ধ করেন। পরবর্তী জীবনে ভারতবর্ষে একবার ডিম খাওয়ার প্রশ্ন উঠে। কোন কোন লোক গিয়ে তাঁকে বলে 'বাওয়া ডিম' হতে বাচ্চা হয় না, কাজেই তা খেলে হিংসা হয় না, অতএব তিনি তা খেতে পারেন। ডিম 'বাওয়া' কিনা তা নির্ধারণ করার উপায় আছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন যে মহাত্মাজী 'বাওয়া ডিম' খেতে আরম্ভ করলে অন্য সবাই নির্বিচারে সব ডিমই খাবে—সকলের পক্ষে 'বাওয়া' কিনা এ পরীক্ষার সুবিধা ত হবে না। মালব্যজীর যুক্তি মেনে মহাত্মাজী বাওয়া ডিমের প্রয়োগ হতে নিবৃত্ত হলেন। শেষ জীবনে তিনি মনে করতেন নিরামিষ আহার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়ে বিচার করলে শ্রেষ্ঠ।

গীতা হিন্দুর সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। পরবর্তী জীবনে মহাত্মাজী গীতাকে 'মা'র মত মনে করতেন এবং সকল কাজে গীতা হতে প্রেরণা লাভ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল গীতা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। বিলাত যাওয়ার পূর্বে তিনি এই গ্রন্থ মূল সংস্কৃত বা গুজরাটী অনুবাদেও পড়েন নি। দুই থিয়োসোফিস্ট ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরা এডুইন আর্নল্ডের গীতার অনুবাদ পড়ছিলেন। তাঁরা মোহনদাসকে গীতার কথা বলেন এবং মূল গীতা তাঁদের সঙ্গে পড়বার জন্য অনুরোধ করেন। মোহনদাস তাঁদের খোলাখুলি বলেন যে তিনি পূর্বে কখনো গীতা পড়েন নি তবে যেটুকু সংস্কৃতজ্ঞান আছে তাতে অনুবাদ ঠিক হয়েছে কিনা বুঝতে পারবেন। এই সুযোগে হল তাঁর গীতা পাঠ। বুঝতে পারলেন গীতা একটি অমূল্য ও অপূর্ব গ্রন্থ এবং এডুইন আর্নল্ডের অনুবাদ অতি উত্তম। তখনই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দিককার নিম্ন কয়েকটি শ্লোক তাঁর মনের উপর গভীর রেখাপাত করে ঃ—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম ঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

বিষয়বস্তু সমূহ চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হতে কামনা হয়, কামনা হতে অর্থাৎ কামনা প্রতিহত হলে তা হতে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হতে হয় বিবেকনাশ অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যবুদ্ধি লোপ এবং তা হতে হয় সংস্কারের স্মৃতিলোপ, স্মৃতিবিভ্রম হতে জ্ঞানের নাশ হয় এবং জ্ঞানের নাশ হলে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মৃততুল্যই হয়।

১৯১৫ সালে তিনি আমেদাবাদের সন্নিকটে প্রথমে এক ভাড়া বাড়ীতে পরে সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ওই শ্লোকগুলি আশ্রমের প্রতিদিনকার প্রার্থনায় উচ্চারিত হত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তা তাঁর প্রার্থনার অঙ্গ ছিল। এই

থিওসোফিস্ট ভাইরা তাঁকে এডুইন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলো' বা বুদ্ধচরিত নামক পুস্তকখানা পড়তে দেন। এই বই খানা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। একবার পড়তে আরম্ভ করে শেষ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি হয় না। এঁরা মোহনদাসকে ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি ও শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং তাঁকে থিওসোফি মতে দীক্ষিত হতে বলেন। নিজের ধর্ম (হিন্দুধর্ম) সম্বন্ধে ভাল করে জ্ঞান লাভ না করে ধর্ম পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে না এ জবাব দেন তিনি। এই সময় এক নিরামিষ ভোজনালয়ে ম্যাঞ্চেস্টার হতে আগত এক খৃষ্টান সজ্জনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর অনুরোধে বাইবেল পড়েন। যীশু, খৃষ্টের 'গিরি প্রবচন' খুব ভাল লাগে। গীতার বাণী, বুদ্ধের বাণী ও যীশুখৃষ্টের বাণীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন। ত্যাগই ধর্ম-জীবনের মূল কথা। গীতা, এশিয়ার আলো ও বাইবেল পড়ে অন্য ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে জানবার আকাঙ্ক্ষা হয়। এক বন্ধুর পরামর্শে কার্লাইলের 'বীর ও বীরপূজা' পড়ে ইসলামধর্ম প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মহত্ত্ব, সাহস ও তপশ্চর্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। বিলাতে গভীর ভাবে ধর্মচর্চার সময় হয় নি—কিন্তু এখানেই হল বৃক্ষরোপণ—পরে যা সুশোভিত হল ফুলে ফলে।

মার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মদ, মাংস ও স্ত্রীসঙ্গ হতে দূরে থাকবেন। তা পালন করার জন্য সচেষ্টও ছিলেন। আহারে সংযম ছিল। এক হিসাবে কৃচ্ছ্রসাধন করছিলেন। ধর্মচর্চাও খানিকটা করছিলেন তথাপি একদিন স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে পতনের হাত হতে রক্ষা পান সঙ্গীর সতর্কবাণীতে। মনে কামনা জেগেছিল। গীতায় শ্রীভগবান ঠিকই বলেছেন "যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥" চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয় সকল অতি সচেষ্ট মেধাবী পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে। সদা জাগ্রত থাকা প্রত্যেক শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন যাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তির কর্তব্য। একটু অসতর্ক হলেই পতনের

সম্ভাবনা। পতনের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার পেছনে ছিল ভগবানের কল্যাণময় হস্ত এ কথা বুঝলেন মোহনদাস। মানুষ যে কত দুর্বল সে কথা প্রত্যেক সাধক মনে প্রাণে জানে এবং তাই ভরসা করে ভগবানের শক্তি বা অনুগ্রহের উপর। অর্জুন ঠিকই বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥"—হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপক, প্রবল এবং দৃঢ়, তাই বায়ুর ন্যায় তাকে আটকিয়ে রাখা অতি কঠিন বলে মনে করি। বিলাতে অধিকাংশ মাংসাহারী। তাই নিরামিষাশীর পক্ষে সামাজিক মেলামেশার যেটুকু অসুবিধা তা দূর করতে চাইলেন—ঠিক তাদের মত পোশাক করে, নাচ গান, বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি শিখে। বোম্বের দরজীদের তৈরী পোশাক বদলিয়ে লণ্ডনের তৈরী পোশাক হল। নাচ গান শেখা আরম্ভ হল। বেহালা কিনলেন—বক্তৃতা শেখানোর ক্লাশে ভর্তি হলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিন মাস যেতে না যেতেই তাঁর এ মোহ ভেঙ্গে গেল। ভাবলেন তাঁর এ সব দিয়ে কী হবে। চিরকাল ত আর এদেশে থাকবেন না। দাদা কত কষ্ট করে টাকা পাঠাচ্ছেন, তার একটি পয়সাও অপব্যয় করা উচিত নয়। যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তা পুরা করে ফিরে যাওয়াই তাঁর প্রধান কর্তব্য। তাই এ সব খেয়াল ছেড়ে দিয়ে সাদাসিদে ভাবে থাকতে আরম্ভ করলেন।

ব্যারিস্টারি পাশ করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তদুপরি প্রথম দিকে পড়াশুনার চাপ বড় একটা ছিল না। কাজেই সংকল্প করেন লণ্ডন-ম্যাট্রিক পাশ করার। পরীক্ষার তখন মোটে পাঁচ মাস বাকী। এই অল্প সময়ের মধ্যে অন্য সব বিষয় বাদে ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা শিখতে হবে। একটু কষ্টকর। প্রথম বারে অন্য সব বিষয়ে কৃতকার্য হলেও ল্যাটিন পাশ না হওয়ার দরুন হলেন ফেল। আমাদের দেশের ম্যাট্রিক পাশ ছেলের পক্ষে পাঁচ মাসের মধ্যে ল্যাটিন বাদে লণ্ডন-ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অন্য সব বিষয়ে পাশ করা কৃতিত্বেরই বটে। যা হোক দ্বিতীয় বারে তিনি পাশ করলেন।

তিনি গিয়েছিলেন ব্যারিস্টার হতে। ব্যারিস্টার হওয়া কষ্টকর নয় যোশীজীর এই কথা তিনি বুঝতে পারেন। এজন্য ছুটি জিনিস অত্যাবশ্যক ঃ—(১) টার্ম (এক-একটা পাঠ্যক্রমের মেয়াদ) পুরা করা ও (২) লিখিত পরীক্ষা পাশ করা। তিন বৎসরে মোট বারো টার্ম। প্রত্যেক টার্মে চব্বিশটি করে সান্ধ্যভোজন, তার মধ্যে অন্ততঃ ছ'টিতে হাজির থাকতেই হবে। সান্ধ্যভোজনের ব্যবস্থা যখন প্রবর্তিত হয় তখন ছাত্র-শিক্ষকের মেলামেশার এবং আলাপ আলোচনার সুযোগ হত। কিন্তু ১৮৮৮-৯০ খৃষ্টাব্দে সে সুযোগ ছিল না। কারণ ছাত্র-সংখ্যা বেশী এবং শিক্ষকদের জন্য খাওয়ার টেবিলও পৃথক্। রক্ষণ-শীলতা ইংরেজ চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। তাই এই প্রথা চলছে। সান্ধ্যভোজনে ভাল মদেরও ব্যবস্থা আছে। মোহনদাস মদ খেতেন না। কাজেই তাঁকে টেবিলে পাওয়ার জন্য আগ্রহ। তা হলে চারজনের নির্দিষ্ট মদ তিনজনেই খেতে পাবে। মদ না খেলেও পয়সা দিতে হবে। অতএব যারা মদ খায় না তাদের এ ব্যবস্থা খেতে উৎসাহ দেওয়ার শামিল। অবশ্য নিরামিষাশী বলে দরখাস্ত করে কিছু ফল ইত্যাদি পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল মোহনদাসের। দ্বিতীয়তঃ লিখিত পরীক্ষায় পাশের হার খুবই উঁচু। যারা একটু পড়াশুনা করে তাদের ফেল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই সাধারণতঃ ব্যারিস্টারদের 'ডিনার ব্যারিস্টার' বা সান্ধ্যভোজ খাওয়া ব্যারিস্টার বলে ঠাট্টা করে। আজও সেই ভোজ খাওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত। আর এখনো স্বাধীন ভারতে ব্যারিস্টারদের মর্যাদা এডভোকেটদের চেয়ে বেশী। যার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। এর আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

ইংলণ্ড তথা ইউরোপ ও ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থা ভিন্ন রকমের। ভারতবর্ষে ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় সাধারণতঃ অভি-ভাবকদের ইচ্ছানুসারে। বাল্যবিবাহও হয় অনেক, যেমন হয়েছিল মহাত্মাজীর। ইংলণ্ডের বর কন্যা নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করে, কাজেই বাল্যবিবাহ নেই। এই কারণে যুবকযুবতীদের মেলামেশার

সুযোগ দেয় সমাজ যেন তারা নিজ নিজ জীবনসাথী নির্বাচন করতে পারে। এই দুই প্রকার বিবাহপ্রথারই দোষ ও গুণ দুই-ই আছে। কোনটাই যে অবিমিশ্র কল্যাণের এ কথা বলা চলে না। মহাত্মাজী অবশ্য নিজের বাল্যবিবাহকে অকল্যাণেরই মনে করেছেন।

ইংলণ্ডে ছাত্রজীবনে বিয়ে হয় না বললেই চলে। তাই সেখানে এ ধারণা বদ্ধমূল যে, সব ছাত্রই অবিবাহিত। ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধেও এই ধারণা ইংলণ্ডের লোক স্বাভাবিক ভাবেই মনে পোষণ করে। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিবাহিত। অনেকে লজ্জায় এবং বললে যুবতী মেয়েদের সঙ্গে মেশবার অসুবিধা হবে তাই সে কথা প্রকাশ করত না। ব্রাইটনে বেড়াতে গিয়ে ভোজনালয়ে এক-বর্ষীয়সী ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় মোহনদাসের। সেই মহিলা তাঁকে প্রতি রবিবার লণ্ডনে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ করেন: সেখানে মোহনদাসের সঙ্গে বাড়ীর অবিবাহিত যুবতী মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেন—বিশেষভাবে একটি মেয়ের সঙ্গে পৃথক্‌ভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ দেন। এ সবই হচ্ছিল এ কথা ভেবে যে, মোহনদাস অবিবাহিত। ব্যাপার বেশীদূর গড়াবার পূর্বে মোহনদাস মহিলাটিকে লিখে পাঠান যে তিনি বিবাহিত ও একটি ছেলের বাবা এবং মাত্র তের বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তের বৎসরে বিয়ে সেই মহিলাকে হাসির খোরাক যোগায়। কিন্তু এই সত্যানুরাগই মোহনদাসকে নিয়ে যায় ঠিক পথে। পরবর্তী জীবনে মহাত্মাজী ভগবানকে সত্যস্বরূপ বলেন। 'সত্যই ভগবান' এই তাঁর কথা। কি বাল্যজীবন, কি বিলাতের জীবন, কি পরবর্তী জীবন সব সময়েই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট তারিখের 'হরিজন' কাগজে তাঁর নিবন্ধ বেরোয় "ছেলেবেলা হতেই আমি সত্যের পূজারী। এটা ছিল আমার কাছে খুব স্বাভাবিক। প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে অনুসন্ধানের ফলে 'ভগবানই সত্য' প্রচলিত এই প্রবাদবাক্যের বদলে 'সত্যই ভগবান' এ তত্ত্ব উদ্ভাসিত হল আমার কাছে।

এই ৯ই আগস্ট তারিখটি মহাত্মা গান্ধীর জীবনে ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট দিন। ৮ই আগস্ট তারিখে বোম্বেতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি মহাত্মাজীর বিখ্যাত 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৯ই আগস্ট তারিখে মহাত্মাজী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণ ও আরো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন।

প্রায় তিন বৎসর বিলাতে থেকেও তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস হল না। বিলাত যাওয়ার সময় রাজকোট স্কুল থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সভায় লিখিত ধন্যবাদ সূচক কয়েকটি কথা পড়তে গিয়েও তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপে ও মাথা ঘোরে। বিলাত হতে দেশে ফিরবার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর কয়েকজন নিরামিষাশী বন্ধুকে হবর্ন (লণ্ডনের একটী অঞ্চল)-এর এক ভোজনালয়ে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেন। এই সমস্ত ভোজে বক্তৃতা দেওয়া রীতি। কি বলবেন তা কত ভেবে রাখলেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে আরম্ভ করার পর মোহনদাসের মাথা গুলিয়ে গেল। অবশেষে "আপনারা দয়া করে আমার নিমন্ত্রণে এসেছেন এজন্য ধন্যবাদ", শুধু এই কয়টি কথা বলে বসে পড়লেন।

বিলাত যাওয়ার সময় তাঁর কাছে চারজন লোকের নিকট পরিচিতি-পত্র ছিল। সুপ্রসিদ্ধ দাদাভাই নৌরজীর কাছে একখানা। বিশেষ প্রয়োজন না হলে এরূপ বিশিষ্ট লোকের নিকট যাওয়া উচিত নয় এ ধারণা ছিল তাঁর। কিন্তু খুব আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে মোহনদাস তাঁর সভাসমিতিতে যেতেন ও বক্তৃতা শুনতেন। অনেকদিন পর একবার মিঃ দাদাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে পরিচিতি পত্র দেন। খুব স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পান এবং প্রয়োজন হলেই তাঁর কাছে যেতে বলেন। তাঁর সময়ের মূল্য আছে, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন যাওয়া উচিত নয়, তাই মোহনদাস আর যান না। আমাদের দেশের সবার যদি এই সুঅভ্যাস থাকত তা হলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আরো অনেক বেশী কাজ করতে পারতেন। আবার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বেশী লোক আসা বা দরবার

বসানো পছন্দ করেন। তা হতেও একটা রেওয়াজ হয়। প্রথম জীবনে মোহনদাসের এ আচরণ প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

ডাঃ প্রাণজীবন মেহতার নিকট একখানা পরিচিতি পত্র ছিল। ডাঃ মেহতা মোহনদাসের বিলাতের জীবনকে সুখকর করার জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন। তাই হয় ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব। সে বন্ধুত্ব হয় পরে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী। বিশেষ করে ডাঃ মেহতার ভাই শ্রীরেবাশঙ্কর জগজীবন জাভেরী (জহুরী—হীরা-মুক্তা ব্যবসায়ী) মেহতা ও তাঁর বড়ভাইয়ের জামাতা রায়চাঁদ ভাইয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। রেবাশঙ্কর জগজীবনজী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। বোম্বেতে তাঁর বাড়ী মণিভবনে মহাত্মাজী উঠতেন। সেই বাড়ী বর্তমানে গান্ধী স্মারক নিধির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। রায়চাঁদ ভাইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রায়চাঁদ ভাই একজন দক্ষ হীরা ব্যবসায়ী হলেও ছিলেন একজন পরম ধার্মিক ব্যক্তি। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, নির্মল শুদ্ধ চরিত্র ও আত্মদর্শনের জন্য তীব্র সংবেগ মোহনদাসকে মুগ্ধ করেছিল। এই আত্মদর্শনের জন্যই যেন তিনি বেঁচেছিলেন। তাঁর মুখে সর্বদা ছিল "আমার প্রতিদিনকার সকল কাজে যখন ভগবানকে দেখব তখন আমার জীবন সফল।" এ কথা তাঁর হৃদয়পটেও যেন আঁকা ছিল। রায়চাঁদ ভাই মহাত্মাজীর ধর্মগুরু না হলেও তাঁর দ্বারাই তিনি সর্বাধিক প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ধর্মজীবনে তিনি ছিলেন মহাত্মাজীর শ্রেষ্ঠ সহায়ক। ধর্মসংকটে মহাত্মাজী তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। রায়চাঁদ ভাইয়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই প্রাণের যোগাযোগ ছিল।

১৮৯১ সালের ১০ই জুন মোহনদাস ব্যারিস্টারী পাশ করেন। ১১ই জুন আড়াই শিলিং জমা দিয়ে হাইকোর্টের রেজিস্টারভুক্ত হন এবং ১২ই জুন ভারতে রওনা হন। এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবন সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজী

ব্যারিস্টার মোহনদাস জাহাজ হতে বোম্বে বন্দরে নেমেই বড়দাদার কাছে পেলেন মার মৃত্যুসংবাদ। ছয় বৎসর পূর্বে বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুতে খুব ব্যথিত হয়েছিলেন কিন্তু মার মৃত্যুব্যথা আরো বেশী লাগল। বাইরে অবশ্য তার কোন অভিব্যক্তি দিলেন না। কান্না বা চোখের জল কেউ দেখতে পেল না। নিদারুন আঘাত পেলে কখনো কখনো কান্না বা চোখের জল তুই-ই আসে না। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে বাবা মা তুজনকেই হারালেন।

তাঁর বিলাত যাওয়া নিয়ে জাতভাইরা তুভাগ হয়ে যায়। এক দল তাঁকে সমাজে রাখার পক্ষপাতী, আর এক দল করল জাতিচ্যুত। প্রথম দলকে সন্তুষ্ট করবার জন্য রাজকোট যাওয়ার পূর্বে বড়দাদা তাঁকে নিয়ে গেলেন নাসিক। সেখানে পবিত্র নদীতে স্নান করে এলেন রাজকোট। জাতির লোকদের ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন লক্ষ্মীদাস। জাতির গোঁড়ারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অচল রইল। গোঁড়াদের নির্দেশ মত শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগ্নী ও ভগ্নীপতির বাড়ীতেও তাঁর নিমন্ত্রণ নিষিদ্ধ ছিল। গোপনে তাঁরা করতে চাইতেন কিন্তু মোহনদাস তাতে রাজী হন নি। তিনি গোঁড়াদের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিরোধ।

ব্যারিস্টারী শুরু করলেন বোম্বেতে। গোড়ার দিকে ত মামলাই জুটছিল না। প্রথম যেটি জুটল তাতে হল বিড়ম্বনা। ত্রিশ টাকা ফি পেলেন, নীতির দিক দিয়ে দালালকে কোন কমিশনও দিলেন না। কিন্তু মামলার জেরা করতে উঠে মাথা গুলিয়ে গেল। টাকা ফেরৎ দিলেন। লজ্জার সীমা রইল না। এর পর বোম্বেতে শুধু এক গরীব মক্কেলের দরখাস্তের মুসাবিদা করে দেন। অবশ্য মুসবিদা ভালই হয়। এভাবে বিনা আয়ে বোম্বেতে কতদিন চলে। নিরুপায় হয়ে

এমনকি খানিকটা আয়ের জন্য এক স্কুলে দৈনিক এক ঘণ্টা ইংরেজী পড়াবার চাকুরী পাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতেও হন ব্যর্থকাম। অবশেষে মাত্র ছয়মাস বোম্বে থেকে চলে যান রাজকোটে। সেখানে মুখ্যতঃ মুসাবিদার কাজে মাসিক তিনশত টাকা খানেক আয় করতে থাকেন। কিন্তু এখানে ঘটল এক অপ্রীতিকর ঘটনা। ওখানকার ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে বিলাতে পরিচয় হয়েছিল। দাদার পক্ষ হয়ে তার কাছে কিছু বলতে গিয়ে হলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। বিলাতে পূর্ব পরিচয়ের সুযোগ না নিয়ে গেলেই ভাল হত। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে পিয়ন দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া অসহনীয় ঔদ্ধত্যের পরিচয়। এর পর রাজকোটে ব্যারিস্টারী করাও সুবিধাজনক মনে হল না। কারণ অধিকাংশ মামলা এই পলিটিক্যাল এজেন্টের কোর্টে। কি করবেন ভাবছেন।

ঠিক এমনি সময় পোরবন্দরের এক ব্যবসায়ী তাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা সংক্রান্ত এক দেওয়ানী মামলার ব্যাপারে মোহনদাসকে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করে তাঁর দাদাকে চিঠি লেখেন। মামলার দাবী ছিল চল্লিশ হাজার পাউণ্ড, বড় উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত ছিল। মক্কেলের হয়ে তাদের মামলা বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ হবে মুখ্যতঃ তাঁর। দাদা আবদুল্লা অ্যাণ্ড কোম্পানীর অংশীদার শেঠ আবদুল করিম জাভেরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাজটা যে খুব মনঃপূত হল তা নয়। কিন্তু বোম্বের ব্যর্থতা ও রাজকোটের পরিস্থিতির জন্য যে কোন ভাবে হোক ভারতের বাইরে যেতে চাইছিলেন। তদুপরি নূতন দেশ দেখবার লোভও ছিল। কিছু টাকাও দাদাকে দিতে পারবেন। তাই এক বৎসরের বেশী থাকতে হবে না, দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত খরচ ও নগদ ১০৫ পাউণ্ড—এই সর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে রাজী হলেন। এক বৎসরের বেশী থাকতে হবে না এই ছিল সর্ত। কে জানত তখন তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে হবে প্রায় একুশ বৎসর! কোন অদৃশ্য হস্ত যেন তা ঘটাল। ফল হল তাঁর জীবনের

আমূল পরিবর্তন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া তাঁর জীবনের এক বিশিষ্ট ঘটনা। কোন পরিকল্পনা করে তা হয় নি।

১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বে হতে জাহাজে রওনা হওয়ার কথা ভাবলেন। কিন্তু জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে স্থানাভাব জানালেন দাদা আবদুল্লা কোম্পানীর ভ্রমণ ব্যবস্থাকারী এজেন্ট। ডেক যাত্রী হয়ে যেতে রাজী হলেন না। সন্দেহ করলেন এজেন্টের সততায়। তাই তার সম্মতি নিয়ে নিজেই বের হলেন প্রথম শ্রেণীর একটি বার্থ সংগ্রহ করতে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জানালেন প্রথম শ্রেণীতে অস্বাভাবিক ভিড়ের কথা। কোন রকমে তাঁকে ঠেসেঠুসে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা এ কথা বলার পর ক্যাপ্টেন তাঁকে আপাদমস্তক দেখে বললেন "আমার নিজের কেবিনে একটি বার্থ আছে। যদিও তাতে সাধারণতঃ যাত্রীদের স্থান দেওয়া হয় না। তথাপি আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি।" ভারী খুশী হয়ে ওই জাহাজে রওনা হলেন ডারবান।

ক্যাপ্টেন তাঁকে বেশ পছন্দ করতেন। বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জাহাজ জাঞ্জিবার বন্দরে এলে ক্যাপ্টেন, তার এক ইংরেজ বন্ধু ও মোহনদাসের নিকট বন্দরে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। বন্দরে বেড়াতে যাওয়ার তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি না করে মোহনদাস গেলেন। বন্দরের এক দালাল এসে তিনজনকে তিন নিগ্রো মহিলার ঘরে ঢুকিয়ে দিল। মোহনদাস ত একেবারে হতভম্ব। দাঁড়িয়ে রইলেন এবং পাপের পথে পা দিলেন না। বেরিয়ে এলেন। দুঃখিত হলেন নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য। সৎ লোকেরও সাবধানে এবং বুদ্ধি সহকারে চলা উচিত। মে মাসের শেষাশেষি জাহাজ ডারবান বা বন্দর নাটালে পৌঁছল। দাদা আবদুল্লা শেঠ নিজেই এসেছিলেন মোহনদাসকে অভ্যর্থনা করতে।

এখানে আফ্রিকা, বিশেষভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু লেখা বোধ হয় প্রাসঙ্গিক।

আফ্রিকা একটি বিরাট্ মহাদেশ। ইউরোপের তিন গুণ—এশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ, বর্তমান ভারতের নয় গুণেরও বেশী। কিন্তু লোক-সংখ্যা ভারতের অর্ধেকেরও কম। প্রতি বর্গমাইলে অধিবাসী কুড়ি জনেরও কম। নিরক্ষরেখা আফ্রিকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তাই অনেকের ধারণা সমস্ত আফ্রিকাটাই বুঝি খুব গরম দেশ। তা ঠিক নয়। নিরক্ষরেখার অনেক নীচে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানকার আবহাওয়া ইউরোপীয়দের বাসের উপযোগী। ভারতবর্ষ নিরক্ষরেখার উত্তরে। তাই এখানে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন শীতকাল। বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন চারটি রাজ্যের সমষ্টি—নাটাল, ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট বা অরেঞ্জিয়া ও কেপ কলোনী। ১৮৯৩ সালে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জিয়া ছিল ওলন্দাজ বা বুয়ারদের অধীনে। নাটাল ও কেপ কলোনী ছিল ইংরেজদের অধীনে। এখন দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ও ডাচ বা তার স্থানীয় পরিবর্তিত রূপ 'টা-ল' এই দুইটি ভাষাই সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃত। দক্ষিণ আফ্রিকা ফলের জন্য বিখ্যাত। কলা, পেঁপে, আনারস প্রচুর জন্মে। নিতান্ত গরীবেও খেতে পায়। কমলা লেবু, পিচ ও অ্যাপ্রিকট এত হয় যে হাজার হাজার লোক তা কুড়িয়ে নিয়েই খেতে পারে। কেপ কলোনী আঙুর ও কুল জাতীয় ফলের দেশ। তরি তরকারীও হয় যথেষ্ট। ভারতীয়রা এমনকি আম গাছও জন্মিয়েছে। মোট কথা, খুব সুন্দর দেশ। ইউরোপীয়রা যখন এল তখন দেখল প্রচুর উর্বরজমি, কাজ করবার লোকের অভাব। স্থানীয় অধিবাসী নিগ্রোরা শ্রমবিমুখ। স্বল্প শ্রমে খাওয়া হয়, তাতেই তারা সন্তুষ্ট। ইউরোপীয়েরা দ্রুত টাকা করবার জন্য তাদের প্রায় ক্রীতদাসের মত কাজে লাগায়। তাতেও যথেষ্ট হয় না। আরো শ্রমিক চাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজদের তরফ হতে অনুরোধ এল তৎকালীন ভারতের ইংরেজ সরকারের কাছে ভারত হতে শ্রমিক সরবরাহ করার জন্যে।

সে অনুরোধ রক্ষিত হল ইংরেজদের স্বার্থে। কতকগুলি চুক্তি বা এগ্রিমেণ্ট অনুযায়ী ভারতীয় শ্রমিকদের দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা হল ; 'এগ্রিমেণ্ট' এই ইংরেজী শব্দ বিকৃত হয়ে হল 'গিরমিট' এবং যারা যেত তাদের নাম হল 'গিরমিটিয়া'। ১৮৬০ সালের ১৬ই নভেম্বর প্রথম একদল ভারতীয় শ্রমিক পৌঁছল নাটালে। এই শ্রমিকদের দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়রা বলত কুলী। এই দিনটি ভারত ইতিহাসের একটি দুর্দিন। ভারত সরকার এই অনুমতি না দিলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা দেখা দিত না। গিরমিটিয়ারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কেরানী ও ব্যবসাদাররাও যেতে আরম্ভ করল। তবে সংখ্যায় গিরমিটিয়ারাই বেশী। তাদের কুলী বলত। ক্রমে সব ভারতীয়ই কুলী আখ্যা পেল। ভারতীয় ব্যারিস্টার 'কুলী ব্যারিস্টার', ব্যবসাদার 'কুলী ব্যবসাদার' ইত্যাদি। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসাদাররা সাধারণতঃ ইউরোপীয় ব্যবসাদারদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে উঠল আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের কাছে। আর গিরমিটিয়ারা পাঁচ বৎসর পরে যখন চুক্তিমুক্ত হল, তখন স্বাধীনভাবে চাষ আবাদ করে হয়ে উঠল ইউরোপীয়দের প্রতিযোগী। স্বার্থে ঘা লাগাতে ইউরোপীয়রা হল বিবেকবুদ্ধিহীন। জড়বাদী সভ্যতার এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। খৃষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে আরম্ভ করল যীশু-খৃষ্টের উপদেশ বিরোধী কাজ। বর্ণবিদ্বেষ পেয়ে বসল তাদের। এইখানেই দক্ষিণ আফ্রিকা সমস্যার মূল। একের পর এক এশিয়াবাসীর তথা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নানা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহনদাস গান্ধীর সকল প্রচেষ্টা এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। প্রথম নাটালে ভারতীয় গিরমিটিয়া যাওয়ার তেত্রিশ বৎসর পরে মোহনদাস যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। যে শ্রমিকদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা, তাদের বঞ্চিত করার জন্যই আরম্ভ হল উচ্চাঙ্গের কথা। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের পরিপূর্ণ মিলনই ঘটাতে পারে এর

পরিবর্তন। সে দিন কবে আসবে তা কে বলতে পারে? দুইয়ের মিলনই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কোথাও একটার উপর যদি বেশী জোর দিতে হয় তবে তা অধ্যাত্মবাদের উপরই হওয়া উচিত। তাতে কোন অকল্যাণ নেই। জড়বাদের উপর জোর দেওয়া অকল্যাণকর।

ডারবানে পৌঁছবার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে শেঠ আবদুল্লা মোহনদাসকে নিয়ে গেলেন কোর্টে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাঁর এটর্নীর পাশে বসিয়ে দিলেন। মোহনদাসের মাথায় ছিল ভারতীয় পাগড়ী। ম্যাজিস্ট্রেট খানিক সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে পাগড়ী খুলতে বললেন। মোহনদাস অস্বীকার করে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন। এক টুকরা মেঘ দেখা দিল দক্ষিণ আফ্রিকার আকাশে। মোহনদাস খবরের কাগজে লিখলেন এই নিয়ে। কেউ কেউ মনে করল 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক'। তবে প্রচার হল খুবই। কি করবেন মনে মনে ভাবলেন। পাগড়ী না পরে হ্যাট পরলে হয়ত অপমান সহ্য করতে না হতে পারে ভেবে শেঠ আবদুল্লাকে সে কথা বললেন। শেঠ দুই কারণে আপত্তি করলেন। এক, যে সমস্ত ভারতীয় পাগড়ী পরে তাদের অসুবিধা বাড়বে; দ্বিতীয়, হ্যাট পরলে ব্যারিস্টার মোহনদাসকে হোটেলের খানসামার মত দেখাবে। এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন মোহনদাস।

এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে রওনা হতে হল প্রিটোরিয়া (ট্রান্সভালের রাজধানী)। যে মামলার জন্য এসেছেন তা সেখানকার কোর্টে। যাত্রাপথেই বুঝতে পারলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। ডারবানে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেটে বসলেন সে শ্রেণীর কামরায়। ট্রেন যখন রাত নটায় নাটালের রাজধানী পিটারমারিজবুর্গ স্টেশনে এল তখন একজন ইউরোপীয় যাত্রী এসে একটি কালা আদমী দেখে রেলওয়ে কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে এল। সে মোহনদাসকে ওই কামরা হতে নেমে ভ্যানে বা তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে বলল। তাঁর

প্রথম শ্রেণীর টিকেট আছে অতএব মোহনদাস নামতে অস্বীকার করলেন। তার পর সেই কর্মচারীর নির্দেশে পুলিশ এসে মোহনদাসকে হাত ধরে জোর করে নামিয়ে দিল, তার জিনিসপত্রও নামিয়ে নিল। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে রাজী হলেন না। ট্রেন ছেড়ে গেল। তিনি যাত্রীদের অপেক্ষাগৃহে গিয়ে রইলেন।

পূর্বে বলেছি ভারতবর্ষে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন শীতকাল। মে মাসের শেষভাগে পৌঁছেছিলেন ডারবান। তার সাত-আট দিনের মধ্যেই রওনা হন প্রিটোরিয়া। আমাদের দেশে তখন দারুন গরম, কিন্তু নাটালে তখন শীতকাল। তাই অপেক্ষা-গৃহে সারারাত শীতে কাঁপতে হল মোহনদাসকে। আরো অপমানের ভয়ে লাগেজ হতে ওভারকোট খুলে নেওয়ার অনুরোধ করতেও যান নি। রাতে বসে বসে ভাবতে থাকেন কি করবেন। ভারতে ফিরে যাবেন না মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবেন এই সমস্যা তাঁর সামনে। তাঁকে যে অপমান করা হয়েছে তার মূল কারণ বর্ণবিদ্বেষ। ফিরে না গিয়ে যদি সম্ভবপর হয় এই ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করতে চেষ্টা করবেন। প্রয়োজন হলে তার জন্য দুঃখ কষ্টও বরণ করবেন। এই স্থির করে প্রিটোরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্তই করলেন। এই দিনেই হল তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের গোড়াপত্তন। তখন মোহনদাসের বয়স চব্বিশও পুরা হয় নি।

রাত শেষে সকালে লম্বা 'তার' পাঠালেন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং আবদুল্লা শেঠকে। আবদুল্লা শেঠ দেখা করেন জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে এবং মারিজবুর্গে 'তার' করেন ভারতীয়দের কাছে ব্যারিস্টার সাহেবের দেখাশুনা করতে। জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ে কর্মচারীর আচরণ সমর্থন করেন, কিন্তু বাকী পথটা নিরাপদে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ভারতীয়রা এসে মোহনদাসের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও বলে। ভারতীয়রা যে দক্ষিণ

আফ্রিকায় সসম্মানে নেই এ কথা বুঝতে একটুকুও দেরী হল না। যা হোক শেষ পর্যন্ত চার্লস টাউন পৌঁছে গেলেন নিরাপদেই। এইখানেই রেল লাইন শেষ। সে সময় চার্লস টাউন হতে জোহানিসবার্গ পর্যন্ত যাওয়া হত ঘোড়ার গাড়ীতে। কুলী ব্যারিস্টারের স্থান হল না অন্য যাত্রীর সঙ্গে গাড়ীর ভিতরে। গাড়ীর তদারক কর্তা শ্বেতাঙ্গ তাঁকে গাড়োয়ানের পাশে বসতে নির্দেশ দিল। মনে মনে বিরক্তি সহকারে অপমান হজম করলেন। কিন্তু এ নাটকের যবনিকা-পাত এখানেই নয়। কয়েক ঘণ্টা বাদে তাঁকে গাড়ীর সে জায়গা ছেড়ে দিতে বলা হয়। শ্বেতাঙ্গটি সেখানে বসে ধূমপান করবে এই ইচ্ছা। তার পায়ের নীচে মোহনদাসকে বসতে বলে। মোহনদাস অস্বীকার করেন এবং তার কথা অযৌক্তিক তা বলেন। তখন তাঁকে কান মলা, প্রহার ও টেনে সে জায়গা হতে নামাতে চেষ্টা করে। শ্বেতাঙ্গ যাত্রাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যায়ভাবে তাঁকে মারার জন্য প্রতিবাদ করে। তাতে সে নিরস্ত হয়, কিন্তু শাসায় গাড়ী যখন স্ট্যাণ্ডারটনে থামবে তখন দেখে নেবে। ভারতীয়রা এসেছিল সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। কিছু সংখ্যক ভারতীয় দেখে শ্বেতাঙ্গটি আর উচ্চবাচ্য করে না। এই জাতীয় লোক সত্যিকারের অন্তরে ভীরু। গাড়ী সেখানে রাত্রিতে থাকবে এবং ভোরে অন্য গাড়ীতে রওনা হতে হবে। মোহনদাস ভারতীয়দের তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তারা শুনে দুঃখিত হয় এবং নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়।

মোহনদাস ঘোড়াগাড়ী কোম্পানীর এজেণ্টকে সব কথা লিখে পাঠালেন এবং তাঁর লোক যে শাসিয়েছে সে কথাও জানালেন, আর এই প্রতিশ্রুতি চাইলেন যেন সেখান হতে অন্য যাত্রীর সঙ্গে একত্র বসতে দেওয়া হয়। এজেণ্ট উত্তরে জানালেন যে, অন্য যাত্রীর সঙ্গেই তিনি বসতে পারবেন এবং পূর্বেকার লোক আর এখন হতে থাকবে না। জোহানিসবার্গে পৌঁছলেন নিরাপদে। চেষ্টা করেও কোন

হোটেলে স্থান পেলেন না। স্থান নেই বলা হল, কিন্তু আসল কথা বর্ণবিদ্বেষ।

জোহানিসবার্গ ট্রান্সভালের শিল্পকেন্দ্র। সোনার খনি আছে। অদূরে হীরার খনি। যদিও তখন ট্রান্সভাল রাজ্য বুয়ারদের অধীনে তথাপি জোহানিসবার্গে ইংরেজদেরই সংখ্যাধিক্য। জোহানিসবার্গে ভারতীয়রা তাঁদের কষ্টের কথা জানান। সেখান হতে প্রিটোরিয়া পর্যন্ত ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেটে সেই শ্রেণীর কামরায় বসলেন। মাঝে গার্মিস্টনে গার্ড এল টিকেট পরীক্ষা করতে। কালা আদমী দেখেই বলল, 'নেমে এস, তোমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে।' কামরায় এক জন মাত্র ইংরেজ যাত্রী ছিলেন। তিনি গার্ডকে বললেন, 'কেন এই ভদ্রলোককে উত্যক্ত করছেন, আমার কোন আপত্তি নেই।' আর মোহনদাসকে বললেন, 'আপনি আপনার জায়গায় আরামে বসে থাকুন।' গার্ড অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'আপনি যদি কুলীর সাথে যেতে চান ত যান।' এই ঘটনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন এমন ইংরেজও ছিলেন যাঁরা বর্ণবিদ্বেষ পছন্দ করতেন না। সব সমাজেই ভাল লোক আছেন, তাঁদের সংখ্যা কম এবং মনুষ্যসমাজে তাঁদের প্রভাব আজও কম। এইখানেই মানুষ এখনও অসভ্য। তবে অল্পসংখ্যক ভাল লোকই ভরসাস্থল। একদিন হয়ত তাঁদের প্রভাবে মনুষ্যসমাজ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হবে।

প্রিটোরিয়া পৌঁছে দেখেন স্টেশনে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ নেই। সব ট্রেনযাত্রী চলে যাওয়ার পর টিকেট কালেক্টারকে টিকেটখানা দিয়ে হোটেল সম্বন্ধে খোঁজখবর করেন। সেখানে তখন একজন আমেরিকান নিগ্রো উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন নূতন অপরিচিত লোক অসুবিধায় পড়েছেন ভেবে এগিয়ে এসে বললেন এক আমেরিকানের হোটেলের কথা এবং সেখানে নিয়ে যান। এরূপ নিঃস্বার্থ সেবা যাঁরা করতে পারেন তাঁরা সভ্যতার উচ্চস্তরে

অধিষ্ঠিত এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হোটেলের মালিক মিঃ জনস্টন কথাবার্তা শুনে মোহনদাসকে রাখতে রাজী হলেন, তবে খাবার ঘরে দেওয়ার সর্তে। কারণ হোটেলের অন্য সব ইউরোপীয় আপত্তি করতে পারে। যদিও তাঁর নিজের কোন বর্ণবিদ্বেষ নেই এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন। পরে অবশ্য ইউরোপীয়দের মত নিয়ে মিঃ জনস্টন তাঁকে খাবার ঘরেই নিয়ে যান এবং যতদিন খুশী থাকতে পারেন বলেন। এইখানে দেখা গেল আশার আলো।

প্রিটোরিয়ায় মোহনদাস প্রায় এক বৎসর থাকেন। এই এক বৎসরে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক, কোরানের অনুবাদ ও রায়চাঁদ ভাইয়ের প্রেরিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকও অনেক পড়েন। কাউণ্ট লিও টলস্টয়ের 'স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে' পুস্তক পড়ে অভিভূত হন। রায়চাঁদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পুস্তক ও পরে চিঠির মারফতে টলস্টয়ের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ১৯০৪ সালে রাস্কিনের 'আন টু দিস লাস্ট' নামক পুস্তক পাঠ তাঁর জীবনের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি প্রিটোরিয়ার সকল ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তাদের সুখ দুঃখের কথা সব শোনেন। ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সরকারের নিকট স্মারক লিপি পেশ করার জন্য নিজেদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, গুজরাটী, তামিল, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভেদ-ভাবনা ভুলে একত্র হওয়ার কথা প্রথম সভায়ই বলেন। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক ঐক্য সকল ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এ কথা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে জাগে। এই হল ভবিষ্যতের বৃহৎ কার্যের সূচনা। এই এক বৎসরে দেখতে পান ভারতীয়দের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার নেই, রাত্রি ৯টার পর অনুমতিপত্র বা পারমিট ভিন্ন তারা বেরোতে পারে না, তিন পাউণ্ড ট্যাক্স না দিলে ট্রান্সভালে ঢুকতে পারে না, তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অন্য জায়গায় জমি খরিদ করতে পারে না, ইত্যাদি। এক দিন

প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের বাড়ীর সামনে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটবার সময় সান্ত্রী এসে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে যাওয়ার কথা না বলে বা কোনরূপ সতর্ক না করে ধাক্কা ও লাথি দিয়ে মোহনদাসকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়। সেই সময় তাঁর বিশেষ পরিচিত ধর্মপরায়ণ ইউরোপীয় মিঃ কোটস্ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সব দেখেন। মোহনদাসকে মামলা করতে বলেন এবং সাক্ষ্য দিবেন জানান। মোহনদাস মামলা করতে অস্বীকার করেন। মিঃ কোটস্ সান্ত্রীকে তার অন্যায়ের কথা বুঝিয়ে বলেন। সান্ত্রী ক্ষমা চায় মোহনদাসের কাছে। মামলা করার বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রথম হতেই। তাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। এমনকি যে মামলার জন্যে তিনি এসেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় তা আপোষে নিষ্পত্তি করবার জন্য প্রিটোরিয়া রওনা হওয়ার পূর্বেই দাদা আবছুল্লা শেঠকে বলেন। মামলা কিছুদিন চলার পর তিনি ছুই পক্ষকেই সে প্রস্তাবে রাজি করান এবং উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে মামলা মিটে যায়। ছুই পক্ষই সন্তুষ্ট হয়। এখানে মোহনদাসের কৃতিত্ব ও আনন্দ।

মোহনদাসের রাত্রে খাওয়ার পর বেড়াবার অভ্যাস ছিল। তাই তাঁকেও স্টেট এটর্নি বা সরকারী উকিল ডাঃ ক্রাউজের লিখিত একখানা চিঠি সব সময় সঙ্গে রাখতে হত। সেই চিঠিতে তাঁর দিন বা রাত্রির যে কোন সময় যে কোন প্রকাশ্য জায়গায় যাওয়ার অধিকারে যেন পুলিশ হস্তক্ষেপ না করে এ কথা লেখা ছিল। উভয়েই এক 'ইন' হতে ব্যারিস্টার হন। উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা হয় এবং ডাঃ ক্রাউজের বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণও হত। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সব ইউরোপীয় কিছু বর্ণবিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁরা তা অপছন্দও করতেন।

মামলার কাজ শেষ হওয়ার পর মোহনদাস ভারতে ফিরে আসা স্থির করে প্রিটোরিয়া হতে ডারবান চলে আসেন। আবছুল্লা শেঠ সিডেনহামে তাঁর বিদায় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অভ্যর্থনার দিন সকালে মোহনদাস কাগজে নাটাল বিধানসভায়

ভারতীয়দের ভোটাধিকার হরণ করা সম্বন্ধে উপস্থাপিত একটি বিলের খবর পড়ে চিন্তিত হন এবং সকলকে এই খবরটি জানান। দেশে ফিরে আসছেন, তাই এই বিল সম্বন্ধে কিছু বলতে ইতস্ততঃ করেন। শুধু আবদুল্লা শেঠকে বলেন "এই বিল আইনে পরিণত হলে আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হবে····· ইহা আমাদের আত্মসম্মানের মূলে কুঠারাঘাত করবে।" আবদুল্লা শেঠ সে কথা অন্যদের জানালে সবাই একবাক্যে বলল যে এ বিষয়ে কিছু করতে হলে 'গান্ধীভাই'কে ভারতে না গিয়ে ওখানে থাকতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহনদাস 'গান্ধীভাই' নামেই হন সুপরিচিত। ভারতে ফিরে আসার পর ১৯১৬ সালে তাঁকে প্রথম 'মহাত্মা' বলা হয়। পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৯২১ সালে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তনের পর তিনি মহাত্মা গান্ধী নামেই সুপরিচিত হন। অন্তরঙ্গ সহকর্মীরা তাঁকে 'বাপু' বলে সম্বোধন করত। গুজরাটী বাপু শব্দের অর্থ বাবা।

সকলের অনুরোধে 'গান্ধীভাই' আরো এক মাস দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে সম্মত হলেন। এইখানেই হল তাঁর সর্বজনীন কাজের প্রারম্ভ। তিনি ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে কাজ জুটাননি। কাজ তাঁর কাছে এসে হাজির হয়। হাজি আবদুল্লা শেঠের বাড়ীতে সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের এক সভা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, সিন্ধী, ছোট বড়, ধনী গরীব সবাই যোগ দিল এই সভায়। সকলের মনে খুব উৎসাহ। বিধান সভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ মহাশয়কে প্রথম 'তার' করা হল বিলের আলোচনা স্থগিত রাখবার জন্য। স্পীকার মহাশয় দুইদিনের জন্য আলোচনা স্থগিত করলেন। সবাই খুব খুশী। সারারাত জেগে বিধান সভার নিকট দরখাস্তের মুসাবিদা ও তা নকল করা হয় এবং তাতে যত লোকের সম্ভব দস্তখত সংগ্রহ করে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেওয়া হল। তথাপি বিল পাশ হয়ে গেল।

কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে এল একটা নূতন জীবন। তারা বুঝতে

পারল ব্যবসার অধিকারের মত রাজনৈতিক অধিকারের জন্যও তাদের সংগ্রাম করতে হবে। বিল পাশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয়রা দমে যায়নি। তখন লর্ড রিপন বৃটেনে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী। তাঁর নিকট একখানা বহু লোকের সই করা দরখাস্ত পাঠানো স্থির হল। এ কাজ করার জন্য গঠিত হল একটি কমিটী। গান্ধীভাই দরখাস্তের মুসাবিদা করলেন। পনের দিনের মধ্যে সমগ্র নাটাল হতে দূর দূর গ্রামে গিয়ে দশ হাজার ভারতীয়ের সহি সংগ্রহ করে কমিটীর প্রেসিডেণ্টের সহিতে পাঠানো হল দরখাস্ত। প্রমাণ হল ভারতীয়দের উৎসাহ, উদ্দীপনা, কর্মশক্তি এবং প্রথম সর্বজনীন কাজে গান্ধীভাইয়ের সংগঠনী শক্তি। দরখাস্তের নকল ছাপানো হল। ভারতে ও বৃটেনে খবরের কাগজে পাঠানো হল। টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও লণ্ডন টাইমস ভারতীয়দের দাবী যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন জানাল। এই বিল বৃটেনের রাজসমর্থন পাবে না এরূপ ধারণা হল। এই অবস্থায় গান্ধীভাইয়ের নাটাল তথা দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ অসম্ভব বিবেচিত হয়। তাই তিনি নাটালে ব্যারিস্টাররূপে থাকা স্থির করলেন, যেন সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের কাজ করতে পারেন। একজন কালা আদমী ব্যারিস্টার হিসাবে কাজ করবে এ সহ্য হল না ইউরোপীয়দের পরিচালিত 'ল সোসাইটির'। তার তরফ থেকে হল আপত্তি। কিন্তু কোর্ট সে আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাঁকে ব্যারিস্টার হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিলেন। আর কুড়ি জন ভারতীয় ব্যবসাদার তাঁদের ফার্মের ব্যারিস্টার হিসাবে তাঁকে এক বৎসরের অগ্রিম ফি দিলেন।

ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার লাভের আন্দোলন প্রভাবশালী করতে হলে একটি স্থায়ী সংস্থা দরকার। বৃটেনে থাকা কালে মোহনদাসের দাদাভাই নৌরজীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জন্মে। তিনি ছিলেন ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। তাই কয়েক বৎসর পূর্বে সংগঠিত কংগ্রেস নামের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। এক সভা করে গান্ধীভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী 'নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস' নামে সংস্থা গঠন

করা স্থির হয়। ২২শে আগস্ট, ১৮৯৪ সালে জন্ম নিল নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস। ভারত জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সাড়ে আট বৎসর পরে। তখনকার দিনে ভারত জাতীয় কংগ্রেস ছিল একটা বার্ষিক অধিবেশন মাত্র। কিন্তু নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস হল সারা বৎসরের কাজের সংস্থা। সঙ্ঘের চাঁদা মাসিক অন্ততঃ পাঁচ শিলিং বা বৎসরে তিন পাউণ্ড। কেউ কেউ বৎসরে চব্বিশ পাউণ্ড পর্যন্ত দিলেন। সভ্য সংখ্যা প্রথম বৎসরে হল তিন শত। কংগ্রেসের সভা মাসে অন্ততঃ একবার করে হত। সেখানে টাকা পয়সার হিসাব দেওয়া হত, রাজনৈতিক আলোচনা করে কার্যক্রম স্থির হত। গান্ধীভাই হলেন এই কংগ্রেসের প্রথম সম্পাদক। কর্মকুশলতার গুণে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সেই হয়ে উঠলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবিসম্বাদিত নেতা। এর মধ্যে খবর এল লর্ড রিপন ভারতীয়দের ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত করার বিলে অনুমোদন দেননি। এতে ভারতীয়দের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু এ জয় ক্ষণস্থায়ী। অন্য আকারে বিল পাশ হল। তাতে প্রকাশ্য বর্ণবৈষম্যের কথা নেই, কিন্তু কার্যতঃ ভারতীয়দের ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত করা হল। প্রতিবাদ করেও কোন ফল হল না।

আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক কাজও শুরু হয়। ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের প্রধান অভিযোগ এই যে, তারা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। যাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে সবাই নজর দেয় কংগ্রেস সভায় সে সব আলোচনা হত। কংগ্রেসের কাজ পরিচালিত হত গুজরাটী ভাষায়। এই কংগ্রেসের আওতায় নাটাল ইণ্ডিয়ান এডুকেশন এসোসিয়েশন গঠিত হল—নাটালে জাত ইংরেজী-ভাষী ভারতীয় যুবকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য। এই এসোসিয়েশনের ফি ছিল নাম মাত্র। একটি ছোট লাইব্রেরীও খোলা হল।

কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে দুখানা পুস্তিকা ছাপায়। বেশ পরিশ্রম করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে গান্ধীভাই

লেখেন পুস্তিকা দুখানি। উদ্দেশ্য দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ইউরোপীয়দের, বৃটেনের অধিবাসীদের ও ভারতের সবাইকে সঠিক অবস্থা জানানো। এর ফল ভালই হল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু লোকের এবং ভারতে সকল দলের সহানুভূতি পাওয়া গেল। ইউরোপীয়দের মধ্যেও সহানুভূতিসম্পন্ন লোক জুটল।

ভারত হতে যে সমস্ত শ্রমিক গিয়েছিল তাদের চুক্তিপত্রে এই ছিল যে, তারা পাঁচ বৎসর পরে ইচ্ছা করলে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে সেখানে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু সেখানকার ইউরোপীয়রা যখন দেখল এরা কৃষি আয়ের ব্যাপারেও তাদের প্রতিযোগী হয়ে উঠছে তখন এদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে লাগল। থাকতে হলে মাথাপিছু পঁচিশ পাউণ্ড ট্যাক্স আদায়ের প্রস্তাব করল। তা নিয়ে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ করল। অবশেষে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড এলগিনের সম্মতি নিয়ে বার্ষিক তিন পাউণ্ড ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব হল। ষোল বৎসরের উপর ছেলে এবং তের বৎসরের উপর মেয়ের জন্যও সে ট্যাক্স দিতে হবে। অনেক শ্রমিককেই তার পরিবারের লোক ধরে মোট বারো পাউণ্ড ট্যাক্স দিতে হবে বৎসরে। অথচ শ্রমিক হিসাবে তার মাসিক আয় ছিল মোটে চোদ্দ শিলিং। অতএব এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই বারো পাউণ্ড ট্যাক্স আদায়ের প্রস্তাব ঘোরতর অবিচার ও জুলুম।

এইভাবে গান্ধীভাইয়ের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় তিন বৎসর কেটে গেল। ব্যারিস্টার হিসাবেও পসার জমে উঠেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে হবে ভেবে ছয় মাসের জন্য ভারতে এসে স্ত্রী ও দুই ছেলেকে (হরিলাল ও মণিলাল) নিয়ে ফিরে যাওয়া স্থির করলেন।

১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি ভারতে রওনা হয়ে এলেন। রাজকোটে একমাস বসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে একখানা

পুস্তিকা লেখেন। দশ হাজার ছাপিয়ে ভারতের সর্বত্র বিলি করা হয়। পাইওনিয়ার কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ বিষয়ে লেখা বেরোয়। ওই পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত সারাংশ রয়টার তার করে লণ্ডনে পাঠায়, আবার লণ্ডন হতে সংক্ষিপ্ত হয়ে সারাংশ তিন লাইনে যায় নাটালে। এই সারাংশের সারাংশ অতিরঞ্জিত রূপ পরিগ্রহ করে। 'সত্য কথা এক সত্যবাদীর মুখ হতে আর এক সত্যবাদীর মুখে গিয়ে বিকৃত হয়' এই প্রবাদবাক্য সত্য প্রমাণিত হল এখানে। কাগজে তা দেখে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়রা হল খুব উত্তেজিত, কিন্তু আসলে এই পুস্তিকার ভাষা দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত দুইখানা পুস্তিকার ভাষার চেয়ে অধিক সংযত ছিল, কোন প্রকারের অতিরঞ্জন ত ছিলই না। রয়টারের ত্রুটিতে হল এই উত্তেজনা সৃষ্টি।

এবার রাজকোটে থাকাকালীন বোম্বেতে প্লেগ আরম্ভ হয়। রাজকোটেও হওয়ার আশঙ্কা ছিল। শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটী হয়। মোহনদাস গান্ধীও হন সেই কমিটীর সভ্য। পায়খানা পরিষ্কারের দিকে তিনি বিশেষ নজর দেন। এ কথা এ সময় বুঝতে পারেন যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোক তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের চেয়ে বেশী পরিচ্ছন্ন ও পরামর্শ শুনতে প্রস্তুত। তথাকথিত শিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য তা বুঝলেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে তিনি শুধু পুস্তিকা লিখেই ক্ষান্ত হননি। বোম্বে, পুণা ও মাদ্রাজে জনসভা করেন। স্যার ফিরোজ সা মেহতার সাহায্যে বোম্বেতে, লোকমান্য তিলক, মহামতি গোখলে ও প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সাহায্যে পুণায় এবং 'হিন্দু' সম্পাদক শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ও 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজের সম্পাদক শ্রীপরমেশ্বরণ পিল্লের সাহায্যে মাদ্রাজে ভালভাবে জনসভা হয়।

ভীষণ উৎসাহ দেখা যায় মাদ্রাজে। একজন মাদ্রাজী গিরিমিটিয়া বালসুন্দরমের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার তিনি যা করেছিলেন তা

প্রচারিত হওয়ার ফলেই হয় সাধারণের মধ্যে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

গোখলের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম দেখা। তখনি একটা আত্মীয়তার ভাব জন্মে। পরে পরিণত হয় তা অতি নিবিড় সম্পর্কে। তিনি গোখলেকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু মনে করতেন। উভয়েরই মত ছিল রাজনীতিকে ধর্মময় করা। এখানে দুজনের মৌলিক মিল। গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার যাতে হয় তার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছেনও সেজন্য। কিন্তু 'হিন্দ্ স্বরাজে' যে জীবনদর্শনের কথা আছে তা গোখলের মনঃপূত হয়নি। এইখানে দুজনের প্রকাণ্ড অমিল।

বোম্বে, পুণা ও মাদ্রাজে আশানুরূপ সাড়া পেলেও কলিকাতায় বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেননি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখাননি। অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে ত তাঁকে ভবঘুরে ভেবে সেরূপ ব্যবহার করে। বঙ্গবাসী অফিসে একঘণ্টা বসিয়ে রেখে রূঢ়ভাবে সময় নেই বলে বিদায় দেয়। কিন্তু ইংলিশম্যান কাগজের সম্পাদক মিঃ সণ্ডার্স খুব উৎসাহ দেখান এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। খানিকটা আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছিল এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হতে তার পান "পার্লামেণ্টের অধিবেশন জানুয়ারী মাসে। শীঘ্র ফিরে আসুন।" কলিকাতা হতে সোজা চলে যান বোম্বে এবং স্ত্রী, দুই পুত্র ও ভাগনেকে নিয়ে জাহাজে রওনা হন ডারবান। কিন্তু কাকতালীয়বৎ একটা ঘটনা ঘটল। ওই জাহাজে এবং আর একটি জাহাজে মোট প্রায় আট শত ভারতীয় যাত্রী একসঙ্গে যাচ্ছিল ডারবান বন্দরে। পূর্বে অতিরঞ্জিত খবরের জন্য উত্তেজনার কথা বলেছি। এই আট শত ভারতীয় যাওয়া নিয়েও প্রচার হয় যে গান্ধী পরিকল্পনা করে ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়াবার জন্য এদের নিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরো নিয়ে আসবে। উদ্দেশ্য ইউরোপীয়দের প্রভাব খর্ব করা। গান্ধী কিন্তু মোটেই এদের আসা সম্বন্ধে কিছু জানতেন না

এবং কোনরূপ পরিকল্পনা ত মোটেই ছিল না। এই উত্তেজনার পেছনে সরকারী সহানুভূতিও ছিল।

জাহাজ দুখানা আঠারো দিন পর ডারবান বন্দরে এল। জাহাজ বোম্বে হতে ছাড়বার সময় বোম্বেতে প্লেগ ছিল, প্লেগবীজানুর আক্রমণ প্রকট হতে তেইশ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে এই অজুহাতে জাহাজ দুখানাকে বন্দরে আটক করা হল। আরো তেইশ দিন পরে যাত্রীদিগকে নামতে দেওয়া হবে। জাহাজে অবশ্য তখন কোন প্লেগরোগী ছিল না। জাহাজ আটক করার পর ভয় দেখানো শুরু হয়, ফিরে গেলে ভাড়ার টাকা দিয়ে দেওয়া হবে ইত্যাদি সবরকমের চেষ্টা চলে। এমনকি জাহাজ কোম্পানীর আবদুল্লা শেঠের উপরও চাপ দেওয়া হয়। এ সব সত্ত্বেও ভারতীয়রা দমে যায়নি। গান্ধীভাই জাহাজের যাত্রীদের নৈতিক বল রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অবশেষে তেইশ দিন শেষ হওয়ার পর যাত্রীদের নামতে দেওয়া হয়।

আবদুল্লা শেঠের এডভোকেট মিঃ লাউটনের সঙ্গে গান্ধী নামলেন। প্রথমে ইউরোপীয় ছেলেরা 'গান্ধী' 'গান্ধী' বলে চীৎকার করে। ক্রমে ইউরোপীয় বেশ কিছু সংখ্যায় একত্র হয়। মিঃ লাউটনকে ধরে আলাদা করে নেয়। তারপর আরম্ভ হল ইটের টুকরো ও ডিম ছোঁড়া। অবশেষে গান্ধীর পাগড়ী কাড়া, তাঁকে লাথি ও মারধর। এই সময় পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্টের স্ত্রী মিসেস আলেকজাণ্ডার যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। তিনি গান্ধীকে চিনতেন। সেই সাহসী মহিলা তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন। ইত্যবসরে পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্টও খবর পেয়ে একদল কনস্টেবল পাঠালেন। তাদের সহযোগিতায় এক পাশা বন্ধু রুস্তমজীর বাড়ী গিয়ে উঠলেন। সে বাড়ী ঘেরাও করল ইউরোপীয় জনতা। পুলিশ সুপারের পরামর্শে বন্ধুর বাড়ী, নিজের ও স্ত্রী পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য গান্ধীভাইকে পালিয়ে যেতে হল ছদ্মবেশে পেছন দিক দিয়ে। এভাবে মৃত্যুর

হাত হতে রক্ষা পেলেন এ যাত্রা। মিঃ চেম্বারলেন তখন বৃটেনে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী। তিনি নাটাল সরকারকে তার করলেন গান্ধীর উপর হামলাকারীদের অভিযুক্ত করে বিচারালয়ে পাঠাতে, যেন তাঁর প্রতি সুবিচার হয়। কিন্তু গান্ধীভাই মামলা করতে রাজি হলেন না। আর যেদিন জাহাজ হতে নামেন সেইদিন নামবার পূর্বে নাটাল এডভারটাইজার কাগজের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে ভারতে তাঁর লিখিত বক্তৃতার নকল, ছাপানো পুস্তিকা প্রভৃতি সমস্ত কাগজ দেন। তাতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, গান্ধী অন্যায় কিছু বলেননি এবং তিনি পরিকল্পনা করেও ভারতীয়দের নিয়ে আসেননি। সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়াতে এবং মামলা করতে অস্বীকার করায় ইউরোপীয়রা লজ্জিত হল। গান্ধীভাইয়ের তথা ভারতীয়দের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। নাটালের আবহাওয়া ঝড়ের পর শান্ত। খবরের কাগজ গান্ধীকে নির্দোষ বলে এবং ইউরোপীয় জনতার নিন্দাবাদ করে।

দুই জাহাজের যাত্রীদের নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে খুব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হল যে, ভারতীয়রা নিজ অধিকারের জন্য মানুষের মত সংগ্রাম করতে পারে। ইউরোপীয়রা এটা তাদের বিপদের কারণ ভাবল। তাই নাটাল বিধান সভায় দুইটি বিল উপস্থাপিত হল ভারতীয়দের অধিকার আরো খর্ব করার জন্য। ভারতীয়দের আপত্তি, এমনকি ঔপনিবেশিক সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করা সত্ত্বেও বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হল। তখন গান্ধীভাই নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। এভাবে কাটে আরো দুই বৎসর। এই দুই বৎসরে তাঁর ব্যারিস্টারী ব্যবসায়েও উন্নতি হয় বেশ। কিন্তু তাঁর মন ঝুঁকল বেশী সর্বজনীন কাজে। রোগীর সেবা তার মধ্যে একটি। রোগীর মধ্যে কুষ্ঠরোগীকে প্রায় সবাই ঘৃণা করে। একদিন এক কুষ্ঠরোগী এল তাঁর কাছে। তিনি তাকে খাইয়ে বিদায় করে

দেননি। বাড়ীতে রেখে নিজ হাতে তার সেবা করেন এবং কয়েকদিন পরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। এখানেই হল তাঁর কুষ্ঠসেবার গোড়াপত্তন। এসে পড়ল বুয়ার যুদ্ধ। ইংরেজ ও বুয়ারদের মধ্যে প্রভুত্বের লড়াই। তথাপি যুদ্ধের সময় এ কথাও বলা হত যে, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জিয়ায় ভারতীয়দের প্রতি বুয়ারদের ঘোরতর অবিচারও যুদ্ধের একটি কারণ। যদিও ইংরেজ শাসিত নাটালেও যথেষ্ট অবিচার ছিল। আসল কথা এই যে, ট্রান্সভালে যদিও বুয়ার-দের প্রভুত্ব, জোহানিসবার্গে ইংরেজরা সংখ্যায় বেশী, সোনার খনির মালিকও অধিকাংশ ইংরেজ। ধনসম্পত্তির অধিকার শেষ পর্যন্ত কার হাতে আসবে এই ছিল লড়াইয়ের মূল কারণ। স্বার্থবুদ্ধিরই পরিণতি এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে গান্ধীভাইয়ের অন্তরের সহানুভূতি ছিল বুয়ারদের সঙ্গে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে ইংরেজকে এই যুদ্ধে সাহায্য করাই স্থির করেন।

আমরা তখন খুব ছোট। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে তখন বুয়ারদের প্রতি বেশ একটা সহানুভূতি ছিল। তার প্রধান কারণ ইংরেজ বিদ্বেষ। গান্ধীভাইয়ের মনে সে বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর তখনও ইংরেজদের ন্যায়বিচারের উপর আস্থা ছিল। আর এ পর্যন্ত তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হিসাবেই অধিকার দাবী করে এসেছেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি হবে। তাই তিনি ইংরেজদের সাহায্য করতে অগ্রণী হলেন। প্রথমতঃ সাহায্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু যুদ্ধে একের পর এক বিপর্যয়ে হতাহতের সংখ্যা বেশী হওয়ায় আহতদের সেবা শুশ্রূষা, তাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য ভারতীয়দের এক দল গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই দল খুব ভাল কাজ করে। গান্ধীভাই ছিলেন দলপতি। ইংরেজদের সেনাপতির কাছ থেকে দল প্রশংসা পত্র পায়। সাধারণ ইংরেজও খুব খুশী হয়। যুদ্ধে অবশ্য

ইংরেজদের জয় হয়। কিন্তু সে জয় অর্জন করতে গিয়ে এমনকি বুয়ার মেয়েদের উপর চরম নিষ্ঠুরতা করা হয়। এর প্রতিবাদ হয়েছিল উদার ইংরেজদের কাছ থেকে, শুধু তই নয়, স্বয়ং বৃটেনের সম্রাট পর্যন্ত বিচলিত হন। কাজেই এ জয় কালিমালিপ্ত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গান্ধীভাই ভাবলেন যে, এবার হয়ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হয়ে যাবে এবং তাঁর পক্ষে এখানে ব্যারিস্টারী করা ভিন্ন অন্য কাজ তেমন থাকবে না। তাই তিনি ভারতে ফিরে গিয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে সর্বজনীন কাজে অংশ গ্রহণ করা স্থির করলেন। বিশেষ প্রয়োজন হলে তা জানানো হবে এবং তখন তিনি আসবেন এই সর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা তাঁকে ভারতে আসবার অনুমতি দিলেন। ১৯০১ সালে ফিরে এলেন ভারতে।

ভারতে ফিরে আসার পূর্বে তাঁকে বহুস্থানে বিদায় অভ্যর্থনা, সাথে সাথে দামী উপহারও দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীর জন্য পঞ্চাশ গিনি মূল্যের গলার হার ছিল, হীরাও ছিল। কিন্তু গান্ধীভাই ভেবেচিন্তে স্থির করলেন এসব মূল্যবান উপহার তাঁর নেওয়া উচিত হবে না। কস্তুরবাকেও একপ্রকার চাপ দিয়ে রাজি করান। তখন থেকেই তাঁর ধারণা সর্বজনীন কাজে নিযুক্ত কোন কর্মীর দামী উপহার নেওয়া উচিত নয়। তিনি ওই সব উপহারের জিনিস একটি অছিমণ্ডলীর হাতে দিলেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের কল্যাণে নিয়োগের জন্য। বাস্তব অপরিগ্রহ রূপ নিয়েছিল তাঁর প্রাণে এই সময়েই।

ভারতে ফিরে কিছুদিন পরে ১৯০১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দেন। বোম্বে হতে ট্রেনে যাওয়ার সময় এক স্টেশনে স্যার ফিরোজ সা মেহতার সেলুনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে দেখেই স্যার ফিরোজ সা বলে উঠেন, "গান্ধী, আপনার জন্য কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না, অবশ্য আপনি যে প্রস্তাব চান তা পাশ করিয়ে দেব। আমাদের নিজের দেশেই কি অধিকার আছে আমাদের! আমার বিশ্বাস যতদিন নিজের দেশে কোন

ক্ষমতা পাওয়া না যাবে ততদিন উপনিবেশ সমূহে এর চেয়ে বেশী সুবিধা হবে না।" গান্ধী একটু আশ্চর্য হলেন বটে। স্যার ফিরোজ সার মত ঝানু লোকের মত বদলাবার চেষ্টা করে সফল-কাম হননি। শুধু প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি পাবেন তাতেই সন্তুষ্ট হতে হল। এই তাঁর প্রথম কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে বহু প্রস্তাব। বড় বড় নেতাদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা। শেষের দিকে খুব তাড়াহুড়া। রাত এগারোটা বেজেছে, সবাই যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। এর মধ্যে স্যার ফিরোজ সা বলে উঠলেন "আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।" গোখলে তখুনি বললেন, "না, না। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে প্রস্তাব আছে। মিঃ গান্ধী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।" তখন স্যার ফিরোজ সা গোখলেকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি প্রস্তাব দেখেছেন কি না এবং আপনার পছন্দসই কি না?" গোখলে প্রস্তাবটিকে উত্তম বলাতে গান্ধীকে তা উত্থাপন করতে বলা হল। তিনি প্রস্তাব পড়লেন এবং গোখলে সমর্থন করলেন। সবাই চীৎকার করে উঠল—'সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত'। ভাগ্যিস গোখলে ছিলেন, নইলে প্রস্তাব হয়ত উঠতই না। শুধু গোখলে দেখেছেন তাই যথেষ্ট। অন্য কারো দেখবার বা বুঝবার দরকার নেই। এ জিনিস গান্ধীর মনঃপূত হয়নি। কংগ্রেস অধিবেশনেও এই প্রস্তাবের জন্য সময় ছিল মোটে পাঁচ মিনিট। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তবু এ যাত্রায়ও বক্তৃতা দিতে উঠে গান্ধীর মাথা ঘুরছিল।

গান্ধী তৎকালীন রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থাকবার স্থান পান। তাঁর সৌভাগ্য লোকমান্য তিলকও ছিলেন সেখানে। তাঁকে নিবিড়ভাবে দেখবার সুযোগ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতিলাল ঘোষের সঙ্গে লোকমান্যের শাসক-গোষ্ঠীর অপকর্মের আলোচনা তাঁর মনের উপর রেখাপাত করে। কংগ্রেস সেচ্ছাসেবকরা তখনও নিজ নিজ কাজ ঠিক মত করতে অভ্যস্ত হয়নি, আর প্রতিনিধিরাও ছিল শৃঙ্খলাবিহীন। তারা কেবল হুকুম

করছে ও থাকবার জায়গা নোংরা করছে। এই অবস্থায় গান্ধী কংগ্রেস সম্পাদক ঘোষালকে গিয়ে বলেন তাঁকে কোন কাজ দিতে। তিনি যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত এ কথা জানান। শ্রীঘোষাল সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কেরানীর কাজ দেন। খুব আনন্দের সঙ্গে সে কাজ করেন। শ্রীঘোষাল তাঁর সার্টের বোতাম নিজে লাগাতেন না। চাপরাশী করত সে কাজ। গান্ধী সে কাজটা করবার ভারও চেয়ে নিলেন। কোনো কাজই ছোট নয় এই তার বাস্তব প্রদর্শন। এই কয়দিনে গান্ধী কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী অনেকটা বুঝতে পারলেন। গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতার কার্যাবলী লক্ষ্য করেন। তাঁর সব চেয়ে দুঃখ হল কংগ্রেসের কাজে ইংরেজীর প্রাধান্য দেখে। আরও দেখলেন একজনের কাজ একাধিক লোকে করছে, আবার খুব প্রয়োজনীয় কাজ করবার লোক নেই।

কংগ্রেস অধিবেশনের পর গান্ধী কলিকাতায় মাসখানেক থাকা স্থির করেন। গোখলের ইচ্ছানুসারে তাঁর সঙ্গে থাকেন। তাতে শুধু গোখলেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয় না, বহু লোকের সঙ্গে গোখলে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্তরের বহু বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

গোখলে কখনও এক মিনিট সময় নষ্ট করতেন না। তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিল জনকল্যাণের জন্য। তাঁর সমস্ত কথাবার্তারও উদ্দেশ্য ছিল ওই একই জিনিস। ভারতের দারিদ্র্য ও পরাধীনতা ছিল তাঁর গভীর চিন্তার বিষয়। তাঁকে অবশ্য বিভিন্ন প্রকারের কাজে যুক্ত করতে চাইলে তিনি সবাইকে বলতেন "আপনি করুন। আমাকে আমার কাজ করতে দিন। আমি চাই দেশের স্বাধীনতা। তা লাভ হওয়ার পর অন্য কাজের কথা ভাবা যাবে। বর্তমানে সমস্ত শক্তি ও সময় দিয়ে ওই এক কাজ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" গান্ধীও নিজ শক্তিকে এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ ব্যাপারে গোখলের প্রভাব থাকা সম্ভবপর।

১৯২১ সালে জানুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধী আমাদের বলেছিলেন "যে কাজ হাতে নেবে তার জন্যই সমস্ত শক্তি ব্যয় করো—অতিরিক্ত শক্তি থাকা অর্থাৎ একাধিক কাজে সে শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা ব্রহ্মচর্যবিরোধী।" গোখলে গান্ধীকে আচার্য (তখন শুধু ডক্টর) প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আচার্য রায় তখনও খুব সাদাসিদে। তাই গান্ধী ও আচার্য রায়ের মধ্যে খুব একটা অন্তরের নিবিড় সম্পর্ক হয় সেই সময় হতেই। তা ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কলিকাতা হতে যেদিন গান্ধী রাজকোট রওনা হন, গোখলে ও আচার্য রায় তাঁকে বিদায় দিতে হাওড়া স্টেশনে যান। গান্ধী তখন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। আচার্য রায়ের পোশাক ছিল এত সাদাসিদে যে টিকেট কালেক্টর তাঁকে আটকে দেয়। গোখলের কথায় ছেড়ে দেয়।

কলিকাতার রাস্তায় গান্ধী পায়ে হেঁটেই প্রায় সব জায়গায় যেতেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত খৃষ্টান শ্রীকালীচরণ ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন সাধারণতঃ খৃষ্টানরা কংগ্রেস হতে দূরে এবং হিন্দু মুসলমান হতে পৃথক্ থাকত। শ্রীব্যানার্জি খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। গান্ধীও ভগবদ্‌গীতার ভক্তি মার্গের কথা বলেন। কিন্তু কেউ কাউকে নিজ মতে নিয়ে আসতে পারেন না। তিনি জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র ও স্যার গুরুদাস ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা শোনেন। শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের জীবনী পড়েন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পার্থক্য বই পড়ে উপলব্ধি করেন। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি তখন অসুস্থ, সাক্ষাৎকার নিষেধ। অতএব তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁরই বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের এক উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে যান। সেখানকার বাংলা গান খুব ভাল লাগে। সেই সময় হতেই তিনি বাংলা গানের অনুরাগী। সে অনুরাগ বরাবরই ছিল।

গুরুদেবের 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো' এই গানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়। যেমন ছিল ভক্তকবি নরসিংহ মেহতার গুজরাটী গান 'বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে'।

ব্রাহ্ম সমাজের বহু লোকের সঙ্গে দেখা করবার পর তাঁর ইচ্ছা হয় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করার। এজন্য কলিকাতা হতে হেঁটে যান বেলুড় মঠে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন অসুস্থ হয়ে তাঁর কলিকাতার বাড়ীতে। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধ। তাই সে আশা পূর্ণ হল না। সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে যান চৌরঙ্গী ম্যানসনে। তাঁর জাঁকজমক দেখে গান্ধী অবাক্ হয়ে যান। কথা বলেও খুশী হন না। পরে আর একবার সাক্ষাৎ হয় অন্য জায়গায়। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা প্রশংসার্হ মনে করেন।

কালীঘাটের কালী মন্দির দেখতে যান। সেখানকার পাঁঠাবলি এবং রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হওয়া দেখে ভীষণ ব্যথিত হন। ধর্মের নামে এরূপ কাজ তিনি নিষ্ঠুরতা বলেই মনে করেন এবং স্নেহপ্রবণ বাঙ্গালী সমাজে কিরূপে তা চলছে এ কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যান।

কলিকাতায় তাঁর মুখ্য কাজ ছিল তুটি। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর বাংলার জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ধর্মীয় ও জনপ্রতিষ্ঠান দেখা। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ার যুদ্ধের সময়কার ভারতীয় সেবাদলের কাজ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সে বক্তৃতার প্রশংসা করেন।

এইবার তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন ওই শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা বুঝবার জন্য। তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেন তাদের তুরবস্থা। এজন্য রেল কর্তৃপক্ষ ত দায়ী বটেই, যাত্রীরাও কম দায়ী নয়। সেই সময়ের পর প্রায় যাট বৎসর অতীত। আজও রুচিজ্ঞান সম্পন্ন কোন লোকের পক্ষে এই তুই কারণে তৃতীয় শ্রেণীতে বেশী দূর যাওয়া সম্ভব নয়

তিনি থেমে থেমে যান। প্রথমে আসেন কাশীতে। সেখানকার বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতরকার অপরিচ্ছন্নতা, গোলমাল তাঁকে খুবই ব্যথিত করে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার অভিজ্ঞতাও ওইরূপ অপ্রীতিকর। ধর্মস্থান এরূপ থাকা হিন্দুদের পক্ষে পরম লজ্জাকর।

শ্রীমতী য়্যানি বেসাণ্ট তখন কাশীতে। অসুস্থতা হতে সবে মাত্র সেরে উঠেছেন। গান্ধী দেখা করতে এসেছেন এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ আসেন। "আমি এসেছি শুধু আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে। আপনার শরীর এখনও তুর্বল, তথাপি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে আর কষ্ট দিব না।" শুধু এই কয়টি কথা বলেই বিদায় নেন। এটি তাঁর চরিত্রের লক্ষণীয়। বিনা প্রয়োজনে তিনি কখনো কোন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন না, প্রয়োজনে দেখা করলেও যথাসম্ভব কম সময় নিতেন। সবাই সেরূপ আচরণ করুক তিনি তাও চাইতেন। মনে পড়ে একবার ১৯২১ সালে কলিকাতায় এক কলেজের কয়েকটি ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। অযথা সময় নিচ্ছিল দেখে ব্যথিত হয়ে বললেন "যুবকগণ, যদি নিজেদের সময় বাঁচাতে না চাও, দয়া করে আমার সময় বাঁচাও।"

রাজকোটে গিয়ে এখানেই আবার ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। জামনগর ও ভিরাওয়ালে তিনটি মামলায় জয়ী হওয়ায় যেমন আত্ম-প্রত্যয় বাড়ে তেমনি উকিলদেরও তাঁর উপর ভরসা হয়। তাই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী উকিল মাওজী দাভে ব্যারিস্টারী করবার জন্য বোম্বেতে যেতে বলেন। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনো তাঁর মন হতে যায়নি। যাহোক ১৯০২ সালের মার্চ মাসে বোম্বেতে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। গোখলেরও ইচ্ছা ছিল তিনি বোম্বেতে ব্যারিস্টারী করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন কাজ অর্থাৎ কংগ্রেসের কাজ করেন। এবার ব্যারিস্টারীতে আশাতীত সাফল্য হল। দক্ষিণ আফ্রিকার মক্কেলরাও কিছু কিছু কাজ দিত। গোখলের নজর ছিল গান্ধীর উপর। এমন কি

তিনি গান্ধীজীর কাজ সম্বন্ধে মনে মনে পরিকল্পনাও করতেন। ভরসা ছিল তাঁর উপর যথেষ্ট। সপ্তাহে দুই তিন বার গান্ধীর চেম্বারে আসতেন। কখনো কখনো বা বন্ধুদের নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। নিজের কাজ সম্বন্ধেও গান্ধীকে ওয়াকেবহাল রাখতেন। গোখলেও পরিকল্পনা করেছিলেন, গান্ধী নিজেও বোম্বেতে থেকেই কাজ করা স্থির করেছিলেন, এমন সময় মাত্র কয়েক মাস থাকার পরই অপ্রত্যাশিতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা হতে তার এল "চেম্বারলেন আসছেন এখানে। অবিলম্বে ফিরে আসুন।" নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসা যেন তাঁর ভাগ্যে নেই। এবারও ভাবলেন হয়ত বছর খানেক থাকতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাই কস্তুরবা ও ছেলেদের রেখেই গেলেন। ১৯০২ সালের শেষভাগে পেঁৗছলেন ডারবান।

পৌঁছতে পৌঁছতেই কাজ আরম্ভ হল মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে। সাক্ষাতের দিন স্থির হয়েছিল পূর্বেই। আবেদনপত্র মুসাবিদা করলেন এবং সাক্ষাৎকারী দলভুক্ত হলেন। চেম্বারলেনের সঙ্গে সাক্ষাতে বিশেষ কিছু ফল হল না। তিনি শুধু বললেন যে, ভারতীয়দের অভিযোগ সম্পর্কে নাটাল সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তিনি এসেছিলেন ইংরেজ ও বুয়ারদের সন্তুষ্ট করতে। কাজেই ভারতীয়দের কথায় বেশী কর্ণপাত করা চলে না। প্রিটোরিয়ায় (ট্রান্সভাল) ত সাক্ষাৎকারে কে কে থাকবে পূর্ব হতে সে নাম চাওয়া হল এবং গান্ধীর নাম অন্তর্ভুক্ত করতেই রাজী হলেন না। অজুহাত এই যে, তাঁর কথা ত ডারবানে শোনা গিয়েছে, এখানে স্থানীয় লোকদের কথা শোনা যাক্। অবশ্য এ কথা মিঃ চেম্বারলেন ভাল করেই জানতেন যে, গান্ধী এই দুই জায়গারই ভারতীয়দের অবিসম্বাদিত নেতা। নইলে ভারত হতে তাঁকে জরুরী তার পাঠিয়ে নিয়ে আসা হত না।

গান্ধীকে দলে অন্তর্ভুক্তির অস্বীকৃতি ভারতীয়রা অপমান বলেই

মনে করল। কেউ কেউ ত, বিশেষভাবে তায়েব শেঠ, এই কারণে চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করা অনুচিত বললেন। কিন্তু গান্ধীর পরামর্শে এই অপমান হজম করেও দেখা করা স্থির হল। নইলে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের অভিযোগ বিশেষ কিছু নেই এ কথা বলবার সুযোগ হবে। এখানেও গান্ধী আবেদনপত্র মুসবিদা করে দেন। দলের নেতা হয়ে গেলেন মিঃ গডফ্রে নামক একজন ভারতীয় ব্যারিস্টার। মিঃ চেম্বার-লেনের বিবেক দংশন অনুভূত হয়। তাই তিনি ভারতীয় দলকে বলেন একজনের কথা বারবার না শুনে নূতন লোকের কথা শোনা ভাল। এইভাবে ভারতীয়দের খানিকটা সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ওখানকার সরকারী বিভাগ গান্ধী ট্রান্সভালে ঢুকতে পেরেছেন বলেই ক্রুদ্ধ। তাঁকে ফেরৎ পাঠাবার জন্য ভারতীয়দের বলে। গান্ধীর প্রতি কর্মচারীটির ব্যবহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ত ছিলই—ভদ্রতাবিগর্হিতও ছিল।

মিঃ চেম্বারলেন ফিরে গেলে হয়ত গান্ধী চলে আসতে পারতেন কিন্তু ভারতীয়দের স্বার্থে থাকা দরকার বোধ করলেন। তাই স্থির করলেন জোহানিসবার্গে ব্যারিস্টারী করে সর্বজনীন কাজে যথাসাধ্য অংশ গ্রহণ করা। ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্টের অনুমতি পেয়ে সেখানে ব্যারিস্টার শ্রেণীভুক্ত হলেন। মিঃ রীচ নামক এক ইংরেজের সহায়তায় অফিসের জন্য উপযুক্ত স্থানে ঘর পেলেন। ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ গান্ধীকে এ কথা বলল 'আপনার কথায়ই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করেছি, দেখুন তার ফল কি হল!'

এর পর দীর্ঘ বারো বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান। যদিও ভারত ছাড়বার সময় এক বৎসর থাকতে হবে ভেবেছিলেন। এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার পর তাঁর ধর্মপিপাসা আরো বেড়ে যায়। ১৮৯৩ সালে মামলা নিয়ে যখন প্রথম আসেন সেই মামলার এটর্নি মিঃ বেকার ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান। তিনি গান্ধীকে অনেক সৎখৃষ্টানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল গান্ধীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাল করে না জেনে অন্য ধর্ম

গ্রহণ করার প্রশ্নেই উঠে না এরূপ ভাবেন গান্ধী। সে সময় কোরানের অনুবাদ ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকও পড়েন। হিন্দু ধর্মপুস্তক পড়তে আরম্ভ করেন। রায়চাঁদ ভাইয়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহার রীতিমত চলে এ বিষয়ে। কিন্তু এবার ধর্মজিজ্ঞাসা আরো বাস্তবরূপ ধারণ করে। 'জিজ্ঞাসু মণ্ডল' নামে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। পাতঞ্জল দর্শন (যোগশাস্ত্র) ও তার উপরে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ এবং গভীরভাবে গীতা পড়তে আরম্ভ করেন। প্রতিদিন দুই তিন শ্লোক করে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত মুখস্থ করেন। এই সময় হতে গীতা হল তাঁর জীবন নিয়ামক। অপরিগ্রহ, সমভাব প্রভৃতি ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়মূল হল। 'অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহযমাঃ' পাতঞ্জলদর্শনের এই সূত্র পড়েছেন তখন। তার প্রভাব পড়ল জীবনে। কি করে সমভাব আসতে পারে তাও ভাবলেন। জিজ্ঞাসু মনের কাছে উত্তর এল বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য। বিষয়সম্পত্তির মালিক নিজেকে মনে না করে জনকল্যাণের জন্য অছিস্বরূপ মনে করা উচিত। মনে উঠল প্রথম ন্যাসবাদের ধারণা। এই ধারণা হওয়ার পর দাদা লক্ষ্মীদাসকে লিখে পাঠালেন ভবিষ্যতে আর তাঁর কাছে টাকা পাঠাতে পারবেন না। যা বাঁচাতে পারেন তা জনকল্যাণে ব্যয় হবে। এই দাদা ছিলেন তাঁর পিতৃতুল্য। তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এতে। পরিবার প্রতিপালনের কর্তব্য হতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয় জানালেন। মোহনদাস লিখলেন, তিনি পরিবারের পরিধি একটু বড় করে দেখছেন এই মাত্র। দাদা অনেকদিন পর্যন্ত কোন সম্পর্ক রাখলেন না তাঁর সঙ্গে। মানুষের জীবনে অনেক সময় এরূপ কর্তব্যের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তখন কর্তব্য কি তা স্থির করবার মালিক হয় অন্তরের প্রেরণা। সেই অন্তরের প্রেরণাই মানুষের নিয়ামক। মোহনদাস গান্ধীর বেলায়ও হয়েছিল তা-ই। দাদা পরে অবশ্য তাঁর ভুল বুঝতে পেরে মৃত্যুশয্যা হতে মোহনদাসের কার্য সমর্থন করে পত্র দেন।

এই সময় গান্ধী এ কথাও উপলব্ধি করলেন যে, ব্রহ্মচর্য পালন ব্যতীত সমস্ত অন্তর দিয়ে সেবাকার্যও সম্ভবপর নয়—আত্মোপলব্ধি ত দূরের কথা। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততার ভাব তাঁর বরাবরই ছিল। কিন্তু যাতে বেশী সন্তান না জন্মে প্রথম সে চিন্তা আসে তাঁর মনে। বিলাতে থাকা কালীন গর্ভনিরোধ সম্বন্ধে পুস্তকও পড়েন। সে পথের চেয়ে আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। তার জন্য উপবাস, খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন, শুধু ফলাহারী হয়ে থাকা, সবই ভাল। উপলব্ধি করেন কামচিন্তা পর্যন্ত মনে না আসা সহজ নয়। দীর্ঘদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ভারতে আসার পর এই জ্ঞান লাভ হয় যে, ভগবানের অনুগ্রহেই তা সম্ভবপর। কস্তুরবার সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯০৬ সালে ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেন।

এক বৎসর শেষ হওয়ার পর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আসেন জোহানিসবার্গে। তাঁর বাড়ীতে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর একজন কেরানীও থাকত। বাড়ীটা ছিল ইংরেজী কায়দার। এই কেরানীর রাতের প্রস্রাবের পাত্র পরিষ্কার করতে হত কস্তুরবাকে। কস্তুরবা তা নিতান্ত অপছন্দ করতেন। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত গান্ধী হাত ধরে কস্তুরবাকে বাড়ীর বের করে দেওয়ার জন্য দরজার সামনে নিয়ে আসেন। কস্তুরবা তিরস্কার করে উঠলেন "তোমার লজ্জা করে না! এখানে কি আমার বাপ মা আছেন! আমি কোথায় যাব এ বিদেশে! আর লোক দেখলেই বা কি বলবে?" মোহনদাস লজ্জিত হলেন। স্ত্রী পতিদেবতার কথা সব সময় সানন্দচিত্তে পালন করবে এই হল ভারতবর্ষে স্বামীদের জন্মগত সংস্কার। তার থেকে তখনও গান্ধী মুক্ত হননি। ব্যক্তিগত আচরণেও অহিংসা পুরাপুরি রূপগ্রহণ করেনি। বিশিষ্ট লোকেরা, বিশেষ করে যাঁরা একটা আদর্শ স্থাপন করতে চান, তাঁদের স্ত্রী, পুত্র বা আত্মীয় হওয়ার অসুবিধাও আছে ঢের, যেমন সুবিধাও আছে। কস্তুরবাকে দুই-ই ভোগ করতে হয়েছে। স্বামীর অনেক মত তিনি

সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছেন, অনেক জিনিস পারেননি। সেটা ত স্বাভাবিক। ১৯০৬ সালের পূর্বেই মোহনদাস ও কস্তুরবার চার ছেলে জন্মগ্রহণ করে—হরিলাল, মণিলাল, রামদাস ও দেবদাস। প্রথম দুইজন জন্মে ভারতে আর শেষ দুইজন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

১৯০৪ সালে শ্রীমদনজিতের পরামর্শে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামক একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করা স্থির করেন। এর প্রথম সম্পাদক হন শ্রীমনসুখলাল নাজর। ১৮৯৬ সালে গান্ধী যখন ছয় মাসের জন্য ভারতে আসেন তখন ইনি বেশ যোগ্য ভাবেই নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে কাজ করেন। যদিও সম্পাদক ছিলেন ইনি, কাগজের প্রধান পরিচালক ছিলেন গান্ধী। প্রত্যেক সংখ্যায়ই তিনি লিখতেন এবং কাগজের লোকসানও বহন করতেন। কাগজ প্রথম বেরোয় চার ভাষায়—ইংরেজী, গুজরাটী, তামিল ও তেলেগু। কিছুদিন পরে তামিল ও তেলেগু সংস্করণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই কাগজের জন্য গান্ধীকে বেশ খরচ করতে হত। কখনো কখনো মাসে ৭৫ পাউণ্ড পর্যন্ত পাঠাতেন। কিন্তু এত খরচ করাও সার্থক হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অভাব অভিযোগের সুস্পষ্ট ধারণা এই কাগজের মারফতে পাওয়া যেত। সত্যাগ্রহ পরিচালনার ব্যাপারে এই কাগজের দান অপরিসীম। গান্ধী ভারতে চলে আসার পরও এ কাগজ চলে। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মণিলাল এক সময় এর সম্পাদক ছিলেন। রেভারেণ্ড মিঃ ডোকও একবার সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।

এই সময় জোহানিসবার্গের নিকটে ভারতীয়দের থাকবার স্থানে প্লেগ আরম্ভ হয়। শাসকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় অর্থ কুলী। তাদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল, তার বাইরে অন্য জায়গায় থাকা নিষিদ্ধ। যদিও মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত তথাপি এ স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার সুব্যবস্থা ছিল না। তাই আরম্ভ হল প্লেগ। গান্ধী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেবাকার্যে। তখনকার

দিনে প্লেগ রোগীর সেবা বেশ বিপজ্জনক ছিল। কড়া চিঠি লিখলেন কাগজে মিউনিসিপ্যালিটীর অব্যবস্থা সম্বন্ধে।

গান্ধী এক নিরামিষ ভোজনালয়ে খেতে যেতেন। সেখানে মিঃ এলবার্ট ওয়েস্ট নামক এক ইংরেজের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। ওয়েস্ট তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হন।

দুইদিন তাঁকে যথাসময়ে না দেখে মিঃ ওয়েস্ট সকাল সকাল তাঁর বাড়ী চলে যান এবং কেমন আছেন তা খোঁজ করেন। প্লেগের সেবা-কার্য করতে প্রস্তুত জানান। কিন্তু শ্রীমদনজিৎ সে কাজে এসেছেন। অতএব ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন চালাবার জন্য লোকের প্রয়োজন। তাই সে কাজের ভার নিয়ে যেতে বললেন ডারবান। একদিন পরেই রাজী হয়ে চলে যান ডারবান।

এই সময় ক্রিটিক বা সমালোচক কাগজের সহকারী সম্পাদক মিঃ পোলক গান্ধীর প্লেগ সম্বন্ধে লেখা পড়ে নিরামিষ ভোজনালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এর মাস খানেক পরে মিঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজের অব্যবস্থার কথা গান্ধীকে লেখেন। গান্ধী চিঠি পেয়ে ডারবান রওনা হন। মিঃ পোলক স্টেশনে এসে পড়বার জন্য তাঁকে রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' নামক পুস্তকখানা দেন। পড়তে আরম্ভ করে শেষ না করে থাকতে পারেন না। একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। সারা রাত ঘুমাতে পারেন না, কেবল পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং পুস্তকে বর্ণিত আদর্শ অনুযায়ী নিজ জীবনের পরিবর্তন করার সংকল্প করেন। এই পুস্তককে 'সর্বোদয়' নাম দিয়ে গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় মুখ্যতঃ তিনটি ঃ—

(১) সকলের কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ।

(২) উকিলের কাজ আর নাপিতের কাজ উভয়েরই সমমূল্য।

(৩) শ্রমের জীবন, যথা ভূমিকর্ষক ও কারিগরের জীবনই শ্রেষ্ঠ।

গান্ধীর মতে রাস্কিন কবি বা মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি তাঁদেরই একজন

যাঁরা মানুষের হৃদয়কোরক প্রস্ফুটিত করে থাকেন। এই একখানা বই এনে দিল গান্ধীর জীবনে বিপুল পরিবর্তন। কিন্তু সেখানা তাঁর হাতে এসেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে বা দৈবক্রমে। ডারবানে পৌঁছে মিঃ ওয়েস্টের সঙ্গে এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তা তাঁর মনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নকে এক খামার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। সেখানে সবাই শরীর শ্রম করবে। সমান পারিশ্রমিক বা বেতন পাবে এবং অবসর সময়ে প্রেসের কাজ করবে। বর্ণ বা জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য মাসিক মাত্র তিন পাউণ্ড পারিশ্রমিক স্থির হল। মিঃ ওয়েস্ট এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। তারপর কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা। শ্রীমদনজিৎ এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তিনি এই প্রস্তাবকে 'নির্বুদ্ধিতা' আখ্যা দেন এবং বলেন ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন চালান অসম্ভব হবে, আর তাঁর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হবে। ছগনলাল গান্ধী ও মেসিনচালক গোবিন্দ-স্বামী এই প্রস্তাবে সম্মত হন। পার্শী বন্ধু রুস্তমজীও প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা স্থির হয়।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাত দিনের মধ্যেই ডারবান হতে চোদ্দ মাইল এবং ফিনিক্স হতে আড়াই মাইল দূরে ১০০ একরের খামার বাড়ী খরিদ করলেন এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে। ঝটপট সমস্ত কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন ফিনিক্সে স্থানান্তরিত হল। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও শুধু একটি সংখ্যা বাদে কাগজের সমস্ত সংখ্যাই এই আশ্রমে ছাপা হয়। খুবই আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার পরিচায়ক। ভারতবর্ষ হতে গান্ধীর যে সমস্ত আত্মীয় ও বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন রুজী রোজগারের জন্য, তাঁদের কাউকে কাউকে এ শুভ প্রচেষ্টায় পাওয়ার চেষ্টা করেন। যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে মগনলাল গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মগনলালজী মৃত্যু পর্যন্ত মহাত্মা

গান্ধীর সহকর্মী ছিলেন। শুধু তাই নয়, মহাত্মাজীর অনেক কাজকে রূপ দেওয়ার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন তিনি। এরূপ নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, কুশলী এবং স্বল্পভাষী কর্মী আমি খুব কম দেখেছি। বিশিষ্ট লোকদের এরূপ সঙ্গী জুটিয়ে দেন বিধাতা। তবেই তাঁদের চিন্তাধারা বাস্তবরূপ গ্রহণ করতে পারে জনসমাজে।

জোহানিসবার্গে ফিরে এসে মিঃ পোলককে সব কথা বলেন। মিঃ পোলক ত শুনে খুবই খুশী। যদি তাঁকে নিতে আপত্তি না থাকে তবে তিনি এই শুভ প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গান্ধী সানন্দে অনুমতি দিলেন। পোলক হলেন তাঁর সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ। পোলকের বিয়েতেও তিনি উপস্থিত থাকেন 'উত্তম মানুষ' হিসাবে। সাদার বিয়েতে কাল উত্তম মানুষ। গান্ধী থাকতে পোলক কোন সাদাকে সে আসন দেওয়ার কথা চিন্তাও করেননি। জন্মের হিসাবে পোলক ইহুদী আর শ্রীমতী পোলক খৃষ্টান। পোলক ও শ্রীমতী পোলক গান্ধী পরিবারভুক্ত হন। কিন্তু ভারতে যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন এঁরা সায় দেননি।

১৯২১ সালে মহাত্মাজী আমাকে বলেছিলেন "শরীর শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন ও তারপর জনসেবা এই দুইয়ের মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি তোমাকে বলতে লজ্জিত নই যে আমি তাতে ব্যর্থ হয়েছি—শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছি। আমার মনে হয় শরীর শ্রমের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন ও সৎজীবন যাপনই মস্ত বড় জনসেবা বা দেশসেবা। তাতে সেবার অহংকার নেই—আছে সত্যিকারের জনকল্যাণ। আজ শ্রমজীবীর চেয়ে বুদ্ধিজীবী উচ্চস্তরের এই ধারণা সমাজকে ক্রমে নীচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজ পঙ্গু হচ্ছে।

গান্ধী নিজে তখনো ফিনিক্স আশ্রমে যাননি, জোহানিসবার্গেই ছিলেন। সেখানকার বাড়ীতে নিজেরা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, সাফাইয়ের কাজ প্রভৃতি শুরু করেন। স্ত্রী, ছেলে, পোলক সবাই ভাগ নিত তাতে।

বুয়ার যুদ্ধের পর সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু তখনো চারটি রাষ্ট্র পৃথক্ ছিল। পরে তা একত্র হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন রূপে পরিণত হয়।

১৯০৬ সাল। এই সময় নাটালে জুলুবিদ্রোহ হয়েছে বলে খবরের কাগজে প্রচারিত হল। জুলুরা নাটালের অধিবাসী। তাদের কাছ থেকে সুবিধাজনক সর্তে জমি পেয়ে ইংরেজরা সেখানে বসতি আরম্ভ করে। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে জুলুরাই সবচেয়ে সুন্দর। সুগঠিত লম্বা চেহারা, গোল ও উজ্জ্বল চোখ। কাল চকচকে রং।

ইংরেজরা জুলুদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্য এক নূতন ট্যাক্স ধার্য করে। এক জুলুসর্দার এই কর না দেওয়ার উপদেশ দেয় এবং কর আদায়কারী সার্জেণ্টকে তীর বা বল্লম নিক্ষেপ করে। বাস্, আর যায় কোথায়। প্রচার হল জুলু বিদ্রোহ। এবং আরম্ভ হল নির্মম ভাবে তাদের দাবিয়ে রাখার কাজ। বেপরোয়া বেত মারা, গুলি চালানো। একে বিদ্রোহ বলা ভুল। এখন হতে চলল সবটাই একতরফা অত্যাচার। এখনও গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুরক্ত। তাই এবারও য়্যাম্বুলেন্স কোর বা সেনাদল গঠনের প্রস্তাব করে পাঠালেন নাটাল সরকারে। সে প্রস্তাব তাড়াতাড়িই গৃহীত হল। জোহানিসবার্গের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কস্তুরবা ও ছেলেদের পাঠানো স্থির করলেন ফিনিক্সে। কস্তুরবা এ ব্যাপারে খুশী মনে রাজী হলেন। অফিসঘর রেখে দিলেন কারণ এই সেবাকার্যে বেশী সময় না লাগবারই সম্ভাবনা। গান্ধী হলেন সেবাদলের সার্জেণ্ট মেজর। এ দল শুধু বহু মাইল হেঁটে আহতদের (জুলুদের) নিয়ে আসত না। হাসপাতালেও তাদের সেবা করতে হত। কারণ শ্বেতাঙ্গ নার্স কোন জুলুকে সেবা করতে রাজী নয়। জুলুরা এদের সেবা পেয়ে কৃতজ্ঞ। জুলুদের প্রতি অত্যাচারে গান্ধী ব্যথিত হন এবং তাদের সেবা করতে পেরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। সেবাদল সরকারের প্রশংসা পায়। এক মাসের মধ্যেই কাজ শেষ।

জুলুদের সায়েস্তা করার পর এবার এল ভারতীয়দের পালা। তার কারণ জেনারেল স্মাটস ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মনে করতেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা দুইয়ের সহ-অবস্থান অসম্ভব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর। কাজটা আরম্ভ হল ট্রান্সভালে। নূতন কোন ভারতীয় যেন সেখানে প্রবেশ করতে না পারে, আর পূর্বে যারা আছে তারাও যেন উত্যক্ত হয়ে চলে যায় সেই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের ২২শে আগস্ট একটি অর্ডিনান্স জারি হল। তার বিধানগুলি প্রধানতঃ এই—প্রত্যেক ভারতবাসী মেয়ে ও পুরুষ, আট ও তদূর্ধ্ব বয়সের শিশুদের ঠিকানা, বয়স, জাতি প্রভৃতি উল্লেখ করে নাম রেজিস্ট্রী করতে হবে। পুরাতন অনুমতিপত্র ফেরত দিতে হবে। বৃদ্ধাঙ্গুলের ও অন্য আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম রেজিস্ট্রী করার দরখাস্ত না করলে ট্রান্সভালে বাসের অধিকার হতে বঞ্চিত হতে হবে। দরখাস্ত না করা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। জেল, জরিমানা, নির্বাসন সবই হতে পারে। নাম রেজিস্ট্রী হলে সে সার্টিফিকেট সব সময়েই সঙ্গে রাখতে হবে। পুলিশ কর্মচারীরা বাড়ীতে ঢুকেও সার্টিফিকেট দেখতে চাইতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্ডিনান্স জারী হওয়ার পরের দিনই নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের ছোট এক সভা করে গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এ হচ্ছে ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা হতে তাড়াবার প্রথম পদক্ষেপ। এর প্রতিবাদ না করলে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। সকলেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি সাধারণ সভা করা স্থির করলেন। ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতির সভাপতিত্বে ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সালে সভা হয়। সভার কাজ ইংরেজীতে পরিচালিত হয়নি, হয়েছিল মুখ্যতঃ গুজরাটী ও হিন্দী ভাষায়। তামিল, তেলেগু ভাষায় বক্তৃতাও হয়েছিল ওই ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য। সেই সভায় অর্ডিনান্সের বিধান মান্য করা হবে না এই প্রস্তাব গৃহীত

হয়। এই অমান্যকে কি আখ্যা দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তা হয়। এ পর্যন্ত ইংরেজী কথা 'প্যাসিভ রেজিস্টেন্স' বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নামেই চলে আসছিল। তা দুর্বলের অস্ত্র। তাই গান্ধী অন্য নামের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজে একটি নাম আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হল। শ্রীমগনলাল গান্ধী 'সদাগ্রহ' নাম প্রস্তাব করে পুরস্কার পেলেন। মোহনদাস গান্ধী নিজে 'সদাগ্রহ'কে 'সত্যাগ্রহ' নামে রূপান্তরিত করেন। আজও সেই নামই চালু। ইহা আত্মিক শক্তি প্রসূত। এ নীতির প্রথম আবিষ্কারক আমেরিকার ডেভিড থোরো। গান্ধীর জন্মের পূর্বেই তাঁর হৃদয়ে এই নীতি উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নীতি অবলম্বন করার পূর্বে গান্ধী থোরোর লেখা পড়েননি। পরে অবশ্য পড়েন ও মুগ্ধ হন। তাঁকে এই নীতির স্বাধীন আবিষ্কারক ও প্রথম ব্যাপকভাবে রূপদানকারী বলা যেতে পারে।

একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন ও অপরদিকে বৃটেনে ডেপুটেশন পাঠানো ঠিক হয়। গান্ধী ও মিঃ আলী বিলাতে যান ডেপুটেশনে, এবং ছয় সপ্তাহ থাকেন। সেখানে সরকারী, বেসরকারী, ভারতীয় ও ইংরেজ বহু লোকের সঙ্গে দেখা করেন। বহু ভারতীয় ও ইংরেজ তাঁদের সাহায্য করেন যাতে ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যায় বিচার পেতে পারে। তথাপি ডেপুটেশনের ফল বিশেষ কিছু হল না। যা হল তা আধুনিক রাজনীতি নামক ধূর্ততার জয়। সেক্রেটারী অব স্টেট বর্ণবিদ্বেষ মূলক আইনে সম্মতি দিতে রাজী হননি, কিন্তু পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিলেন ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় দায়িত্বপূর্ণ সরকার হবে, তখন তারা যদি কোন বিল পাশ করে তাতে রাজার সম্মতি দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। হলও তাই। এরই নাম নৈতিকতা বর্জিত রাজনীতি। ভারতীয়রা এই আইনকে 'কালা কানুন' বলে অভিহিত করে। এবং দৃঢ় সংকল্প করে এর প্রতিরোধ করতে। যাতে নূতন আইন অনুযায়ী কেউ নাম

রেজিস্ট্রী করতে না যায় তজ্জন্য পিকেটিং আরম্ভ হয়। সরকার নানা প্রকারে দুর্বলদের উপর চাপ দিয়ে তাদের নাম রেজিস্ট্রীভুক্ত করাতে চেষ্টা করে। এ সব সত্ত্বেও ট্রান্সভালের তের হাজার ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র পাঁচ শত লোক নাম রেজিস্ট্রী করে। সরকার তারপর গ্রেপ্তার করে জেল দিতে আরম্ভ করে। ভারতীয়দের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। গান্ধী ও আরো বহু লোক গ্রেপ্তার হলেন। তিনি আইনভঙ্গ করেছেন এ কথা স্বীকার করলেন এবং তাঁকে সবার চেয়ে বেশী সাজা দেওয়ার জন্য কোর্টকে অনুরোধ করলেন। সে অনুরোধ অবশ্য রক্ষা হয়নি। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর সাজা হল দুমাস জেল। এই তাঁর প্রথম কারাবরণ। তিনি ছিলেন জোহানিসবার্গ জেলে। তাঁর সাজার পর আরো জোর সহকারে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হল। সকল শ্রেণীর ভারতীয় যোগ দিল আন্দোলনে। এক জোহানিসবার্গ জেলেই প্রায় ১৫০ জন সত্যাগ্রহী এল। ট্রান্সভাল সরকার এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয়রা যে এতটা সাহস ও সঙ্ঘবদ্ধতা দেখাতে পারবে তা সরকার ভাবেনি। পনের দিন যেতে না যেতেই সরকারের তরফ হতে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা হয় ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এক ইংরেজ খবরের কাগজের সম্পাদক মারফত। জেল হতে গান্ধীকে নিয়ে গিয়ে জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হয়। একটা আপস-রফা হয়। স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রী করলে আইন তুলে নেওয়া হবে। রেজিস্ট্রী করার সার্টিফিকেটে কি কি সর্ত থাকবে তা ভারতায়দের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হবে—ইত্যাদি। গান্ধী কালা আইন তুলে নেওয়ার সর্তটি পরিষ্কার করে নিলেন। গান্ধী রাজী হয়ে ত এলেন। সত্যাগ্রহীদেরও সরকার ছেড়ে দিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের কাছ থেকে আপসের বিরোধিতা হল তীব্র রকমের। পাঠানদের প্রধান আপত্তির কারণ ছিল দশ আঙুলে ছাপ দেওয়া এতদিন পাপ আখ্যা দিয়ে এখন কি ভাবে তা করা যেতে পারে! বাস্তবিকই সাধারণ লোক যারা সূক্ষ্ম বিচারে অভ্যস্ত নয়

এবং সোজাসুজি পাপ পুণ্যের বিচার করে তাদের কাছে কোন জিনিস পাপ আখ্যা দিয়ে এমনকি পরিবর্তিত অবস্থায়ও তা করতে বলা দূরদর্শিতার পরিচয় নয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে পাপ শব্দ যত কম ব্যবহার হয় ততই ভাল। পাঠানরা যদি দশ আঙ্গুলের ছাপ দিতে না চায়, শুধু বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ দিলেই চলবে। কিন্তু গান্ধী দশ আঙ্গুলের ছাপ দিবেন তাতেও নারাজ। পাঠানদের কারো কারো ধারণা হয়েছিল যে গান্ধী জেনারেল স্মাটসের নিকট হতে পনের হাজার পাউণ্ড নিয়ে এই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। বুদ্ধিমানরা আপত্তি তুলল এই বলে যে কালা কানুন তুলে নেওয়ার পর রেজিস্ট্রী করা উচিত। যদি শেষে আইন রদ না হয়, পুনরায় সত্যাগ্রহ শুরু করা তত সহজ হবে না। অধিকাংশ আপস-রফা সমর্থন করে।

তদনুসারে গান্ধী যখন সার্টিফিকেট নিতে যাচ্ছিলেন, মীর আলম নামক এক পাঠান প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁর মাথায় লাঠির আঘাত করে। 'হে রাম' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। মীর আলম ও তার সাথীরা তারপর আরো মারধর করে। ইউরোপীয়রা মীর আলমকে ধরে ফেলে। পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে। অজ্ঞান অবস্থায় গান্ধীকে মিঃ গিবসন নামক এক ইংরেজের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞান ফিরে এলে রেভারেণ্ড ডোক তাঁকে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বলেন "ভালই আছি, পাঁজরার হাড়ে ও দাঁতে ব্যথা। মীর আলম কোথায়?" অন্য সকলের সাথে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুনে তৎক্ষণাৎ বলেন তাদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। সরকার তাদের প্রথম ছেড়ে দেয়, কিন্তু ইউরোপীয়দের আপত্তিতে পুনরায় গ্রেপ্তার করে এবং তাদের সাক্ষ্যদানের ফলে জেল হয়।

গান্ধীকে রেভাঃ ডোক তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে শ্রীমতী ডোকের সেবা যত্নে ও ডাক্তারের চিকিৎসায় দশ দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠেন। যখন কথা বলা নিষেধ সেই সময় লিখে বিবৃতি দেন এই মর্মে যে, মীর আলম ও তার সহকর্মীরা ভুল বিশ্বাসের

বশবর্তী হয়ে এ কাজ করেছে, তাদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। আর অধিকাংশ ভারতীয়ই যেন দশ আঙ্গুলের ছাপ দেয়, শুধু যারা এটাকে বিবেকবিরোধী মনে করবে তাদের সরকার অব্যাহতি দিবে। যখন আঘাতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন তিনি নিজে সেই সময় সকলের আগে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে নাম রেজিস্ট্রী করেন। সে সময়কার অবস্থা দেখে এমনকি গান্ধীবিরোধী ইংরেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসারের চোখে জল এল। এইখানেই গান্ধী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

রেভাঃ ডোক একজন ধর্মপরায়ণ ইংরেজ খৃষ্টান। তিনি বর্ণ-বিদ্বেষের বিরোধী, কারণ তা যীশুখৃষ্টের উপদেশের বিরোধী। তিনি মনে করতেন ভারতীয়দের দাবী ন্যায্য। তদুপরি যেরূপ অহিংস বা প্রেমময় নীতিতে ভারতীয়রা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে তাও খৃষ্টধর্মের যথাযথ পালন। তাই তিনি গান্ধীকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। দুইজনের মধ্যে হয় অন্তরের বন্ধুত্ব। ডোকই প্রথম গান্ধীর জীবনী লেখেন। সে জীবনী প্রামাণ্য। তার একখানা গান্ধী নিজে টলস্টয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে তা পড়বার সৌভাগ্য হয়। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে থাকতেই ডোক মারা যান। এরূপ ধর্মপ্রাণ লোকেরাই খৃষ্টধর্মকে মহীয়ান্ করে রেখেছেন।

কেউ কেউ যা সন্দেহ করেছিল তাই ঘটল। জেনারেল স্মাটস্ কথা রাখলেন না। নাম রেজিস্ট্রী করার পরও কালা কানুন তুলে নেওয়া হল না। বরং আরো খারাপ আইন পাশ হল। তখন গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয়রা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একদিনে দুই হাজার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পোড়ালেন। তখন মীর আলম বুঝতে পারল নিজের ভুল। টাকা নিয়ে আপোষ করলে এভাবে সার্টিফিকেট পোড়াতেন না। তাই স্বীকার করল গান্ধীকে মেরে অন্যায় করেছে। গান্ধীও তার সঙ্গে করমর্দন করে তার প্রতি কোন বিদ্বেষভাব নাই এ কথা জানিয়ে দেন। যে ইংরেজ ভদ্রলোক মধ্যস্থ হয়ে আপোষ করেছিলেন তিনিও

জেনারেল স্মাটসের আচরণে দুঃখিত হন। অনেক ইংরেজী খবরের কাগজ ভারতীয়দের সার্টিফিকেট পোড়ানো খুব সাহসিক কার্য বলে প্রশংসা করল। তারপর চলল সত্যাগ্রহ। সরকারও সত্যাগ্রহীদের দমনে দৃঢ়সংকল্প। জেল, জরিমানা, নানারূপ নির্যাতন, জাহাজে করে ভারতে ফেরত পাঠানো পর্যন্ত হল। ফলে দু দিকই বিব্রত। ভারতীয়দের মধ্যে যারা দুর্বল তারা সরে পড়ল। অনেকে ট্রান্সভাল ত্যাগ করল। অন্যদিকে সরকারও উপলব্ধি করল নির্যাতন করে সত্যাগ্রহীদের দমানো যাবে না। আর ভারতে ফেরত পাঠানোর প্রতিক্রিয়াও ভাল হল না।

১৯০৯ সাল। বুয়ার ও ইংরেজ নেতারা চান সমস্ত দক্ষিণ অফ্রিকা একত্র করতে। কিন্তু দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ। তাই তাঁরা যান বিলাতে ডেপুটেশনে। ভারতীয়রাও তাদের কথা বলবার জন্য গান্ধী ও হাজি হাবিব এই দুইজনের এক ডেপুটেশন পাঠায়। ১৯০৯ সালের ২৩শে জুন এঁরা রওনা হন জাহাজে। প্রায় চার মাস থাকেন বিলাতে। ডেপুটেশনে ফল লাভ হয় না। লর্ড য়্যাম্পথিল চেষ্টা করেন সাধ্যমত। বুয়ার নেতা জেনারেল বোথা তাঁর মারফতে খবর পাঠান যে বর্ণবৈষম্যমূলক বা এসিয়াটিক আইন পরিবর্তন করা যাবে না। ছোটখাট অভাব অভিযোগ দূর করা হবে। এরূপ অবস্থাতে লর্ড য়্যাম্পথিলও এ প্রস্তাব মেনে নিতে উপদেশ দেন। হাবিব সাহেবও রাজী হন। কিন্তু গান্ধী রাজী হন না। হাবিব সাহেবের প্রাণে ঘা লাগতে পারে এমন কোন কথা না বলেই নিজ মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। লর্ড য়্যাম্পথিলের উপদেশ গ্রহণ করতে না পারলেও তিনি যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ দেন। লর্ড য়্যাম্পথিলও তাঁর উপদেশ গ্রহণ না করে যদি ভারতীয়রা দুঃখ কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত থাকে তবে তাদের পেছনে সর্বদা থাকবেন এ কথা জানান—কারণ তাদের দাবী ন্যায্য।

নভেম্বর মাসে বিলাত হতে ফেরেন। ডেপুটেশনের ফল বিশেষ

কিছু হয় না এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু বিলাতে থাকাকালীন বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ভারতীয়দের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল। সেই সময় তাঁর কাছে অহিংস বিপ্লব দর্শন উদ্ভাসিত হয়। তা তিনি রাখেন উপরিউক্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের সামনে। পরে লিপিবদ্ধ করেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরবার পথে জাহাজে। প্রথম লেখেন গুজরাটী ভাষায়—'হিন্দ স্বরাজ' নামে ছাপা হয় পুস্তকাকারে। বোম্বে সরকার তার প্রচার নিষিদ্ধ করেন। তখন ইংরেজী অনুবাদ করে ছাপানো হয়। ইংরেজী সংস্করণ নিষিদ্ধ হয় না। এই ছোট পুস্তক গান্ধীর সমস্ত জীবনদর্শনের আলেখ্য। তাঁকে বুঝতে এবং জানতে হলে এই পুস্তক পড়া অপরিহার্য। এই পুস্তকের ১৯৩৯ সালের নূতন ইংরেজী সংস্করণে মুখবন্ধে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীমহাদেব দেশাই দুজনেই ভুল করে পুস্তক লিখবার সন দিয়েছেন ১৯০৮। পরবর্তীকালে মহাত্মাজী সে ভুল সংশোধন করেন 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' নামক পুস্তকে। তাতে হিন্দ স্বরাজ লিখবার তারিখ দিয়েছেন নভেম্বর ১৯০৯। ইহাই ঠিক। হিন্দ স্বরাজে শ্রীমদনলাল ধিঙ্রার কাজের অর্থাৎ স্যার কার্জন ওয়াইলির হত্যার উল্লেখ আছে। ওই কাজ সংঘটিত হয়েছিল ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই। অতএব ওই তারিখের পূর্বে হিন্দ স্বরাজ লিখিত হয়নি। নভেম্বর, ১৯০৯ই ঠিক তারিখ।

হিন্দ স্বরাজের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি মোটামুটি এই ঃ—(১) অস্ত্রবলে ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করেনি, মুখ্যতঃ ভারতবাসীর সাহায্যেই ইংরেজ ভারতবর্ষকে পদানত করেছে ও রেখেছে। (২) সেই সাহায্য সরিয়ে নিলেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। (৩) অহিংসার পথেই সত্যিকারের স্বরাজ লাভ সম্ভব, হিংসার পথে নয়। (৪) ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আসল গণতন্ত্রের প্রতীক নয়—উহা বন্ধ্যা। (৫) বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা ক্ষণস্থায়ী, ভারতীয় সভ্যতা শ্রেষ্ঠ। (৬) যন্ত্রদানব আধুনিক সভ্যতার প্রতীক—তা অকল্যাণকর। এমনকি রেলওয়েকেও তিনি অকল্যাণকর

বলেছেন। (৭) সত্যিকারের স্বরাজ হচ্ছে নিজ শাসন বা আত্মসংযম। (৮) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তার রাস্তা অর্থাৎ আত্মার শক্তি বা প্রেমের শক্তি। (৯) এই শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে সর্বপ্রকারে 'স্বদেশী' প্রয়োজন। এই পুস্তকের মতে একজন আদর্শ ভারতবাসী মাত্র বিশেষ অবস্থায়ই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করবেন। আইনজ্ঞ হলে আইনের ব্যবসা না করে তাঁত বুনবেন। যাবজ্জীবন আন্দামানে নির্বাসন ইউরোপীয় সভ্যতাকে উৎসাহ দেওয়া পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোখলে ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই পুস্তক পড়ে বলেছিলেন যে, এই পুস্তক এতই অপরিণত চিন্তার ফল যে গান্ধী ভারতে ফিরে গিয়ে এক বৎসর বাস করার পর নিজেই এ পুস্তক নষ্ট করে ফেলবেন। কিন্তু এই বই লেখার প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর পরে এবং ভারতে ফিরে আসার তেইশ বৎসর পরেও তিনি তাঁর মত বদলাননি, পুস্তক নষ্ট করে ফেলা ত দূরের কথা। বরং তাঁর মত এ বিষয়ে আরো দৃঢ় হয়। ১৯৩৮ সালে বা পরবর্তীকালেও তিনি মনে করতেন আধুনিক সভ্যতা অকল্যাণের। গোখলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। গোখলে ও গান্ধীর মধ্যে এখানে মৌলিক পার্থক্য, যদিও গান্ধী গোখলেকে রাজনৈতিক গুরু মনে করতেন। বরং এ বিষয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীর মতের মিল ছিল বেশী। টলস্টয়ও মনে করতেন ইংরেজ নিজ শক্তিবলে ভারতবর্ষ পদানত করেনি—ভারতবাসীর সাহায্যেই তা হয়েছে। সে সাহায্য না করলে এবং অহিংস পথে পরিচালিত হলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব এরূপও ছিল তাঁর ধারণা।

১৯০৯ সালে ১ অক্টোবর গান্ধী লণ্ডন হতে তাঁর প্রথম পত্র লেখেন টলস্টয়কে। টলস্টয় তখন মস্কো হতে ১৩০ মাইল দূরে য্যাশনিয়া পলিনিয়ায় ছিলেন। এই পত্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আন্দোলন সম্বন্ধে সমস্ত খবর দেন এবং টলস্টয়ের সহানুভূতি কামনা করেন।

এক পত্রে গান্ধী নিজেকে টলস্টয়ের অনুরক্ত অনুগামী বলেছেন। উভয়ের পত্রবিনিময় হতে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধী হিন্দ স্বরাজের ইংরেজী সংস্করণ ও রেভাঃ ডোক কৃত গান্ধী জীবনী টলস্টয়কে পাঠান। টলস্টয় সাধারণভাবে হিন্দ স্বরাজের মতামতের প্রতি সমর্থন জানান। বিস্তৃত আলোচনা শরীর সুস্থ হলে করবেন বলে লিখেছিলেন। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হয়নি। কিছুদিন পরেই (নভেম্বর ১৯১০) টলস্টয়ের মৃত্যু হয়, অবশ্য পরিণত বয়সে। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছোট নিবন্ধ বেরোয়। টলস্টয়ের প্রভাব গান্ধীর জীবনের উপর খুবই ছিল। টলস্টয়ের 'এক হিন্দুর নিকট লিখিত পত্র' গান্ধী ছাপান, তার গুজরাটী অনুবাদও ছাপান। ১৯১০ সালে সত্যাগ্রহীদের পরিবার-বর্গের জন্য যখন আশ্রম স্থাপন করেন তার নাম দেন টলস্টয় ফার্ম। এই ফার্মে সবাই শরীর শ্রম করতেন। গান্ধী নিজেও ছুতোরের কাজ, জুতা সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি শেখেন ও করেন : এ কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী জার্মান স্থপতি হারমান কালেনবাক। ফার্মের ১১০০ একর জমি কালেনবাকের। তিনি এ কাজে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। এই ফার্মে থাকাকালীন গান্ধী খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ কাজেও তাঁর বিশেষ সহায়ক ছিলেন কালেনবাক। রায়চাঁদ ভাইয়ের চিঠি হতে গান্ধীর মনে আসে দুধপান ব্রহ্মচর্য পালনের সহায়ক নয়। তারপর কাগজে একটা খবর দেখেন যে কলিকাতায় গরু ও মহিষের দুধ বেশী করে বের করার জন্য নিষ্ঠুর ফুকা প্রথা অবলম্বন করা হয়। তাই তিনি ও কালেনবাক আলোচনা করে ১৯১২ সালে দুধ খাওয়া ত্যাগ করেন। ক্রমে হন বাদাম ও ফলাহারী। ভাত, রুটী সবই বাদ। এরূপ খাদ্য খাওয়া চলে পাঁচ বৎসর।

বিলাতে দ্বিতীয় ডেপুটেশনের ফল কিছু হল না। বেশ চিন্তিত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরছেন। বিশেষ করে ভাবছেন অর্থাভাবের

কথা। ফিরে এসেই খবর পেলেন বিলাত হতে শ্রী (পরে স্যার) রতন টাটা পঁচিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীদের পরিবারবর্গকে শহরে রেখে খরচ চালানো অসম্ভব। এই পঁচিশ হাজার টাকা ত অল্পদিনেই ফুরিয়ে যাবে। আর ফিনিক্স জোহানিসবার্গ হতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। সেখানে সবাইকে নিয়ে যাওয়া ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। সত্যাগ্রহও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। জোহানিসবার্গ শহর হতে একুশ মাইল এবং নিকটবর্তী রেল স্টেশন ললী হতে এক মাইল দূরে কালেনবাকের ১১০০ একর জমির উপর এদের নিয়ে যাওয়া স্থির হল। এখানেই হল টলস্টয় ফার্মের প্রতিষ্ঠা। এই ফার্মকে আশ্রম বলা চলে। এখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ১৯১৫ সালে ভারতে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। টলস্টয় ফার্মে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। সবাই নিরামিষাশী। মুসলমান ও খৃষ্টানদের এমনকি গো মাংস খেতে দিতেও গান্ধীর মত আছে এ কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তারা স্বেচ্ছায় নিরামিষাশী হয়। যেন হিন্দুদের প্রাণে কোন আঘাত না লাগে। গান্ধী উদারতার প্রতিদান পেলেন উদারতা।

এখানে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্মমত পালন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। গান্ধী চাইতেন মুসলমান খাঁটি মুসলমান, হিন্দু খাঁটি হিন্দু, খৃষ্টান খাঁটি খৃষ্টান হয়ে উঠুক। মুসলমান ছেলেরা যাতে নমাজ পড়ে সেদিকে দৃষ্টি দিতেন। মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতাও ছিল। যখন সত্যাগ্রহীদের পরিবারভুক্ত লোকের সংখ্যা বেশ কম হয়ে যায় তখন তাদের ফিনিক্সে পাঠান হয়। সেখানেও মেলামেশার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তার অপব্যবহার হয়। তাই তিনি দুইবার উপবাস করেন, প্রথম একবার সাত দিনের জন্য এবং তার অল্প কিছুদিন পরে চোদ্দ দিনের জন্য। তিনি নিজে যদি এদের ভালভাবে জাগাতে পারতেন তা হলে এদের ভিতরে এই অপবিত্রতা আসত না, তা ভেবে এরূপ প্রায়শ্চিত্ত করেন। কিন্তু মেলামেশার

অধিকার সংকুচিত করেননি। ঠিকই করেছিলেন। যে সমাজে স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার সুযোগ খুব কম সে সমাজেও স্ত্রী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক কম নয়। মানুষের ভিতরকার ভগবানকে জাগ্রত করাই মানুষের এই চিরন্তন দুর্বলতাকে দূর করার পথ।

টলস্টয় ফার্মে মদ্যপান ও ধূমপান নিষেধ ছিল। এত বড় ফার্মে অনেক দিন লোক ছিল না বললেই চলে। তাই সেখানে সাপের সংখ্যা ছিল বেশ। বিষধর গোখরোও ছিল। সাধারণতঃ সাপ মারা নিষেধ ছিল। কিন্তু অবস্থা গতিকে একটি গোখরো সাপকে মারবার অনুমতি দিয়েছিলেন গান্ধী নিজেই। সবরমতী আশ্রমেও সাপ মারা নিষেধ ছিল। এখানেও ওইরূপ অবস্থায় একটি বিষধর সাপ মারবার অনুমতি দেন গান্ধী। অনেকে হয়ত এ সাপ না মারবার ব্যবস্থায় আঁতকে উঠবেন। তাঁদের বলতে চাই যে, টলস্টয় ফার্ম বা সবরমতী আশ্রমে সাপের কামড়ে একজনও মারা যায়নি। এমন বহু লোক আছে যারা সাপ দেখলেই লাঠি হাতে মারবার জন্য দৌড়ে যায়। একবারও ভাবে না যে, বহু সাপ আছে যারা বিষধর নয়। আর সাপেরও একটা উপকারিতা আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতেও বলতে পারি যে, মানুষ আজও সাপের চেয়ে বেশী হিংস্র ও ক্রূর। তথাপি দেখা মাত্রই নরহত্যার কথা কোন মানুষ ভাবে না। সাপের প্রতি ওরূপ ব্যবহার সংস্কারের ভুল ভিন্ন কিছু নয়।

সত্যাগ্রহ চলতে থাকে। নানারূপ নির্যাতনের ফলে সত্যাগ্রহীর সংখ্যাও কমে যায়। দীর্ঘদিন সংগ্রাম চললে এরূপ হওয়া কতকটা স্বাভাবিক। কিন্তু গান্ধীর মনোবল বিন্দুমাত্র কম হয় না। সেই সময় ১৯১২ সালে সমস্ত অবস্থা বুঝবার জন্য গোখলে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। খুব আনন্দ গান্ধীর। রাজকীয় অভ্যর্থনা দেন গোখলেকে। অভ্যর্থনায় বহু ইউরোপীয় যোগদান করেন। গোখলের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী জানান যে, সে সময় সত্যাগ্রহীর সংখ্যা উর্ধ্ব পক্ষে ৬৫ জন আর কম পক্ষে ১৬ জন। এ বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে

একদিন মহাত্মাজী আমাকে বলছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের জয় হল, যখন সত্যাগ্রহীরা সংখ্যায় মাত্র ষোল জন তারই কিছুদিন পরে। এর প্রধান কারণ অহিংসা বা আত্মিক বলের উপর দৃঢ় প্রত্যয়।

ভারতীয়দের সভায় গোখলেকে হিন্দী বা মারাঠী ভাষায় বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁর মারাঠী বক্তৃতা হিন্দীতে অনুবাদ করে দিবেন এ কথাও বলেন। গোখলে ত এই অনুবাদের কথা শুনে হেসে উঠেন এবং বলেন "আপনার হিন্দীর ব্যুৎপত্তি ত দেখছি। তারপর আপনি আবার মারাঠী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হলেন কবে?" গান্ধী প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তাঁর মারাঠী ভাষায় ব্যুৎপত্তি হিন্দীর চেয়েও কম, তথাপি জানা বিষয়ে মারাঠী বক্তৃতার অনুবাদ করতে পারবেন। "বুঝেছি আপনার কথাই চলবে।" এই বলে গোখলে মারাঠী ভাষায় বক্তৃতা দিতে রাজী হন। তখনই গান্ধীর মত ছিল যে ভারতীয়দের সভায় কোন ভারতীয়ের পক্ষে হিন্দীতে না পারলে নিজ মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেওয়া উচিত—ইংরেজীতে নয়। এই মত তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল।

গোখলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জেনারেল বোথা ও স্মাটস্ তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, কালা কানুন তুলে নেওয়া হবে এবং তিন পাউণ্ড ট্যাক্স রদ করা হবে, ইত্যাদি। তিনিও এসে সে কথা গান্ধীকে জানান এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। গান্ধী কিন্তু দক্ষিণ আফিকা সরকারের এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত হলও তাই।

পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হল। গোখলের ভ্রমণের ফলে ভারত হতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য এল। এমনকি তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সত্যাগ্রহীদের প্রতি গভীর ও জ্বলন্ত সহানুভূতির অভিব্যক্তি দিলেন।

১৯১৩ সালের মার্চ মাসে কেপটাউনের সুপ্রীম কোর্টের জজ এক রায় দিলেন যে, খৃষ্টান বিবাহ বাদে ভারতীয়দের অন্য প্রকারের বিবাহ আইনতঃ অসিদ্ধ। ফলে মেয়েদেরও সত্যাগ্রহী হিসাবে আইন ভঙ্গ করার আমন্ত্রণ দেওয়া হল। টলস্টয় ফার্মে যেসব মেয়ে ছিলেন তাঁরা যোগ দিলেন প্রথম, তারপর ফিনিক্স আশ্রম হতে কস্তুরবা গান্ধী ও আরো কয়েকজন। এবার গান্ধী সর্বস্ব পণ করে লাগলেন। ফিনিক্স আশ্রম থাকুক বা না থাকুক সে বিষয়েও হলেন বেপরোয়া। টলস্টয় ফার্মের ভগ্নীদের প্রভাবে এক অঞ্চলের শ্রমিকরা কর্মবিরতি ঘোষণা করে। সত্যাগ্রহী মেয়েদের জেল হল। ফলে খনি অঞ্চলে ব্যাপক কর্মবিরতি। তারপর প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিকদের নিয়ে গান্ধী-নেতৃত্বে আইনভঙ্গের পদযাত্রা শুরু। গান্ধী, কালেনবাক ও পোলক গ্রেপ্তার হন। বিচারে গান্ধীর নয় মাস কারাদণ্ড হয়। শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে অন্যায়ভাবে খনিতে কাজ করতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা হয়। প্রবল বিরোধিতা হয় তার। চলে প্রচণ্ড অত্যাচার, এমনকি গুলিও। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের সমালোচনা করেন। তার ফল হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবার জন্য সোজাসুজি কাজ না করে একটি কমিশন বসান। এ ব্যবস্থা সরকারের মুখরক্ষার জন্য, যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না। গান্ধী, কালেনবাক ও পোলককে জেল হতে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই কমিশন গঠন নিয়েও ভারতীয়দের আপত্তি। পুনরায় আইন ভঙ্গের জন্য যাত্রার প্রশ্নও উঠে। সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের শ্বেতাঙ্গ রেলকর্মীরা কর্মবিরতি আরম্ভ করে। গান্ধী প্রস্তাবিত যাত্রা স্থগিত করেন। এর প্রতিক্রিয়া হয় সন্তোষজনক। কমিশন খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দেয়। তিন পাউণ্ড ট্যাক্স উঠিয়ে দেওয়া, ভারতীয় বিবাহের বৈধতা মেনে নেওয়া প্রভৃতি কমিশন প্রস্তাব করে। সরকার কমিশনের প্রস্তাব মেনে নেয়।

ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে যথারীতি বিল পাশ হয় এবং ভারতীয়দের দীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৪ সালের জুন মাসে। এইখানেই গান্ধীর দীর্ঘ একুশ বৎসরের দক্ষিণ আফ্রিকা জীবনের পরিসমাপ্তি। পনের দিন ধরে চলে নানা বিদায় সভা, ভোজ ইত্যাদি। বিদায়ের দিন হয় ডারবান টাউন হলে মেয়রের সভাপতিত্বে অভিনন্দন।

আট বৎসর ব্যাপী সংগ্রামে গান্ধীর মনে কোন তিক্ততা আসেনি। সমস্ত জিনিসটাই তিনি দেখেছেন দার্শনিকের দৃষ্টিতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ। পৃথিবীর সর্বত্রই কোন না কোন আকারে তা বর্তমান এবং কম ও বেশী তার অভিব্যক্তি। ইহুদীরা নিজেদের ভগবানের বিশেষ পছন্দসই লোক বলে মনে করত। অন্যদের মনে করত নীচুস্তরের। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের উপর এসেছে প্রায় সব জায়গার লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞা। আমেরিকায় রয়েছে নিগ্রোদের উপর বৈষম্যমূলক অন্যায় আচরণ। ভারতবর্ষে ধর্মের নামে একদল লোককে বংশপরম্পরাক্রমে নিকৃষ্টস্তরের বলে ঘোষণা। এ সবই হিংসার নগ্ন অভিব্যক্তি। এইভাবে ভেবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের আচরণে বিশেষ তিক্ততা বোধ করেননি। সে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন। কোন বিদ্বেষভাব কারো উপর ছিল না বলেই বহু ইউরোপীয় সমর্থক ও বন্ধু পেয়েছিলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী-জীবনের শুধু ভিত্ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সুরম্য হর্ম্য গড়ে উঠে। এখানেই তিনি উপলব্ধি করেন অহিংসা ও সত্যের প্রগাঢ় শক্তি, শরীর শ্রমের মর্যাদা, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, মাতৃভাষা এবং একটি ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার কথা। অহিংস আইন অমান্যের ব্যাপক প্রয়োগ হয় সর্বপ্রথম এখানেই। তখনো তাঁর মনে চরখার শক্তির রূপ উদ্ভাসিত হয়নি—তা হয় ভারতে আসার পর। ওখানে তাঁত বুনবার উপর জোর দিয়েছেন। অহিংসাভিত্তিক গঠনমূলক

কার্যক্রমও অনেক পরিমাণে রূপ গ্রহণ করে এখানে। তাঁর জীবনদর্শন রূপ পায় হিন্দ্ স্বরাজ নামক পুস্তকে। চল্লিশ বৎসর বয়সে তা লেখেন। পৃথিবীতে সাধারণতঃ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই প্রতিভার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রতিভাত হয়। গান্ধী সে নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবশ্য পৃথিবীতে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতে প্রত্যাবর্তন ও অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত

দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ সংগ্রামের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে ৩০শে জুন, ১৯১৪। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে গোখলের নির্দেশে জুলাই মাসেই গান্ধী লণ্ডন রওনা হন। গোখলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বরাবরই নিরবচ্ছিন্ন ছিল। সত্যাগ্রহের শেষ পর্যায়ে যখন মিঃ ওয়েস্ট গ্রেপ্তার হন, গোখলের অনুরোধে মিঃ এণ্ড্রুজ তাঁর বন্ধু মিঃ পিয়ার্সন সহ ভারত হতে দক্ষিণ আফ্রিকা যান। এণ্ড্রুজের সঙ্গে গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা হয়। এণ্ড্রুজ গান্ধীকে মোহন বলে সম্বোধন করতেন আর গান্ধীও তাঁকে চার্লি বলে ডাকতেন। গান্ধীকে মোহন বলে আর কোন সহকর্মী ডাকতেন বলে জানি না।

লণ্ডনে পোঁছান ৬ই আগস্ট। সঙ্গে কস্তুরবা ও কালেনবাক। তার দুই দিন পূর্বে ইউরোপে রণদামামা বেজে উঠেছে। বৃটেন যুদ্ধে জড়িত। এবারও গান্ধী যুদ্ধের সময় বৃটেনকে সাহায্য করা স্থির করেন। যুদ্ধে আহতদের শুশ্রূষাকারী সেবাদল গঠনের প্রস্তাবে সরকারী সম্মতি পাওয়া যায়। গান্ধীর আবেদনে বৃটেনে অবস্থিত আশি জন ভারতীয় সাড়া দেয়। গান্ধীসহ সবাইকে ছয় সপ্তাহ ব্যাপী শুশ্রূষা কার্য শিক্ষা লাভ করতে হয়। তারপর সৈন্য বিভাগের এক অফিসারের অধীনে যখন ড্রিল ইত্যাদি শিক্ষা আরম্ভ হয় তখন শুরু হয় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। ফলে হয় ছোটখাট রকমের সত্যাগ্রহ। কিন্তু আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া মিঃ রবার্টসের বুদ্ধিমত্তা ও ভালো মনোভাবের ফলে ব্যাপার বেশী দূর গড়ায় না। একটা সন্তোষজনক রাস্তা বেরোয়।

গান্ধীর যুদ্ধে এই সাহায্যের খবর যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় পেঁাছে তখন মিঃ পোলক খুবই বিচলিত হন এবং এই কার্য অহিংস নীতির বিরোধী এ কথা তার করে গান্ধীকে জানান। গান্ধী অবশ্য নিজ

মতে দৃঢ় থাকেন। বেঁচে থাকতে হলে কিছু না কিছু হিংসা অনিবার্য। কাজেই ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এটুকু হিংসা করা কখনো কখনো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পোলক এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেননি।

এই সময় গান্ধী প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হন। তিনি তখন বাদাম ও ফলাহারী। ভাত, রুটি ও দুধ খান না। ডাক্তার দুধ খাওয়ার কথা বলেন। এমনকি গোখলেও সে অনুরোধ করেন। কিন্তু গান্ধী তাতে সম্মত হন না। অবশেষে শীতের প্রকোপ বেশী হওয়ার পূর্বে বৃটেন ত্যাগ করে ভারতে আসাই যুক্তিযুক্ত এই উপদেশ মেনে কস্তুরবাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে চলে আসেন। কালেনবাক জার্মান বলে আসবার অনুমতি পান না।

৯ই জানুয়ারী, ১৯১৫ বোম্বেতে নামেন। দেশের মাটিতে নেমে কি আনন্দ! বহু বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। তার সুখ দুঃখের ভাগীও হয়েছিলেন পুরাপুরি। কিন্তু সেখানে ছিলেন কর্তব্যবুদ্ধিতে। তাই আত্মজীবনীতে বহু বৎসরের নির্বাসনের পর দেশে ফিরে আনন্দের কথা লিখেছেন। এই জন্মভূমির প্রতি মানুষের সহজাত নাড়ীর টান। যদি সে প্রেম অন্য কোন দেশের বা ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে উদ্বুদ্ধ না করে তবেই তা হয় প্রেম, নতুবা হয় মোহ। গান্ধীর সে প্রেমই ছিল, মোহ ছিল না। ১৯২১ সালে জানুয়ারী মাসে আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়মাবলীর মুসাবিদায় মূলনীতি ছিল "দেশসেবার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি।" গান্ধী তা দেখে দেশসেবার সঙ্গে একটি মন্তব্য জুড়ে দেন: "দেশসেবা মানে সত্য ও ভগবানের সেবা এবং অন্য কারো কোন অনিষ্ট না করা।" অতএব তাঁর দেশ-প্রেমের ধারণা প্রচলিত ধারণার চেয়ে পৃথক্ ছিল। বর্তমানে দেশপ্রেম বা জাতিপ্রেম নামে পৃথিবীতে যা চলছে তা কবি অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :—

"জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।"

গান্ধীর দেশপ্রেম সর্বজনীন বা বিশ্বপ্রেমেরই প্রথম ধাপ। ১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারী গান্ধী ও কস্তুরবা বোম্বে পৌঁছেন। তার পূর্বেই গোখলে ভারতে এসেছেন। তাঁর ইঙ্গিতে বোম্বেতে গান্ধীর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়। সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট লোকদের অভ্যর্থনা সভা হয় স্যার ফিরোজ সা মেহতার সভাপতিত্বে। গুজরাটীদের প্রদত্ত অভ্যর্থনায় সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ আলি জিন্না সাহেব। এই সভায়ও বক্তৃতা হয় ইংরেজীতে। কিন্তু গান্ধী তাঁর কথা বলেন গুজরাটীতে আর এই মতও ব্যক্ত করেন যে, গুজরাটীদের সভায় বক্তৃতা গুজরাটীতে হওয়া উচিত—ইংরেজীতে নয়।

গান্ধী ভারতে পৌঁছবার পূর্বেই তাঁর ফিনিক্স আশ্রমের সহকর্মীরা পৌঁছে যায়। তিনি তাদের এণ্ড্রুজের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর নির্দেশমত সকলকে এক জায়গায় একত্র থাকতে বলেন। বোম্বে নেমেই খবর পান তারা তখন শান্তিনিকেতনে। এর পূর্বে ছিল হরিদ্বারে মহাত্মা মুন্সীরামের (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) গুরুকুল আশ্রমে। তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার জন্য উদগ্রীব হন, তথাপি গোখলের সঙ্গে পুণা গিয়ে আলোচনা করাই মনে করেন প্রথম কাজ। কারণ তাঁর ইচ্ছা গোখলের ছত্রছায়ায় কাজ করা। পুণা যাওয়ার পূর্বেই তিনি গোখলের নির্দেশে বোম্বের গবর্নর লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করেন। গবর্নর তাঁকে বলেন, "আমার সরকার সম্বন্ধে কোন কিছু করবার পূর্বে আশা করি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।" গান্ধী বলেন, "এই প্রতিশ্রুতি আমি সানন্দে দিতে পারি, কারণ ইহাই সত্যাগ্রহীর নীতি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি বরাবরই সেরূপভাবে কাজ করেছি।"

বোম্বের অভ্যর্থনাদি শেষ হলেই গোখলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পুণা যান। গোখলের ইচ্ছা গান্ধী ভারত সেবক সমিতির (সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির) সভ্য হন, তাঁরও ইচ্ছা সেরূপ। কিন্তু ওই সমিতির সভ্যদের মধ্যে দ্বিমত হওয়ায় তা হয়ে উঠল না। গোখলে

অবশ্য তাঁকে বললেন, "আপনি আনুষ্ঠানিক ভাবে সভ্য না হলেও আমি আপনাকে সভ্য হিসাবেই দেখব।" গান্ধী তাতে আনন্দিত হলেন। আলাপ আলোচনা করে ঠিক হল গান্ধী গুজরাটে কোন জায়গায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে কাজ করবেন। গোখলে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিলেন। তাতে গান্ধী অত্যন্ত খুশী। টাকা সংগ্রহ করতে যেতে হবে না ভেবে স্বস্তি বোধ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু অর্থ সংগ্রহ করেছেন তথাপি অর্থ সংগ্রহ করতে হবে না তাতেই মনে আনন্দ। পরবর্তী জীবনে ভারতবর্ষেও দেখেছি সে ভাব।

১৯৪৬ সাল। বাংলা ভ্রমণ কালে কিছু টাকার থলি পান। কিছু টাকা আমার কাছে রেখে যান। যেমন যেমন যাকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে চিঠি দিতেন, আমি সেই ভাবে টাকা দিতাম। অবশেষে একজনকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। পূর্বের চিঠি অনুযায়ী সব টাকা দেওয়া হয়ে গেলে আর ওই পরিমাণ টাকা হাতে থাকবে না এ কথা জানাই। তার অল্প কয়েকদিন পরে সেবাগ্রামে এ প্রসঙ্গ উঠালেই তিনি বলেন, "তুমি যা লিখেছ তা ঠিক। এখন এই টাকা দিতে হলে আমাকে কোন বড়লোকের কাছে যেতে হয়। আমার আর সে ইচ্ছা করে না।" যে ভাবে এ কথা কয়টি বললেন তাতে আমি তক্ষুনি বলি, "আপনাকে কারো কাছে যেতে হবে না। যাকে ওই পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার চিঠি দিয়েছেন তাকে আমি যা তুলে দিতে পারি তাতেই সন্তুষ্ট হতে বলব। আশা করি সন্তুষ্ট হবেনও।" এই কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

পুণা হতে রাজকোট ও পোরবন্দর যান। রাস্তায় কাথিয়াওয়ারের ওয়াধান নামক এক স্টেশনে জনসেবক সচ্চরিত্র দরজী শ্রীমতিলাল তাঁর সঙ্গে দেখা করে ভিরমগাম কাস্টমস অফিসের জুলুমের কথা বলেন। তিনি এ বিষয়ে সব খোঁজখবর নেন। এজন্য প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহ

করা দরকার হতে পারে তার ইঙ্গিতও দেন। সেই প্রথম সত্যাগ্রহের আভাস ভারতে। বোম্বে সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ হয়। গবর্নর ও তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু ব্যাপারটা ভারত সরকারের একতিয়ারে, তাই তিনি সেখানে চিঠি লেখেন। চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার ভিন্ন আর কোন খবরই পান না। অবশেষে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ বিষয়টির উল্লেখ করেন। ভাইসরয় নিজে খোঁজখবর নিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই ভিরমগামের কাস্টমস অফিস তুলে দেন। ভাইসরয়ের কাছে গান্ধীর এ কথা তুলবার সুযোগ ছিল বলেই উৎপীড়নের হাত হতে অব্যাহতি পেল সাধারণ লোকে। এমনকি চিঠি লিখে গান্ধীও কোন সুফল পাননি। এই ছিল সরকারী দপ্তরের অবস্থা। দুঃখের বিষয় আজও সরকারী দপ্তরের বহুলাংশে সেই অবস্থা।

রাজকোট ও পোরবন্দরে অল্প দিন অবস্থানের পর ফেব্রুয়ারী মাসে আসেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে তাঁকে ভারতীয় পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা দেওয়া হয় এবং তাতে তিনি খুব খুশী। সেখানে অল্প কয়েক দিনের অবস্থিতির সময় তিনি রান্না, সাফাই ইত্যাদি সমস্ত কাজ ছাত্র, শিক্ষক দ্বারা করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি; কিন্তু সে কয়টি দিনের কথা শান্তিনিকেতন খুব গর্বের ও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে।

আমাদের এক অন্তরঙ্গ অধ্যাপক বন্ধু তখন সেখানে যান গান্ধীর কার্যাবলী লক্ষ্য করতে। তিনি বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের এক কেন্দ্রে সাধু না হয়েও সন্ন্যাসী জীবন যাপন করছেন। তিনি গান্ধীকে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর মত কি জিজ্ঞাসা করেন। গান্ধী খুব অল্প কথায় উত্তর দেন "যেখানে শিল্পকলা, সেখানেই জীবন।" গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেরই শিল্পী মন। এইখানেই দুই সৃষ্টিধর্মী মহাপ্রতিভার মিলনক্ষেত্র।

গোখলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি খুব অল্প কয়দিন থাকার পরই

শান্তিনিকেতন হতে পুণা যান। গোখলের মৃত্যুতে তিনি দারুন ব্যথা পান। বেশ কিছুকালের জন্য খালি পা হয়ে যান। তাঁর স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য ভারত সেবক সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন। এবারও সভ্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়। তাই গান্ধী দুঃখের সহিত আবেদন প্রত্যাহার করেন।

পুণা যাওয়ার পথে বোলপুর হতে বর্ধমান পর্যন্ত এণ্ড্রুজ গান্ধীর সঙ্গে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে ভারতবর্ষে কবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবে। গান্ধী বলেন যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তার পূর্বেই হয়ে গেল চম্পারন ও খেড়া সত্যাগ্রহ।

১৯১৫ সালে হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা হয়। সে উপলক্ষ্যে তিনি সেখানে যান। তাঁর ফিনিক্স আশ্রমের সহকর্মীদের নিয়ে সেবাকার্য করেন। অগণিত সাধু দেখবার সুযোগ হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা হয় না। তবে হৃষীকেশে এক সাধুর কথায় পুনরায় শিখা রাখা স্থির করেন। বিলাত যাওয়ার সময় তা কেটে ফেলেছিলেন। কিন্তু পৈতা রাখার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হন না। সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা তাঁর ভাল লাগে। ওই দারুন গ্রীষ্মকালে একদল যাত্রী পিপাসায় অতিশয় কাতর হয়েও ট্রেনে জল গ্রহণ করেনি যতক্ষণ না 'ব্রাহ্মণিয়া পানি' পেয়েছে। তার উল্লেখ করে একদিন বলছিলেন, "এই ভারতবর্ষ!" যা বিশ্বাস, জীবন যাওয়ার সম্ভাবনা হলেও তা হতে বিচ্যুত না হওয়া ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গান্ধী ও কস্তুরবার জীবনে অসুখের সময় তা কয়েকবারই দেখা গিয়েছে। হরিদ্বারের উপকণ্ঠে মহাত্মা মুন্সীরামের গুরুকুল দেখে খুব প্রীত হন।

১৯১৫ সালে আমেদাবাদের উপকণ্ঠে কোচরাবে এক ভাড়া বাড়ীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ফিনিক্স ও টলস্টয় ফার্মের অভিজ্ঞতা হতে আশ্রমের নিয়মাবলী রচনা করেন। সত্য ও অহিংসা আসল কথা। ভগবানে বিশ্বাস ভিন্ন সত্য ও অহিংসা পালন সম্ভব নয়।

তাই সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা আশ্রমে সবার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক দিয়ে আরম্ভ হয় সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিৎ ধনম্॥"

জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরময়, তাই বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে পরমাত্মাকে ভোগ কর, কারো ধনে লোভ করো না। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—' কথার মধ্যেই নিহিত আশ্রমের আদর্শ। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ—অর্থাৎ পার্থিব সুখ ত্যাগের মধ্যেই নিহিত পরম আনন্দ উপভোগ। প্রার্থনার মধ্যে এ কথাও ছিল 'লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো-ভবন্তু'—সমস্ত লোক সুখী হোক। দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত লোক সুখী হোক এই প্রার্থনা। এইরূপ উদার-ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আশ্রমকে এবং তার মারফতে সমস্ত জাতিকে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ১৯টি শ্লোক অর্থাৎ যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তাও আবৃত্তি হত। উদ্দেশ্য আশ্রমবাসী যাতে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার দিকে এগোতে পারে।

আশ্রম সভ্যদের একাদশ ব্রত অবশ্যপালনীয়। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তা উচ্চারিত হত। তা হচ্ছে এই—

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য অসংগ্রহ।
শরীর শ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন॥
সর্বধর্মে সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শভাবনা।
হীঁ একাদশ সেবাবীঁ নম্রত্বে ব্রতনিশ্চয়ে॥

আশ্রমে কোন প্রকারের অস্পৃশ্যতা থাকবে না এই ছিল সংকল্প। অন্য সব দিক দিয়ে যোগ্য হলে তথাকথিত অস্পৃশ্যকে আশ্রমে স্থান দেওয়ার কোন বাধানিষেধ ছিল না। প্রথম এরূপ সমাজের কোন লোক আশ্রমে ছিল না। কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই একটি অস্পৃশ্য পরিবার এল। তখন ভেতরে ও বাইরে দুই দিকেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রথম গ্রামের কূয়া হতে পানীয় জল

আনার অসুবিধা হল। লোকেরা বাধা দিতে আরম্ভ করল। এমনকি কস্তুরবাকে ধাক্কা পর্যন্ত খেতে হয়। কস্তুরবার নিজেরও অসন্তোষ ছিল এ ব্যাপারে। মগনলাল গান্ধী ত সস্ত্রীক বিছানাপত্র বেঁধে আশ্রম ত্যাগের অনুমতি চাইতে এলেন। গান্ধী তাঁকে বললেন, "এ আশ্রম আমার যেমন তোমারও তেমনি। ছেড়ে যাওয়ার অনুমতির প্রশ্নই উঠে না। মাদ্রাজে গিয়ে কিছুদিন থাক এবং তাঁত বোনা ভাল করে শিখ। গভীরভাবে চিন্তা করে মন স্থির কর।" মাদ্রাজে ছয় মাস থাকার পর তাঁর মতের পরিবর্তন হয়। যে সমস্ত ধনী আশ্রমে আর্থিক সাহায্য করতেন তাঁরাও তা বন্ধ করলেন। তখন আশ্রমের সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে ওখান হতে অস্পৃশ্যদের পাড়ায় উঠে গিয়ে শরীর শ্রম করে জীবিকা অর্জন করবেন। ঠিক এমনি সময় এক ধনী ব্যবসায়ী কোন পরিচয় না দিয়ে গান্ধীর হাতে তের হাজার টাকা দিয়ে যান। এই দান উপলক্ষ্য করে একদিন বলছিলেন "এই টাকা না পেলে আশ্রমের ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হত—সম্ভবতঃ আরো ভালভাবে।" পরে জানা যায় এই দাতা শ্রীঅম্বালাল সরাভাই।

পরে আশ্রম সবরমতী নদীর তীরে নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

১৯১৫ সালে বর্ষাকালেও গান্ধী একবার বাংলাদেশে আসেন। তখন ত্রিপুরা জিলায় বন্যা হয়েছে। সেখানকার কয়েকজন লোক গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং একজন নেতারা কিছু করছেন না এই অভিযোগ করেন। তখন তিনি বলেন "তাঁরা যা ভাল মনে করেন তা করছেন, আপনি যা ভাল মনে করেন তা করুন।" উত্তরে 'আমি নেতা নই, আমার কথা কে শুনবে' এ কথা বললে গান্ধী একটু বিরক্তি সহকারে বলেন "আপনি কি তাদের (বন্যাপীড়িতদের) জন্য অনুভব করেন?" উত্তরে "হাঁ" বলাতে গান্ধী খুব দৃঢ় কণ্ঠে বলেন "তা হলে আপনি এখানে কেন! সেখানে (বন্যাপীড়িত স্থান) যান এবং

তাদের সঙ্গে ছয় দিন অনাহারে থাকুন, সাত দিনের দিন আপনিই নেতা হয়ে যাবেন।" গান্ধীর কাছে নেতৃত্বলাভের পথ ছিল কঠোর সাধনা।

১৯১৬ সালে কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আসেন সেখানে। গান্ধীও নিমন্ত্রিত হয়ে যান। গান্ধী দেশে ফিরে এলে গোখলে তাঁকে এক বৎসর চোখ ও কান খোলা এবং মুখ বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেন। গান্ধী যথাসম্ভব তা রক্ষা করেন। তখন সে এক বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দিনে তিনি বক্তৃতা দেন। তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বড়লাটের আসার জন্য সে সময় সমস্ত রাস্তায় সি আই ডি পুলিশে ভর্তি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি এরূপভাবে জীবন্মৃতের জীবন পছন্দ করতে পারেন, কিন্তু তিনি মোটেই তা করেন না। অবশ্য দেশে যে একদল সশস্ত্র বিপ্লববাদী আছে সে কথাও উল্লেখ করেন। তাদের সম্বন্ধে বলেন, "সাহসের জন্য আমি তাদের প্রশংসা করি, দেশপ্রেমের জন্য তাদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি 'হত্যা করা কি সম্মানজনক'?" তারপর রাজা মহারাজারা যেভাবে বহুমূল্য হীরা জহরৎ প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে সেখানে এসেছিলেন তা দেখে ব্যথিত হয়ে বলেন যে, প্যারিস হতে কোন মণিকার এসে দেখলে কি বলবে যে ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশ! এ কথাও স্পষ্টভাবে বলেন যে, "আমি যখনি ভারতের কোন এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ দেখি তখনই মনে হয় তা দরিদ্র কৃষকের রক্তে তৈরী।" এই বক্তৃতার সময় প্রথম শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ট বাধা দেন। শেষ পর্যন্ত সভাপতিও তাঁর আসন ত্যাগ করে চলে যান। আমরা তখন যুবক। এই বক্তৃতার প্রভাব আমাদের উপর খুব পড়ে। আমরা মনে করি একজন নির্ভীক তেজস্বী লোক প্রাণ দিয়ে সত্য কথা বলছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শেষ হওয়ার পরে অধিকাংশ চিন্তাশীল ভারতীয়ের মনে এই ভাব আসে যে, ভারত হতে দক্ষিণ

আফ্রিকায় আর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক পাঠানো উচিত নয়। ১৯১৬ সালে মার্চ মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই প্রথা অবসানের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ যথাসময়ে ইহা অবসানের সম্মতি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন বলে জানান। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মালব্যজী অবিলম্বে এ প্রথা রদের জন্য একটি বিল উত্থাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তা অগ্রাহ্য হয়। তখন গান্ধী এই নিয়ে সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন সৃষ্টির জন্য ভারত পরিভ্রমণ আরম্ভ করেন। লর্ড চেমসফোর্ড সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন বটে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট তারিখ দিতে রাজী হন না। বোম্বে, করাচী ও কলিকাতার সভায় আশাতীত জনসমাগম ও উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রথা অবসানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত সরকার ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যেই এ প্রথার অবসান ঘোষণা করে। সরকার যুদ্ধের সময় জনমত অগ্রাহ্য করতে চায়নি, সত্যাগ্রহের ঝুঁকিও নিতে চায়নি, তাই তাড়াতাড়ি অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার বিলোপ ঘটল।

১৯১৬ সালের লক্ষ্নৌ কংগ্রেসে গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। বিহারের কিছু ডেলিগেট তাঁকে চম্পারনে নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে বলেন। তিনি নিজে চোখে না দেখে কোন কথা বলতে রাজী হন না। বিহারে শ্রীব্রজকিশোর প্রসাদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইনি পরে চম্পারন সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রথম দেখাতেই তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের নিবিড় সম্পর্ক হয়। মনে হল যেন কতদিনের পূর্ব পরিচিত। ভারত বর্ষের যে কয়জন লোক আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। দুঃখের বিষয়, বহুদিন পূর্বেই ভগবান তাঁকে আমাদের মধ্য হতে নিয়ে গিয়েছেন। তাতে বিহার ও ভারতের ক্ষতিই হয়েছে।

যদিও গান্ধী প্রস্তাব উত্থাপন করেননি, শ্রীরাজকুমার শুক্লা নামে

একজন কৃষকের পীড়াপীড়িতে সুবিধামত চম্পারন যেতে রাজী হন। শ্রীশুক্লা একপ্রকার নাছোড়বান্দা। গান্ধীর পেছনে লেগে থাকেন। অবশেষে তার সঙ্গে ১৯১৭ সালের ৯ই এপ্রিল কলিকাতা হতে চম্পারনের পথে পাটনা রওনা হন। শ্রীশুক্লা গান্ধীকে নিয়ে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ী যান। তখন রাজেন্দ্রবাবু পুরীতে। বাড়ীর চাকররা গান্ধীকে চিনতে পারেনি। তাঁকে একজন গ্রাম্য মক্কেল মনে করে সেরূপভাবেই ব্যবহার করেছিল। এমনকি বাড়ীর ভেতরকার পায়খানা পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেয়নি। গান্ধীর পোশাক ছিল তখন অতি সাদাসিদে। বাইরের জৌলুষটাই বড়। তখনও ছিল এখনও আছে। রাজকুমার শুক্লার তেমন প্রভাব নেই দেখে গান্ধী নিজেই তাঁর পূর্বপরিচিত মজরুল হক সাহেবকে খবর দেন। তিনি এসে গান্ধীকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। সেখান হতে সেদিনই মজঃফরপুর রওনা হন। যাবার পূর্বে অধ্যাপক জে বি কৃপালানীকে তার করেন। এর পূর্বে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। নাম শুনেছেন মাত্র। কৃপালানী কিছু ছাত্র নিয়ে রাত দশটার সময় গান্ধীর অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে আসেন। এই সময় হতে কৃপালানী গান্ধীর অনুগামী হন। আজও কৃপালানী সাধ্যমত গান্ধী প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলছেন।

১১ তারিখে গান্ধী নীলকর সমিতির সম্পাদক মিঃ উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে ত্রিহুত বিভাগের কমিশনারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন—মজঃফরপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেটও তখন উপস্থিত ছিলেন। কমিশনার গান্ধীকে তদন্তে কোন প্রকারের সাহায্য করতে অস্বীকার করেন এবং অবশেষে অবিলম্বে সেখান হতে চলে যাওয়ার উপদেশ দেন। গান্ধী সে উপদেশ অগ্রাহ্য করে মতিহারী যান। ১৬ই এপ্রিল তারিখে চম্পারনের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক নোটিশ জারী করে পরবর্তী ট্রেনেই গান্ধীকে জিলা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন, কারণ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। কমিশনারের ইচ্ছানুসারে

ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশ দেন। গান্ধী এই অন্যায় ও অযৌক্তিক আদেশ অমান্য করা স্থির করেন। তাঁর উদ্দেশ্য কোন আন্দোলন ছিল না, ছিল সত্য কি তা জানবার জন্য অনুসন্ধান। শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে আদেশ অমান্যের কথা জানিয়ে দেন। এর পর ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্য গান্ধীকে ১৮ তারিখে মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য শমন জারী করেন। বিহার ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতৃবৃন্দ এই খবর পেয়ে বিচলিত হন এবং অনেকে তাঁর কাজে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মজরুল হক ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। মিঃ পোলক তখন ভারতবর্ষে। তিনি এবং মিঃ এণ্ড্রুজও আসেন গান্ধীর সাহায্যে। জনগণের মধ্যেও অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। যারা নীলকুঠির একজন জমাদারের ভয়ে ভীত ত্রস্ত ছিল তারা যেন যাদুমন্ত্রের বলে জেগে উঠল। যে লোক দরিদ্রের দুঃখ লাঘবের জন্য কারাবরণ করতে প্রস্তুত তাঁর দর্শনের জন্য লোক উৎসুক, শেষ পর্যন্ত বিহারের লেফ্টেনাণ্ট গভর্নরের নির্দেশে গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং তাঁকে তদন্ত করতে দেয়। সেই তদন্ত চলা সময় নীলকুঠির সাহেবরা নানাভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করে। অবশেষে জুন মাসে সরকার একটি কমিশন গঠন করে এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্যে। গান্ধীও তার একজন সদস্য নিযুক্ত হন। সেই কমিশন অক্টোবর মাসে সর্ববাদীসম্মত এক রিপোর্ট দেয়। সেই রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করে। চম্পারনের কৃষকদের বহুদিনের এক দুঃখজনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। গান্ধীর কর্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা, ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, জনসমর্থন এবং বিহারের তৎকালীন ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড গেইটের সুবিচারের প্রতি দৃষ্টিই এ জিনিস সম্ভবপর করেছিল। এই প্রথম ভারতবর্ষে গান্ধীর সর্বজনীন কাজে জয়। কিন্তু কোন পরিকল্পনা করে তিনি সেখানে যাননি।

এই কাজের সময় গান্ধী চম্পারনের কৃষকদের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা

দেখে খুবই ব্যথিত হন। তাই এদের মধ্যে রচনাত্মক কাজ, বিশেষ ভাবে শিক্ষা বিস্তারের কাজ আরম্ভ করেন। এ কাজে বিহারের বাইরের কর্মীরাই বেশীরভাগ এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীনরহরি পারেখ, মহাদেব দেশাই, দেবদাস গান্ধী, অবন্তিকাবাই গোখলে, কৃপালানী ও শ্রীশঙ্কররাও দেওয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চম্পারনের কাজ শেষ হতে না হতেই আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের দুরবস্থা ও অজন্মাজনিত গুজরাটের অন্তর্গত খেড়া জিলায় কৃষকদের দুর্গতির খবর আসে। তিনি গুজরাট চলে যান।

আমেদাবাদ কাপড়ের কলের শ্রমিকদের বেতন কম থাকায় বেতন বৃদ্ধি করার দাবী উঠে। মিল মালিকরা বেতন বৃদ্ধি করতে রাজী হয় না। এমনকি সালিশের হাতে দেওয়ার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করে। তখন তাদের ধর্মঘট করার উপদেশ দেন গান্ধী। কিন্তু প্রধান সর্ত পুরাপুরি অহিংস থাকতে হবে। দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ ফিরে যাবে না এই ছিল সবার প্রতিজ্ঞা। প্রথম প্রথম এই প্রতিজ্ঞা রক্ষায় দৃঢ়তা দেখালেও কিছুদিন পরে শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দিল দুর্বলতা। তাই গান্ধী আরম্ভ করলেন উপবাস। এ উপবাস মিল মালিকদের বিরুদ্ধে নয়—শ্রমিকদের দুর্বলতা দূর করবার জন্য। কিন্তু তাদের উপর পড়ল একটা পরোক্ষ চাপ। অতএব এই উপবাসের মধ্যে একটা ত্রুটী ছিল। যা হোক তিন দিন উপবাসের পর একটা আপোষ হয়ে যায়। এর কারণ মিল মালিকদের গান্ধীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রেম ও শ্রদ্ধা। একে সত্যাগ্রহের জয় বললে ভুল করা হবে। শ্রমিকদের স্বার্থে গান্ধীর এই প্রথম কাজ, এবং ভারতবর্ষে এই তাঁর প্রথম উপবাস।

খেড়া জিলায় ১৯১৭ সালে অজন্মা হয়। ওই অঞ্চলে শস্য ফলন স্বাভাবিকের ¼ অংশের কম হলে খাজনা রেহাই দেওয়া নিয়ম। সরকারী হিসাবে ¼ অংশের বেশী ফসল হয়েছে, অতএব খাজনা রেহাই দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু বেসরকারী লোকের

তদন্তানুযায়ী ফসল ¼ অংশেরও কম হয়েছে। সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর (ঠক্কর বাপা) এই তদন্ত পরিচালনা করেন। ঠক্কর বাপার ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ, কঠোরপরিশ্রমী, কর্মকুশল, সংযমী ও স্নেহপ্রবণ লোক বিরল। পরিণত বয়সে কাজ করতে করতে তিনি আমাদের মধ্য হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। রেখে গেছেন মধুর স্মৃতিটুকু। তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে গর্ব অনুভব করি। গান্ধী নিজেও অনেক গ্রাম ঘুরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ফসল ¼ অংশের কম হয়েছে। বেসরকারী লোকদের কথা সরকার গ্রাহ্য করে না। অবশেষে ১৯১৮ সালের ২২শে মার্চ গান্ধী জমির খাজনা দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেন। যদি সাধারণের কাছ থেকে আদায় বন্ধ করা হয় তবে যাদের দেওয়ার সামর্থ্য আছে তাদের দেওয়ার নির্দেশ ছিল। কিন্তু সরকার কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নন। তাই আরম্ভ করা হল খাজনা বন্ধ রূপ সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। মাল ক্রোক, অত্যাচার, এমনকি ক্ষেতের ফসল পর্যন্ত ক্রোক করা হল। ক্রোক করা ফসল ঘরে তুলে আনবার নির্দেশ দিলেন গান্ধী। নিজের জমির ফসল উঠাবার জন্য চোর হিসাবে শাস্তি হল। নির্যাতনের ফলে কৃষকরা অনেক পরিমাণে দমে যায়। চার মাস সত্যাগ্রহের পর যখন অবস্থা এরূপ, সরকার ঘোষণা করল যে, যারা দিতে সমর্থ তারা যদি স্বেচ্ছায় খাজনা দেয় তবে গরীবদের কাছ থেকে আদায় করা হবে না। ইহাই ছিল সত্যাগ্রহীদের দাবী। সে হিসাবে তাদের জয় হল বটে। কিন্তু আসলে জয় নয়। সত্যাগ্রহীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে উদারতা দেখাল সরকার। এতে সত্যাগ্রহীদের ন্যায্যতা স্বীকৃত হল কিন্তু সত্যাগ্রহের কাছে সরকার মাথা নত করেনি তাও প্রমাণিত হল। এই ভুয়া প্রেস্টিজ বা সম্মানজ্ঞানই সরকারকে দূরে রাখে জনসাধারণের কাছ থেকে। এই কথা ঘোষণার পূর্বে গান্ধী বা অন্য কোন সত্যাগ্রহী ছোট বা বড় নেতার সঙ্গে কোন আলোচনা করেনি সরকার। এই আন্দোলনে

বল্লভভাই প্যাটেল, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, মহাদেব দেশাই ছিলেন গান্ধীর প্রধান সহকর্মী। জুলাইয়ের শেষ ভাগে হয় সত্যাগ্রহের অবসান।

১৯১৮ সাল। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। এপ্রিল মাসে ভাইসরয় একটি কনফারেন্স ডাকলেন দিল্লীতে। উদ্দেশ্য কি ভাবে যুদ্ধজয়ের জন্য আরও বেশী প্রচেষ্টা করা যায়। গান্ধী নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন। বক্তৃতা দিলেন হিন্দুস্থানীতে। এই প্রথম ভাইসরয়ের আহূত কোন সভায় ভারতীয় ভাষায় বক্তৃতা। তিলক, য়্যানি বেসাণ্ট ও আলি ভাইদের মত নেতাদের নিমন্ত্রণ দেওয়া উচিত ছিল এ কথা বলেন। সভায় তিনি সৈন্য সংগ্রহের প্রস্তাব সমর্থন করেন। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়', শ্রীচৈতন্যের এই বাণী ছিল তাঁর অন্তরের কথা। তাই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর সৈন্য সংগ্রহের জন্য প্রচারকার্যে বেরোন গুজরাটে। তিনি যান খেড়া জিলায়। ভেবেছিলেন এখানে তাদের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, হয়ত আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে। মোটেই তা হল না। সত্যাগ্রহের সময় যারা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন তাদের অধিকাংশের কোন সহযোগিতা পেলেন না। অত্যাচারের কথা লোকে ভোলেনি। ইংরেজের হয়ে লড়বার উৎসাহও জনগণের মধ্যে বড় একটা ছিল না। অহিংসপন্থী হয়ে কেন সৈন্য বিভাগে ভর্তি হতে বলছেন এ প্রশ্নও তুলল কেউ কেউ। এর পিছনে অহিংসার অন্তরালে ভীরুতার প্রশ্রয়। জোর করে নিরস্ত্রীকরণ আর স্বেচ্ছায় অহিংসাকে গ্রহণের মধ্যে তফাৎ অনেক। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধী ভাইসরয়ের কাছে রেজিনাল্ড রেনল্ডসের হাত দিয়ে যে চিঠি পাঠান তাতেও ভারতীয়দের অস্ত্রধারণের অধিকার দাবী করেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল এই যে, খেড়ায় যুদ্ধে সৈন্য-দলভুক্তি অভিযানের সময় লোকজনের বিরূপ মনোভাব এতটা

হয়েছিল যে, গান্ধী ও বল্লভভাই যাতায়াতের জন্য সব সময় গরুর গাড়ীও পেতেন না, এমনকি খাওয়া দাওয়ার সুবিধাও পেতেন না। এই সব অসুবিধা গান্ধীকে দমাতে পারেনি, দৃঢ়চিত্তে কাজ করে গিয়েছেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে', কবির এই গানকে জীবনে রূপ দিয়েছেন। এই গানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তিনি সত্যাশ্রয়ী, নিজের বিবেক অনুযায়ী চলেছেন। কখনো ফুলের মালা পেয়েছেন, কখনো বা বিরূপভাবের অভিব্যক্তি। ফুলের মালাও তাঁকে খুব উল্লসিত করেনি, বিরূপভাবও দমাতে পারেনি। যুগে যুগে আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রায় সবারই এই জীবন ইতিহাস।

এই অভিযানের অনিয়মে তিনি গুরুতর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। ওযুধ ত খান। ডাক্তার পুষ্টির জন্য দুধ খাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু গরু ও মহিষকে ফুকা দিয়ে শেষ ফোঁটা দুধ বের করার মত নিষ্ঠুরতা কলিকাতায় হয় বলে তিনি দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এ কথা জানান। কস্তুরবা শুনছিলেন এ সব কথাবার্তা। তিনি তখনি বলেন "তুমি ত তবে ছাগলের দুধ খেতে পার।" ডাক্তার বলেন "তাতেই চলবে।" গান্ধী ছাগলের দুধ খেতে রাজী হন। ক্রমে দুর্বলতা কমে আসে। এর মধ্যে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর পরাজিত জার্মানীর সহিত যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা হয়। অতএব সৈন্য সংগ্রহের অভিযান অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও শারীরিক দুর্বলতার জন্য ১৯১৮ সালের কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেননি। ১৯১৫, ১৬ ও ১৭ এই তিন বৎসরের কংগ্রেসেই তিনি যোগ দেন। ১৯১৭ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তাঁকে প্রথম দেখবার সৌভাগ্য হয়।

সভাপতি য়্যানি বেসাণ্টের চেয়ে লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীকে লোকে অধিকতর অভ্যর্থনা দেয়। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তা বিতর্কমূলক ছিল

না। এ সময় পর্যন্ত গান্ধী কংগ্রেসে তেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি।

যুদ্ধে বৃটেন তথা মিত্র শক্তির জয় হওয়ার পর গান্ধী আশা করেছিলেন যে ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাবে। কিন্তু তার বদলে পেল রাউলাট আইন। এই আইনের ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা হল খর্ব। বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা হল। গান্ধী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি—দুর্বল। তথাপি এই আইন প্রতিরোধ করার সংকল্প করলেন। সত্যাগ্রহ সভা গঠন করে আইন অমান্য করা স্থির করেন। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও সেই প্রতিষ্ঠানের মারফতে সত্যাগ্রহ করার কথা ভাবেননি। আর তখন পর্যন্ত কংগ্রেসকে নিজ মতে আনবার মত প্রভাবও তাঁর ছিল না। বোম্বেতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ওমর শোভানী, আমেদাবাদে বল্লভভাই প্যাটেল, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারি প্রভৃতি হলেন আন্দোলনের সমর্থক। বোম্বেতে প্রথম নিষিদ্ধ গুজরাটী হিন্দ্ স্বরাজ ছাপিয়ে বিক্রী করা হয়। এই সংস্করণ নিষিদ্ধ নয় এই অজুহাতে সরকার কাউকে গ্রেপ্তার করে না। এর পর কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার ও রাজাগোপালাচারির আমন্ত্রণে মাদ্রাজ যান। রাজাগোপালাচারির অতিথি তিনি। কি ভাবে আন্দোলনকে রূপ দেওয়া যায় তা নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা করে কিছু স্থির করতে পারেননি। গভীর চিন্তামগ্ন। রাউলাট বিল আইন হিসাবে ছাপা হল। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন। অতি প্রত্যুষে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় যেন স্বপ্নের মত মনে হল চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস ও সাধারণ হরতাল ঘোষণা করে আন্দোলন আরম্ভ করার কথা। মানুষের জীবনে এরূপভাবে আলোর আভাস মিলে থাকে। গভীর চিন্তা বা নিদিধ্যাসনের ফল এই। বিজ্ঞানীদের জীবনেও এরূপ ঘটে থাকে। সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী সেণ্ট গিয়রগি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়েও এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য

দিয়েছেন। বহু চিন্তা করে জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারেননি চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ার 'পর ঘুম ভাঙবার অল্প পূর্বে বা তার সাথে সাথেই হঠাৎ আলো দেখতে পেয়েছেন অর্থাৎ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। একেই গান্ধী বলেছেন 'অন্তর দেবতার আওয়াজ'। সাধক সে আওয়াজ শুনতে পান—সে সাধনা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। রাজাগোপালাচারি এই উপবাস ও হরতালের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

প্রথম ৩০শে মার্চ, পরে ৬ই এপ্রিল সারা ভারতব্যাপী উপবাস ও হরতালের সিদ্ধান্ত হয়। যদিও খুব অল্প দিনের নোটিশেই হরতালের ঘোষণা হয়, তথাপি সারা ভারতবর্ষে একটা বিপুল সাড়া পড়ে যায়। শহর, গ্রাম সর্বত্রই হরতাল পালিত হয়। কলিকাতা শহরে হরতালের পর সন্ধ্যায় এক লক্ষ লোকের সভা হয়। গান্ধী নিজেও এতটা সাফল্য আশা করেননি। অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা গেল আসমুদ্র হিমাচল।

দিল্লীতে হরতাল হয় ৩০শে মার্চ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও হাকিম আজমল খাঁর নেতৃত্বে। দিল্লীতে তখন হিন্দু মুসলমানের একতা এতটা যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমন্ত্রিত হয়ে জুম্মা মসজিদে গিয়ে বক্তৃতা দেন। সাময়িক উন্মাদনা ও ভাবাবেগের বলেই এসব হয়েছিল। নইলে পরে অসুস্থ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে একজন দর্শনপ্রার্থী ভান করা মুসলমানের গুলিতে প্রাণ দিতে হত না। দিল্লীতে ৩০শে মার্চ তারিখের মিছিলে সরকার গুলী চালনা করে। কয়েকজন মারা যায় ও আহত হয়। গান্ধীর দিল্লী যাওয়ার আহ্বান আসে। ৬ই এপ্রিলের পর যাবেন বলে জানান। সেদিন তিনি ছিলেন বোম্বেতে। সেখানে হরতাল খুব ভালভাবে পালিত হয়। নিষিদ্ধ পুস্তক (হিন্দ্ স্বরাজ) বিক্রী করা হয়। খুব উৎসাহ সহকারে লোকে তা খরিদ করে। এমনকি যার পকেটে যা পয়সা ছিল তা দিয়ে দেয়। তখন তিনি লবণ আইন অমান্যের কথাও ভাবেন। পরের দিন সকাল বেলা স্বদেশী ও হিন্দু

মুসলমানের ঐক্য ব্রত গ্রহণ সম্বন্ধে এক সভা ডাকেন। তাতে কিন্তু পূর্বদিনের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। খুব কম লোকই যোগ দেয়। এ কথা স্পষ্ট হয় যে, লোকজন হুজুগ ও উত্তেজনা প্রিয় যতটা, গঠনমূলক কাজ প্রিয় ততটা নয়। ভারতীয় চরিত্রের এটা মস্ত বড় দোষ। আজও ভারতীয় জীবনে তা পরিস্ফুট।

৭ই এপ্রিল গান্ধী বোম্বে হতে দিল্লী ও পাঞ্জাবের দিকে রওনা হন। ৮ তারিখে পালিওয়াল স্টেশনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বোম্বেতে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় আমেদাবাদ, ভিরমগাম প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণ শোচনীয় হিংসাত্মক কার্য করে। গান্ধী বোম্বে হতে আমেদাবাদ যান। তাঁর প্রচেষ্টায় আমেদাবাদ শান্ত হয় এবং সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়। আমেদাবাদ তাঁর কর্মক্ষেত্র। এখানে হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি খুবই ব্যথিত হন। কিন্তু তাঁকে এভাবে গ্রেপ্তার করা মোটেই ঠিক হয়নি। অপর দিকে সরকার অবিবেচনার পরিচয় দিলেও জনগণের কার্য কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নয়। তা তিনি করেননি। অশান্তির পর আমেদাবাদের কর্তৃপক্ষ গান্ধীকে সভা করতে দিয়ে সুবিবেচনার কাজই করেছিলেন। যদি ভারতবর্ষের সব স্থানের কর্তৃপক্ষ এরূপভাবে কাজ করতেন তা হলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাই হয়ত ঘটত না।

পাঞ্জাবে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত খারাপ হতে থাকে। ১০ই এপ্রিল হঠাৎ অমৃতসরে ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। জনতা প্রতিবাদ মিছিল করে। পুলিশ তার উপর গুলি চালায়। জনতাও ক্ষিপ্ত হয়ে পরে হিংসাত্মক কার্য করে। কয়েকজন ইউরোপীয়কে হত্যা করে এবং ব্যাঙ্ক জ্বালানো ও লুঠ হয়। একজন ইংরেজ মহিলা মিশনারী ডাক্তারকে মারধর করা হয়। অবশ্য ভারতীয়রাই তাঁকে রক্ষা করে নিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে। ফলে ১১ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ার অমৃতসরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, যদিও বিধিবদ্ধ ভাবে সামরিক আইন জারী হয়নি। তিনি সভা সমিতি

নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু সে ঘোষণা ভাল ভাবে প্রচারিত হয় না। ১৩ই এপ্রিল বৈশাখী মেলা। সেই উপলক্ষ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি ঘেরাও স্থানে কয়েক হাজার লোক সমবেত হয়। তার মধ্যে ছোট ছেলেও ছিল। সংবাদ পেয়ে জেনারেল ডায়ার সৈন্য নিয়ে সেখানে রওনা হন। সঙ্গে মেশিনগান যুক্ত সাঁজোয়া গাড়ীও ছিল। কিন্তু বাগের সরু রাস্তা দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ী বাগের ভিতরে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। বাগে ঢুকেই লোকদের চলে যাওয়ার কোন নির্দেশ না দিয়ে গুলি করার নির্দেশ দেন। গুলি নিঃশেষিত হওয়া পর্যন্ত গুলি চলে। জেনারেলের মতে চার-পাঁচ শত হত ও দেড় হাজারের মত আহত হয়—অর্থাৎ হতাহতের সংখ্যা প্রায় তুই হাজার। বেসরকারী হিসাব মতে সংখ্যা আরো বেশী। আহতদের শুশ্রূষা ত দূরের কথা, এক ফোঁটা জল দেওয়ার ব্যবস্থাও করেনি। সান্ধ্য আইন জারী করে সেখানে কারো যাওয়ার পথও রুদ্ধ করে দেয়।

এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্মম আচরণ ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। কিন্তু এখানেই তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আরো বর্বর কার্য অনুষ্ঠিত হয়। যে রাস্তায় ইংরেজ মহিলা ডাক্তারটি জনতার হাতে প্রহৃত হন সেই রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে হলে পেটে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হত। পাঞ্জাবের দারুন গরমে প্রতিদিন ষোল মাইল হেঁটে ছাত্রদের হাজিরা দিতে হত। প্রকাশ্য রাস্তায় লোকদের বেত মারার ব্যবস্থা হয়। গুজরানওয়ালায় ত এরোপ্লেন হতে বোমা বর্ষণ করা হয় ও মেসিনগান চালানো হয়। সামরিক আদালতে বিচার প্রহসন করে বর্বরোচিত দণ্ড দেওয়া হয়। স্যার মাইকেল ও' ডায়ার তখন পাঞ্জাবের ছোটলাট। তিনি জেনারেল ডায়ারের এই নিষ্ঠুর আচরণ সমর্থন করেন। মনে হয় এরা তুজনে চেয়েছিলেন পাঞ্জাবের জনগণকে একটা শিক্ষা দিতে। জেনারেল ডায়ার ত এরূপ কাজের জন্য মোটেই অনুতপ্ত হননি বরং এজন্য

গর্ববোধ করেছেন। চিরকাল ক্ষমতামদমত্ত শাসকের এই আচরণ। কিন্তু এই ঘটনা ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসানের বীজ বপন করে। অবশ্য সামরিক আইনের কড়াকড়িতে প্রথম দিকটা পাঞ্জাবের খবর খুব কমই ভারতের অন্য প্রদেশে যাচ্ছিল। ক্রমে যেতে আরম্ভ হয় এবং ভারত-আত্মা উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ৬ই এপ্রিল হতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত 'জাতীয় সপ্তাহ' বলে অভিহিত হল এবং স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত এই সপ্তাহ সেভাবে প্রতিপালিত হত।

সরকারের অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও জনগণের হিংসাত্মক কাজের জন্য গান্ধী খুব ব্যথিত হন, এবং ১৪ই এপ্রিল হতে তিন দিন উপবাস করেন। জনগণকে সত্যাগ্রহের আহ্বান দেওয়া হিমালয়ের মত সুউচ্চ ভুল বলে ঘোষণা করেন। নিজের ভুল এভাবে স্বীকার করার শক্তি শুধু মহান্ লোকদেরই থাকে। তাই গান্ধী মহাত্মা। অবশ্য এজন্য বেশ কিছু লোক তাঁর উপর অসন্তুষ্টও হন।

পাঞ্জাবের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে গান্ধী ১৯১৫ সালে প্রাপ্ত কাইজার-ঈ-হিন্দ্ মেডাল ফেরত দেন। কবি রবীন্দ্রনাথও নাইট বা স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। কবির এ কাজ মানবাত্মার প্রতিবাদ। একে মস্ত বড় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহও বলা যেতে পারে। পাঞ্জাবের ঘটনাসমূহ যখন অনেকটা প্রকাশিত হল তখন সরকারও লর্ড হাণ্টারের নেতৃত্বে এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটী গঠন করলেন। মিঃ এণ্ড্রুজ গেলেন পাঞ্জাবে। তাঁর কাছ থেকে গান্ধী হৃদয়বিদারক বিবরণসমূহ পেতে লাগলেন। মালব্যজী, মতিলালজী এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যান সেখানে। মালব্যজী গান্ধীকে তার করেন যাওয়ার জন্য। সমস্ত অন্তরের গভীর বেদনা সত্ত্বেও ভাইসরয়ের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত যেতে চাননি। পুনরায় এই সময় সত্যাগ্রহ করে হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠানের ঝুঁকি নেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেননি। সত্যাগ্রহীর পক্ষে এরূপ সংযম শক্তির লক্ষণ। অবশেষে অক্টোবর মাসে অর্থাৎ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ছয় মাস পরে তিনি অনুমতি পান

এবং পাঞ্জাবে যান। পাঞ্জাবের লোক তাঁকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। লাহোর স্টেশনে অগণিত জনতা উপস্থিত হয় তাঁকে দেখবার জন্য। মালব্যজী, মতিলালজী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও পাঞ্জাবের জেলের বাইরের স্থানীয় নেতৃবর্গের সহায়তায় গান্ধী সত্যানুসন্ধানের কাজে লেগে যান। জেলে আটক পাঞ্জাবের নেতৃবর্গকে হাণ্টার কমিটীর সামনে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করার সুযোগ দেওয়া হয় না। মুখ্যতঃ এই কারণে গান্ধী ও অন্যান্য নেতারা হাণ্টার কমিটী বয়কট করা স্থির করেন। কংগ্রেসের তরফ হতে একটি তদন্ত কমিটী গঠিত হয়। পণ্ডিত মতিলাল, দেশবন্ধু দাশ, আব্বাস তায়েবজী, মুকুন্দ রাম জয়াকর ও গান্ধী এই কমিটীর সভ্য হন। শ্রীসন্তানম্ হন সেক্রেটারী। কিন্তু কমিটীর কাজের প্রধান দায়িত্ব পড়ে গান্ধীর উপর। কমিটীর কাজ বিভিন্ন সভ্যের উপর ভাগ করে দেওয়া হয়। অধিক সংখ্যক স্থানে তদন্ত করতে যান গান্ধী। ফলে পাঞ্জাবের গ্রাম এবং পাঞ্জাবের লোককে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয় তাঁর। পাঞ্জাবের মেয়েদের সঙ্গে পরিচয়ও হয়। তাঁরা এসে তাঁকে বহুপরিমাণে হাতে কাটা সূতা উপহার দেন। তিনি বুঝতে পারেন যে পাঞ্জাব খাদি উৎপাদনের ভাল ক্ষেত্র। তদন্ত কমিটীর রিপোর্টের মুসবিদাও করেন গান্ধী। তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই রিপোর্ট গান্ধীর কর্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচায়ক। কংগ্রেস পাঞ্জাব তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ছাত্রদের অবশ্যপঠনীয়। হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট সরকারী অপকার্যকে চুণকাম করার চেষ্টা করে তবু জেনারেল ডায়ারকে কার্য হতে অবসর গ্রহণ করানোর সুপারিশ করে। হাণ্টার কমিটীর অধিকাংশ সভ্য ছিলেন ইংরেজ। যে কয় জন ভারতীয় সভ্য ছিলেন তাঁরাও চুণকাম করা রিপোর্টের সহিত একমত ছিলেন না। এ রিপোর্ট ইংরেজ সভ্যদের রিপোর্ট। সরকার তা গ্রহণ করে। কিন্তু একদল গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাতেও অসন্তুষ্ট হয়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে জেনারেলকে

পুরস্কার স্বরূপ দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। বিলাতে মর্নিং পোস্ট কাগজ ও ভারতে স্টেটস্‌ম্যান কাগজ এ কাজে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগৃহীত কুড়ি হাজার পাউণ্ড ও একখানি তরবারি তাকে দেওয়া হয়। এতে ভারতবাসীর ক্ষোভের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। এর পূর্বে ভারত সরকার একটি আইন করে পাঞ্জাবের তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য আদালতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তৎকালীন সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ মণ্টেগুও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতিরক্ষা কমিটী গঠন করেন। পণ্ডিত মালব্য ও গান্ধী এই দুই ভিক্ষুকশিরোমণি ছিলেন কমিটীর সভ্য। পাঁচ লাখ টাকা সংগৃহীত হয়ে ব্যাঙ্কে জমা থাকে। কিন্তু গান্ধীর জীবিতকালে স্মৃতিরক্ষার কোন কাজ হয়নি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার অভাবে। খুবই দুঃখের কথা।

যখন পাঞ্জাবে সরকারী নির্যাতন চলছিল নগ্নভাবে, তখন বোম্বে ক্রনিকেল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বি, জি, হর্নিমান। তিনি শক্তিমান লেখক এবং লেখনী ধারণ করেছিলেন সরকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই সরকার তাঁকে হঠাৎ ভারত হতে নির্বাসন দেয়। যদিও তিনি কখনো অরাজকতা পছন্দ করেননি বা তার প্রতি ইঙ্গিতেও সমর্থন জানাননি। ভারত সরকারের এরূপ আচরণ অরাজকতারই সামিল এবং কখনো সমর্থনযোগ্য নয়। মিঃ হর্নিমান 'অমৃতসর ও ভারতের প্রতি আমাদের কর্তব্য' নামে ইংরেজীতে একখানা সুন্দর পুস্তক লেখেন। তিনি অপসারিত হওয়ার পর বোম্বে ক্রনিকেলের পরিচালক মণ্ডলীর তরফ থেকে ওমর শোভানী ও শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার গান্ধীকে সম্পাদনার ভার নিতে অনুরোধ করেন। গান্ধী ইতস্ততঃ করেছিলেন কিন্তু সরকার ক্রনিকেল প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ায় সে কাজের ভার নেওয়ার প্রশ্ন আর উঠল না। তখন শোভানী ও ব্যাঙ্কার ইয়ং ইণ্ডিয়া (নবীনভারত) নামক ইংরেজী

সাপ্তাহিক পরিচালনা করতেন। তার সম্পাদকত্ব নিতে অনুরুদ্ধ হয়ে স্বীকৃত হলেন গান্ধী। প্রথম উহা সাপ্তাহিক হতে দ্বিসাপ্তাহিকে পরিণত হয়। বোম্বে ক্রনিকেল প্রকাশের অনুমতি লাভের পর পুনরায় উহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। কিন্তু ইংরেজী কাগজের মারফতে সত্যাগ্রহের ব্যাপারে জনশিক্ষার কাজ আয়াসসাধ্য নয় মনে করে উপরোক্ত মালিকদের গুজরাটী মাসিক কাগজ নবজীবনকে সাপ্তাহিকে পরিণত করে তার সম্পাদকত্বও গ্রহণ করেন গান্ধী। মাসিক নবজীবনের সম্পাদক শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক গান্ধীর সহায়ক হন। এই দুইখানা কাগজ কিছুদিন পরে আমেদাবাদের নিজস্ব প্রেস হতে প্রকাশিত হয়। কাগজে কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হত না। কাগজের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য এর চেয়ে ভাল নিয়ম আর কিছু হতে পারে না। কাগজ দুখানা গান্ধীর চিন্তাধারা প্রকাশের উৎকৃষ্ট বাহন হয়ে উঠল। অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন ও পরিচালনায় এই দুই কাগজের দান আসামান্য। অসহযোগ আন্দোলনের সময় অধিকাংশ কর্মী নির্দেশের জন্য এই কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকত। দুখানা কাগজই বহুল প্রচারিত হয়। অবশ্য নবজীবনের প্রচার সংখ্যা ছিল অধিক। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলছি যে, গান্ধী ইংরেজী লিখতেন ভাল, কিন্তু তাঁর গুজরাটী ছিল আরো ভাল—সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁকে একজন উঁচুদরের গুজরাটী সাহিত্যিক বলা চলে। ৭ই অক্টোবর ১৯১৯ প্রথম গান্ধীর সম্পাদনায় নবজীবন প্রকাশিত হয়, আর তার পরের দিন বেরোয় ইয়ং ইণ্ডিয়া।

রাউলাট আইন ও পাঞ্জাবের ঘটনা সমূহ যেমন গান্ধীর মনকে আলোড়িত করে, যুদ্ধশেষের পর খিলাফৎ সমস্যাও তেমনি গভীর রেখাপাত করে তাঁর মনের উপর। যুদ্ধে তুরস্ক ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। তথাপি ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তাদের স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সে প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তুরস্কের সম্রাট

খলিফার ক্ষমতা খর্ব করা হবে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষে শান্তি প্রস্তাবে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। মুসলমানরা এ কাজকে তাদের ধর্মের উপর আঘাত বলে মনে করে। তাই তারা খলিফার ক্ষমতা যাতে খর্ব না হয় সেজন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান প্রভৃতি ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান নেতা। গান্ধী এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করে—একে অন্যের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর মনে আঘাত লাগলে তাও উপশম করার চেষ্টা করা কর্তব্য। তাতে দুয়ের মিলনও সুদৃঢ় হয়। অতএব কর্তব্য-বুদ্ধিতে এবং হিন্দু মুসলমানের একতার জন্য গান্ধী যোগ দেন খিলাফৎ আন্দোলনে। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এক সভায় তিনি প্রথম অসহযোগের কথা উল্লেখ করেন। যদি শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না-ই করে তবে মুসলমানদের অসহযোগ করার অধিকার আছে—এ কথা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। এই সময় মুসলমানরাও হিন্দুদের মনে আঘাত না দেওয়ার জন্য গোহত্যা বন্ধ করার প্রস্তাব করে। কিন্তু গান্ধী চান বিনা সর্তে খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করতে। এই আন্দোলনের সঙ্গে গোহত্যা বন্ধের প্রস্তাব যুক্ত করা একটা লেনদেনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তা মোটেই উচ্চ আদর্শের মাপকাঠিতে যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ আদর্শই চিরদিন গান্ধীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই সময় বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসন সংস্কার ঘোষণা করে। প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব হয়। জনপ্রতিনিধিদের উপর কোন কোন বিভাগের কর্তৃত্ব থাকবে। কেন্দ্রে কোন প্রকারের পরিবর্তনের প্রস্তাব হয় না। এই প্রস্তাব মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বা মণ্টফোর্ড পরিকল্পনা নামে পরিচিত। মণ্টেগু ছিলেন তখন বৃটিশ

সরকারের ভারতের জন্য সেক্রেটারী অব স্টেট, আর লর্ড চেমসফোর্ড ভারতের ভাইসরয়। গান্ধীর মনঃপূত হয়নি এই প্রস্তাব, তথাপি তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা তাঁর মত ছিল না। যতটা অধিকার পাওয়া যায় তা নেওয়া ও কার্যকর করে আরো অধিকার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করাই ছিল তাঁর মত। অপর দিকে, তিলক, পণ্ডিত মতিলাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের মত ছিল প্রস্তাবকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা। এর কিছুদিন পরেই হয় অমৃতসর কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ১৯১৯)। পণ্ডিত মতিলাল সভাপতি এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সেখানে মণ্টফোর্ড পরিকল্পনা নিয়ে দুই মতের বিরোধ বেশ প্রকট হয়ে পড়ে। এক দিকে গান্ধী, মালব্য ও জিন্না; অপর দিকে তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও দাশ।

এইবারকার কংগ্রেসেই গান্ধীর প্রথম সক্রিয় অংশ গ্রহণ। যদিও এর পূর্বে ১৯১৫, ১৯১৬ ও ১৯১৭ এই তিন বৎসর কংগ্রেসে যোগদান করেন তথাপি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯১৮ সালের কংগ্রেসে যেতে পারেননি। তিলকও তখন ইংলণ্ডে। প্রথম কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশিষ্ট নেতৃবর্গ, বিশেষ করে তিলকের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে তিনি ইতস্ততঃ করেন। তিলকের প্রতি গান্ধীর গভীর শ্রদ্ধা। কিন্তু তাঁর মত গ্রহণে অপারগ। অথচ প্রকাশ্য বিরোধিতার ফল খারাপও হতে পারে। অতএব এ অবস্থায় কি কর্তব্য তাই হল বিবেচ্য। সোজা কথায় গান্ধীর সামনে উপস্থিত কর্তব্যের দ্বন্দ্ব। একবার মনে হল কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকার কথা। তা প্রকাশও করলেন। সে কথা কারও মনঃপূত হল না। মূল প্রস্তাব উপস্থিত করেন দাশ। গান্ধী যথারীতি সংশোধনী পেশ করে বক্তৃতা করেন। তিনি বিশেষভাবে তিলকের নিকট আবেদন করেন 'অবশেষে ভগবদ্‌গীতার লেখকের নিকট সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করার জন্য আবেদন করছি'। গান্ধী তখনো বৃটিশ

সরকারের উপর ভরসা হারাননি। হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট বা কংগ্রেস তদন্ত কমিটীর রিপোর্টও বেরোয়নি। খিলাফৎ সমস্যারও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি—যদিও খুব ক্ষীণ আশা ছিল। যাতে একটা আপোষ হয় এবং সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার জন্য মালব্যজী খুব চিন্তিত। শ্রীজয়রামদাস গান্ধীর প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারকে কার্যকর করার সংশোধনীর কিছুটা বদল করে তাঁকে দেখান। তিনি পছন্দ করেন এবং তাঁর মনে হয় তা উভয় পক্ষেরই সমর্থন লাভ করবে। তিনি এ কথা মালব্যজীকে বলেন। তারপর এই সংশোধনী তিলককে দেখানো হয়। তাঁর আপত্তি নেই, অবশ্য দাশ সমর্থন করলে। দাশ সংশোধনী দেখে বিপিন পালের দিকে তাকান। এই অবস্থা দেখে মালব্য ধরলেন দাশের আপত্তি নেই। আপস হয়েছে বলে তিনি ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস প্রতিনিধি ও দর্শকদের মধ্যে বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়। উভয় পক্ষের উদারতা ও মহানুভবতার জন্যই তা সম্ভবপর হয়েছিল। জাতির এই সংকটময় সময়ে একতার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক তা উভয় মতাবলম্বীই উপলব্ধি করেছিলেন। গান্ধীও শাসন সংস্কার 'নৈরাশ্যজনক' এই কথা বাদ দেওয়ার সংশোধনী উঠিয়ে নেন ; তিলক, দাশও শাসন সংস্কারকে কার্যকরী করার কথা মেনে নেন। গান্ধী চিরদিনই সহযোগিতার পক্ষপাতী, নিতান্ত অসম্ভব হলেই অসহযোগিতা। এই নীতির জয় হল। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই গান্ধী কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের একজন বলে গণ্য হলেন।

এই কংগ্রেসে পাঞ্জাবে সরকারী দমননীতির নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধী জনগণের হিংসাত্মক কাজেরও নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই শেযোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে তিলকের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয় তা তাঁর মুখে শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিলক গান্ধীকে বলেন 'আমি মক্কেলের মামলা হাতে নিয়েছি, কি করে

এ প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি !' উত্তরে গান্ধী বলেন 'দোষী জেনে মক্কেলকে সমর্থন করা উকিলের কর্তব্য নয়, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে যাতে বিচারক সত্য উপলব্ধি করতে পারেন সেভাবে কাজ করা'। এই যুক্তির সারবত্তা মেনে তিলক গান্ধী-প্রস্তাবের বিরোধিতা না করা স্থির করেন এবং তাও গৃহীত হয়। তিলকও ছিলেন গান্ধীর ন্যায় ধর্মপ্রাণ এবং ভারতীয় কৃষ্টির অমৃতধারায় সিঞ্চিত। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ছিল না মোটেই তাঁর মধ্যে। তাই গান্ধীর ভরসা ছিল তাঁর উপর পুরাপুরি। অমৃতসর কংগ্রেসের মাত্র কয়েক মাস পরে ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট তিলকের মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্রই গান্ধী বলে উঠেন 'আমার সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল চলে গেল'।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের এক প্রস্তাবও হয় এই কংগ্রেসে। কংগ্রেসের নিয়মাবলী পুরানো ছিল। পরিবর্তিত অবস্থায় তার দ্বারা কার্য পরিচালনা সম্ভবপর ছিল না। তাই গান্ধী, তিলকের মনোনীত নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার ও দাশের মনোনীত ইন্দুভূষণ সেন এই তিনজনকে নিয়ে নূতন গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের একটি কমিটী গঠিত হয়। অবশ্য কমিটীর কাজের ভার পড়ে মুখ্যতঃ গান্ধীর উপর। তিনি মুশাবিদা করেন, চিঠিপত্রের মারফতে তিন জনের ঐক্যমত হয়। এই গঠনতন্ত্র গান্ধীর রচনাত্মক প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচায়ক। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে তা গৃহীত হয়। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

অমৃতসরে গান্ধী সরকারের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ১৯২০ সালে সহযোগী গান্ধী হয়ে উঠলেন অসহযোগ মন্ত্রের উদ্গাতা। ইংরেজ সরকারের সুবিচারে আস্থা হারিয়ে ফেললেন। পাঞ্জাব অত্যাচার ও খিলাফৎ অন্যায়ের কোন ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার বৃটিশ সরকার করবে এ আশা তাঁর আর রইল না। গান্ধী অনন্যোপায় হয়ে অসহযোগ করার পরামর্শ দেন। খিলাফৎ কনফারেন্স সেরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারপর গুজরাট প্রাদেশিক

সম্মিলনে গান্ধী নিজেই অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একটি প্রাদেশিক সম্মিলনে এ প্রস্তাব উঠতে পারে না এ আপত্তি উঠে। গান্ধী বলেন যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কোন প্রদেশের এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে। বরাবরই তাঁর এরূপ মত ছিল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বেতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে, হিজলী ও চট্টগ্রামের অত্যাচারের ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এগোতে পারেনি কারণ ওয়ার্কিং কমিটী এগোবার নির্দেশ দেয়নি। তখন গান্ধী বলেন "প্রাদেশিক কমিটীর সহজাত অধিকার রয়েছে এগিয়ে যাবার। তা করতে গিয়ে আপনি যদি গুলিবিদ্ধ হতেন তবে আপনার চিতাভস্মের উপর নূতন ভারত গড়ে উঠত।" ১৯২০ সালেই গান্ধী ভারতে প্রথম একটি রাজনৈতিক সংস্থা 'অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগের' সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। তিলকের নেতৃত্বে পরিচালিত আর একটি হোমরুল লীগও ছিল।

গান্ধী এগিয়ে গেলেন গুজরাট প্রাদেশিক সম্মিলনে। অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব পাশ হল সেখানে। সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন আব্বাস তায়েবজী। তিনি ও বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন গান্ধীর সমর্থক। এই প্রস্তাব পাশের পেছনে তাঁদের প্রচেষ্টাও ছিল। তারপর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সমস্ত জিনিস বিবেচনার জন্য ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন করা স্থির করে। লালা লাজপত রায় এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। বোম্বে হতে প্রতিনিধিরা বিশেষ ট্রেনে আসে। বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক অধিবেশনে উপস্থিত হয়।

এই কংগ্রেসে গান্ধী অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফৎ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই এ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। শ্রীবিজয়রাঘবাচার বলেন যে, সবচেয়ে বড় অন্যায় হচ্ছে স্বরাজের অভাব। কাজেই স্বরাজ লাভও অসহযোগের

লক্ষ্য এ কথা উল্লেখ থাকা দরকার। গান্ধী এ যুক্তি অকাট্য মনে করে স্বরাজের দাবীও প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আমরা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে তিন নেতার—লাল (লালা লাজপত রায়), বাল (বালগঙ্গাধর তিলক) ও পাল (বিপিনচন্দ্র পাল)-এর নাম শুনতাম। এঁদের মধ্যে বাল তখন মরদেহে আর নেই। লাল ও পাল গান্ধীমতের বিরোধী। গান্ধীর ক্রমবর্ধমান অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিপিনচন্দ্র পাল। দাশ ও য়্যানি বেসান্তও বিরোধী। তবে লাজপত রায় ও দাশ আদর্শগতভাবে ততটা বিরোধী ছিলেন না। প্রস্তাব কার্যকরী করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ছিল তাঁদের মনে ঘোরতর সন্দেহ, তাঁদের বিরোধিতা মুখ্যতঃ সেই কারণে। তিলক জীবিত থাকলে গান্ধীকে সমর্থন করতেন কিনা বলা শক্ত, তবে গান্ধীর বিশ্বাস ছিল তিনি করতেন। লোকমান্য ছিলেন একজন সত্যিকারের বিপ্লবী, তেজস্বী ও নির্ভীক। ভারতের কল্যাণের জন্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই পথে ভারতের কল্যাণ হবে এ কথা উপলব্ধি করলে অবশ্য গান্ধীকে সমর্থন করতেন। কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এই অধিবেশনে শুধু পণ্ডিত মতিলাল গান্ধীকে সমর্থন করেন। খিলাফৎ সমস্যা যুক্ত থাকায় মুসলমান প্রতিনিধিরা অধিকাংশই অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেন। আশ্চর্যের কথা, অমৃতসরে যাঁরা গান্ধীর সহযোগিতার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবার তাঁরা তাঁর অসহযোগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন।

গান্ধীর উপাধি হতে আরম্ভ করে স্কুল কলেজ, আদালত, কাউন্সিল বর্জন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও এমনকি খাজনা বন্ধের আন্দোলন পর্যন্ত অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান অসহযোগের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। এই প্রস্তাবে হাতে কাটা সূতা ও তার দ্বারা হাতে বোনা কাপড় বা খদ্দর উৎপাদনের কথাও ছিল। কিন্তু তার কারণ ছিল এই যে, দেশী মিলের কাপড় উৎপাদন যথেষ্ট নয়। তখনও খাদির যথাযোগ্য স্থান

দিতে পারেননি গান্ধী কংগ্রেসে। তবে এই প্রথম কংগ্রেসে খাদির একটা স্থান হল। বিপ্লবী গান্ধীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল কংগ্রেসে। মণ্টফোর্ড সংস্কার নিয়ে নরম দল কংগ্রেস ত্যাগ করে। এবার গরম দল মাথা নত করল বিপ্লবের কাছে। সে বিপ্লবের নেতা গান্ধী। কিন্তু এ প্রস্তাব নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার কথা রইল। তাই যাঁরা এ প্রস্তাবের সমর্থক নন তাঁরাও জনমত গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন। গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলী প্রভৃতিও অসহযোগের পক্ষে জনমত গড়ে তুলবার জন্য যথাসাধ্য কাজ শুরু করলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়া পড়ে গেল। গান্ধী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও গেলেন। তিনি ছাত্রদের স্কুল কলেজ ত্যাগ করার কথা বলতে এসেছেন জেনেও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত মালব্য ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। মালব্য ও গান্ধী পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন। মতের পার্থক্য তাঁদের মধ্যে হয়েছে কিন্তু একের প্রতি অন্যের কোন বিরূপভাব আসেনি। মালব্যও ছিলেন গান্ধীর ন্যায় ভারতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। তাই এমনটি সম্ভবপর হয়েছিল।

গান্ধী ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলা দেশের ঢাকায় যান। সেখানকার বক্তৃতার নিম্ন অংশ আমার ন্যায় অনেকের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে ঃ— "আপনারা বলেন ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন, আমাদের মহিমময় রাজা দীর্ঘজীবী হোন। এর অর্থ কি? এ কথা ব্যক্তিগত ভাবে রাজাকে বুঝায় না। এর অর্থ এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হোক। কিন্তু আমার দিন রাতের প্রার্থনা এই যে, হয় বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিশুদ্ধ হোক নয় তো ধ্বংস হোক। একজন ইংরেজ হিসাবে জর্জ দীর্ঘজীবী হোন তাতে আমার কিছু বলবার নেই।" ঢাকা হতে তিনি কলিকাতা আসেন। তিন সহকর্মীকে নিয়ে যাই সাক্ষাৎ করতে। এই প্রথম সাক্ষাৎ। ৪৫ মিনিট ধরে আলাপ করেন। পূর্ব পরিচিত

আপনজনের মত আলাপ করলেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি বলেন, আমি খুব অল্প কথাই বলি। পূর্ব হতেই কি জিজ্ঞাস্য তা আমরা আলোচনা করে ঠিক করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি ছিলাম মুখপাত্র। কাজেই অন্য কাউকে কিছু বলতে হয়নি। তিনি যে সব কথা বলেন তার কতক অংশ কোনদিনই ভুলতে পারব না। স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে রয়েছে ঃ— "যে ভাবে হোক এই বিদেশী শাসন অপসারিত কর— আমি এমনকি হিংসামূলক কাজও অনুমোদন করব, কিন্তু আমার মূলনীতি অহিংসা। ভারতবর্ষকে আমার এই পরম বাণী দেওয়ার আছে যে, অহিংস অসহযোগের দ্বারা স্বরাজ লাভ সম্ভব। যদি কেউ আমাকে বুঝাতে পারেন যে তিনি হিংসার পথে স্বরাজ আনতে পারবেন তবে আমি হিমালয়ে চলে যাব।" এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন যে, হিংসা ও ভারুতার মধ্যে যদি বেছে নিতে হয় তবে তিনি হিংসাকে বেছে নেবেন। এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হবে এ কথা খুব দৃঢ়ভাবে বলেন। আমি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করি। তখন তিনি বেশ জোর সহকারে বলেন, "আমার ভগবানে বিশ্বাস আছে, আমার নিজের উপরও বিশ্বাস আছে, আমি তোমাকে বলছি এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হবে।" আমার সন্দেহ অবশ্য দূর হল না। কিন্তু অহিংসা ভীরুতার নামান্তর নয় এবং অহিংসায় বিশ্বাসী লোক নির্ভীক ও তেজস্বী হতে পারে এ ধারণা হল। মনে হল গান্ধীর ভিতরে একটা মহৎ প্রেরণা এসেছে, যার ফল দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে। গান্ধী আমার সন্দিগ্ধভাব বুঝলেন। বিদায় নেওয়ায় পূর্বে বললেন 'আমার অভিন্নহৃদয় মহাদেবকে (মহাদেব দেশাইকে) চিঠি লিখো।' মহাদেব ভাই তখন তাঁর সেক্রেটারী। আমাদের আলাপের সময় সারাক্ষণই উপস্থিত ছিলেন তিনি। ১৯৪২ সালে আগস্ট মাসে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মহাদেব ভাই গান্ধীর সেক্রেটারীর কাজ করেন। গান্ধী-জীবনী লেখবার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি ও গান্ধীর ভাবধারায় সম্পূর্ণরূপে ওতপ্রোত ছিলেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপও হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় গান্ধীর জীবিত কালেই তিনি চলে যান। তাঁর অকালমৃত্যু জাতির পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়েছে। তখন আমি ভারত সরকারের কর্মচারী। সাক্ষাতের পরই মনে মনে সিদ্ধান্ত করি চাকুরী ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার। এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হবে না কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে দেশ স্বাধীনতা লাভের দিকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে বিশ্বাস হল। নাগপুর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে বেশ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিই।

গান্ধী কলিকাতা হতে সোজা যান নাগপুর। এই কংগ্রেসের সভাপতি সি বিজয়রাঘবাচার। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ যমুনালাল বাজাজ। যমুনালালজী আমৃত্যু গান্ধী নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করেছেন। এই কাজে তাঁর ব্যবসায়ী সুলভ প্রখর সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর অকালমৃত্যু দুঃখের বিষয় এবং তা ক্ষতিকরই হয়েছে ভারতের পক্ষে।

নাগপুরে পুরোপুরি গান্ধী নীতির জয় ঘোষিত হয়। অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপন করেন দাশ, আর সমর্থন করেন লাজপত রায়। তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গান্ধী হলেন কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা। কংগ্রেসকে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য এই কংগ্রেসে একটি নূতন গঠনতন্ত্র বা সংবিধানও গৃহীত হয়। এই সংবিধান গান্ধীর রচনা। কংগ্রেসের মূলনীতি পরিবর্তিত হয়ে হয়—'ভারতবাসীদের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বদলে স্বরাজ শব্দ ব্যবহৃত হয়। স্বরাজ শব্দের তিনি এই ব্যাখ্যা করেন, —যদি সম্ভবপর হয় বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থেকে, প্রয়োজন হলে বাইরে গিয়ে। এর কয়েক বৎসর পরে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হয়। বর্তমানে আমরা স্বাধীন। ভারত একটি রিপাব্লিক বা সাধারণতন্ত্র। তথাপি আজও আমরা বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত মূলনীতি স্বীকার করে যে-কোন

প্রাপ্তবয়স্ক (একুশ বা তদূর্ধ্ব বয়সের) ভারতীয় স্ত্রী বা পুরুষ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে বার্ষিক চার আনা চাঁদা দিয়ে কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে। এই কংগ্রেস সভ্যরাই নির্বাচন করবে প্রতিনিধি। প্রত্যেক প্রদেশ হতে লোকসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। মোট সংখ্যা স্থির হল ছয় হাজার, অবশ্য গান্ধী সংখ্যা মাত্র দেড় হাজার করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীর মত গ্রহণ করলে ভালই হত। পূর্বে প্রতিনিধিরা এভাবে নির্বাচিতও হত না, সংখ্যাও নির্দিষ্ট ছিল না। কংগ্রেসের নীতি মেনে প্রতিনিধি ফি দিলেই বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারত। নাগপুরে চোদ্দ হাজারের উপর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। কংগ্রেস অধিবেশনের দুই-তিন দিন পূর্বে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা হওয়া স্থির হল—এই সমিতির মোট সংখ্যা নির্দিষ্ট হল ৩৫০। তারাও হবে প্রত্যেক প্রদেশ হতে লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত। প্রেসিডেণ্ট, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সমেত পনের জন সভ্য নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটী বা কার্যকরী সমিতি গঠনের বিধান রইল। ওয়ার্কিং কমিটী সর্বোচ্চ। কংগ্রেসের সারা বৎসরের কাজ পরিচালনা করবে এই কমিটী। এই কমিটী নির্বাচিত হবে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বারা। কংগ্রেস প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হল ভাষার ভিত্তির উপর। প্রদেশের কাজকর্ম চলবে সেই ভাষায়। সমস্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হবে হিন্দী-হিন্দুস্থানী। ইংরেজীর স্থান তাঁর কাছে ছিল গৌণ।

কংগ্রেস একটি বার্ষিক অধিবেশন মাত্র ছিল পূর্বে। এবার পরিণত হল স্বরাজ লাভের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত সংস্থায়। এইখানেই গান্ধীর রচনাত্মক প্রতিভার সুস্পষ্ট নিদর্শন। তবে এ কথা সত্য যে, কোন সংবিধানই দুষ্ট লোকের হাত হতে তাকে পুরাপুরি রক্ষা করতে পারে না। আসল কথা, লোকের প্রাণে ত্যাগবুদ্ধি, সেবাবুদ্ধি ও ধর্মপ্রেরণা জাগ্রত হলেই সংবিধান ঠিকমত কার্যকরী হতে পারে। গান্ধী তা

বুঝতেন। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিকে অধ্যাত্মময় করা। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নাগপুরে সে অধ্যায়ের সূচনা। এই কংগ্রেসে ক্রমবর্ধমান অসহযোগের প্রস্তাব যেমন গৃহীত হয়, তার সঙ্গে গৃহীত হয় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও খাদি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। শেষোক্ত তিনটি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সফলতার জন্য অপরিহার্য অস্ত্র। যুদ্ধের নৃশংসতা সম্বন্ধে পৃথিবীর অনেক মনীষীই চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় গান্ধীর অহিংস প্রচেষ্টা তাঁদের মনে একটা আশার আলো এনে দিল। পৃথিবীর অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল গান্ধী ও ভারতের দিকে। গান্ধী শুধু ভারতের নেতা নন, তিনি হয়ে উঠলেন আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলন

[লবণ সত্যাগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত]

নাগপুর কংগ্রেসের পর সারা ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব জন-জাগরণ দেখা দিল। গান্ধীর প্রেরণার ছোঁয়াচ লাগল অনেকের প্রাণে। ত্যাগভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মী লেগে গেলেন কাজে। আসমুদ্রহিমাচল প্রচণ্ড আলোড়ন। রাতারাতি মাটি যেন সোনা হয়ে উঠল। এইবারই প্রথম কংগ্রেসে গান্ধীর পরিকল্পনায় চরখা খচিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত এক পতাকা চালু হয়। পরে তার সামান্য পরিবর্তন হয় রঙে। এই পতাকাকে লোকে জাতীয় পতাকা বলে অভিহিত করত।

গান্ধীর সামনে এল এক অফুরন্ত কর্মের সুযোগ। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে অহিংস অসহযোগের বাণী প্রচার আরম্ভ করলেন। বিরামহীন প্রচেষ্টা। বক্তৃতা দিতেন বসে বসে। সৈন্য সংগ্রহের অভিযানের সময়কার গুরুতর অসুখের ফল হয় স্থায়ী। দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে অস্বস্তিবোধ করতেন। যেখানে যান, কি শহর কি গ্রাম, অগণিত জনসমুদ্র। মুখে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি। আলী ভাইদেরও একজন থাকতেন অনেক সময় তাঁর সঙ্গে। তাই জনতা 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলার পর 'আলী ভাই কি জয়'ও বলত। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি করত। এ যেন ভারতের এক নূতন জীবন। কিন্তু গান্ধী সবটাই যুক্তির কষ্টিপাথরে দেখতেন। জয়ধ্বনি, চীৎকার বা উন্মাদনা তাঁকে মোটেই বিভ্রান্ত করতে পারেনি। ডিসেম্বর মাসে সাক্ষাতের সময় বুঝেছিলাম মানুষটিকে খানিকটা। ১৯২১ সালে জানুয়ারী মাসে তিন বার সাক্ষাতে বুঝলাম আরো ভাল করে। আমরা তখন থাকি উত্তর কলিকাতায়। দেশবন্ধুর বাড়ীতে সাক্ষাতের সময়

ভোর ছটা। সেদিন ট্রাম ধর্মঘট। বাস কলিকাতায় তখনও তেমন চালু হয়নি। কাজেই ছয় মাইল হেঁটে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর আসতে দশ মিনিট দেরী হল। এসেই বিলম্বের জন্য মাফ চাইলেন এবং কৈফিয়ৎ দিতে আরম্ভ করলেন কেন দেরী হয়েছে। বললেন "গত রাত্রিতে এমন একটি জায়গায় গিয়েছিলাম যেখানে সবাই 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলে চিৎকার করতে এবং আমার পায়ে পড়তে ব্যস্ত, কিন্তু কেউ আমার কথা শুনতে ইচ্ছুক নয়। আমি নিজের উপরও বীতশ্রদ্ধ হচ্ছিলাম, চার পাশের অন্য সবার উপরও। দাশ ও আমি আলাদা হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে খুঁজছিলেন, আমিও তাঁকে খুঁজছিলাম। শুতে দেরী হয়, উঠতেও দেরী হয়েছে। তাই বিলম্ব।" জীবনে বহু বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। দেরী হলে অনেকে ত কিছুই বলেননি। কেউ কেউ বড়জোর 'বিলম্বের জন্য দুঃখিত' এ কথাটুকু বলেছেন। কেন দেরী হল সে কৈফিয়ৎ কখনো দেননি। সময়ানুবর্তিতা ছিল গান্ধী জীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনি চাইতেন অপরেও সেরূপ সময়ানুবর্তী হোক। ১৯২৫ সাল। তিনি বাংলা সফরে এসেছেন ঢাকা জিলায় এক জায়গায়। আমিও সঙ্গে। উদ্যোক্তারা আমাকে তিনটার সময় তাঁকে জনসভায় নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি ঠিক সেই সময় তাঁকে নিয়ে গিয়েছি। সভায় ঢুকবার মুখে একটা বোর্ডে বাংলায় কিছু লেখা আছে দেখে আমাকে পড়তে বলেন। তা ছিল এই ঃ—'বিরাট সভা, মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা করিবেন। সময় বেলা ১২টা। দলে দলে যোগদান করুন।' তৎক্ষণাৎ ট্যাঁকের ঘড়িটা দেখে বলে উঠলেন 'স্বরাজ সব সময়েই তিন ঘণ্টা পিছিয়ে থাকবে।' অর্থাৎ স্বরাজ কখনই আসবে না। সময়ানুবর্তিতার উপর তিনি এতটা জোর দিতেন।

বেশ দূর থেকে হেঁটে গিয়ে ঠিক সময়ে হয়ত কেউ কেউ নাও পৌছাতে পারেন তাই মহাত্মাজীর সেক্রেটারীকে বলে রেখেছিলাম

যে আমাদের সঙ্গীদের যেন ঢুকতে দেওয়া হয়। হঠাৎ দেখি আমাদের অচেনা অল্প অল্প পাকা চুল এক ভদ্রলোক ঢুকে পড়েছেন। তাঁর দিকে তাকাই। মহাত্মাজী তাকিয়েই বুঝতে পারেন যে তিনি আমাদের সঙ্গী নন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন 'আপনি কি এঁদের সাথী?' 'না স্যার' বলা মাত্রই জবাব দেন 'তবে এখানে কেন এসেছেন?' 'আপনার দর্শনের জন্য'। শুনে একটু কঠোরভাবেই বলেন 'আপনার কাজ ত হয়ে গিয়েছে, চলে যান।' শুধু সময়ানুবর্তিতা ছিল না, যাকে বা যাদের যে সময় দিতেন সে সময়টা তাদের জন্যই রাখতেন। সে সময় অন্য কারো আসা পছন্দ করতেন না। অবশ্য শেষ জীবনে এ নিয়ম খানিকটা শিথিল করেছিলেন। এ কথা স্বীকার করি যে এ নিয়ম খুবই ভাল।

এদিনকার আলাপ হতে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, লোকজন 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি করছে তার পেছনে তাঁর মত অনুসরণ করার প্রবৃত্তি ততটা ছিল না যতটা ছিল খুব অল্প আয়াসে পুণ্য লাভ—এ কথা তিনি বেশ উপলব্ধি করছেন। লোকজনের একটা ধারণা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী ঐশী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা অবতার। তাই তাঁর পেছনে ছুটত, তাঁকে দর্শন করে, তাঁর পদস্পর্শ করে পুণ্য বা মোক্ষলাভ হবে এ কথাও ভাবত। ভারতবর্ষে মানুষকে দেবতারূপে দাঁড় করিয়ে তাঁর পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে সহজে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল। তাঁর কথা শুনবার বা পালন করবার আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই গৌণ। জনতার অধিকাংশের অন্তরে হিন্দু-মুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, খদ্দর পরিধান, এমনকি ইংরেজ শাসনের অবলুপ্তির কথাও ততটা ছিল না। এক কথায় ফাঁকি দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা। কিন্তু তা হয় না, হতে পারে না। এরূপ ইচ্ছা উদ্দেশ্য লাভের প্রবল অন্তরায়। এক বৎসরে স্বরাজ লাভের এই হয়েছিল প্রবল বাধা। আপাতদৃষ্টিতে এই উন্মাদনাকে অনেকে শক্তির উৎস বলে মনে করলেও আমার নিশ্চিত ধারণা, এই জন্যই

স্বরাজ লাভ পিছিয়ে গিয়েছিল এবং মহাত্মাজীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। এই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে বরিশালের এক জনসভায় 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি সম্বন্ধে বলেন, "যখনই আমি 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি শুনি ওই বাক্যের প্রতিটি আওয়াজ আমার অন্তরে তীরের ন্যায় বিদ্ধ হয়। যদি এক মুহূর্তের জন্যও বুঝতাম যে এই চীৎকারের ফলে স্বরাজ লাভ হবে তা হলে আমি আমার দুর্ভাগ্যকে বরদাস্ত করতাম। কিন্তু যখন দেখি লোকজনের সময় ও শক্তি এই নিরর্থক চীৎকারে নষ্ট হচ্ছে অথচ সত্যিকারের কাজকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে তখনি ইচ্ছা হয় তারা আমার নাম চীৎকার না করে একটি চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করুক যেন আমি তার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আমার অন্তর যে আগুনে দগ্ধ করছে তাকে চিরকালের জন্য নির্বাপিত করতে পারি।" তিনি এ কথাও লিখেছিলেন যে, তাঁকে অবতাররূপে প্রচার করার চেষ্টা স্বরাজ লাভের অন্তরায়। তাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভক্তরা তাঁকে অবতাররূপে দাঁড় করাতই। রক্ষা, তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদ্। তাই অবতার হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। তথাপি যুগে যুগে ভারতবর্ষে যা ঘটেছে মহাত্মাজীর বেলায় খানিক পরিমাণে তা ঘটেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে হয়েছিল। হায় রে অন্ধ ভক্তি! মানুষকে ভগবানরূপে দাঁড় করানো প্রগতির পরিপন্থী। ভারতবর্ষ আজও তা উপলব্ধি করেনি। চোখের সামনে সে অভিনয় দেখছি। এর ঘোর প্রতিবাদ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব—

"প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিও॥"
"যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম।"

দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। জানি না কবে আমরা এর হাত হতে ত্রাণ পাব।

আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে তার মূলনীতি ও নিয়মাবলীর মুসাবিদা করে যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এবার আমাদের মুখপাত্র ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা আশ্রমের নাম রেখেছিলাম 'সবিতা আশ্রম'। মহাত্মাজী সবটা পড়ে প্রথমেই নাম সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি জানালেন। বললেন "যদিও তোমাদের মনে এরূপ ধারণা নেই তথাপি এরূপ অর্থ হওয়া সম্ভব যে, সবিতা বা সূর্য পৃথিবীর কাছে যেমন তোমাদের আশ্রমও তেমন। তাঁর আপত্তি মেনে আমরা 'সবিতা' নাম বাদ দিতে রাজী হই। আমাদের প্রতিজ্ঞা সমূহের মধ্যে 'অভয়' প্রতিজ্ঞা ছিল প্রথম। তাই তিনি 'অভয় আশ্রম' নাম রাখার প্রস্তাব করেন। ভারতবর্ষের পক্ষে 'অভীঃ' বা নির্ভীকতা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাঁর বক্তব্য হতে এ কথা স্পষ্ট মনে হল। আমরা মূলনীতি রেখেছিলাম 'দেশসেবার ভিতর দিয়ে আত্মোপলব্ধি'। তিনি তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন 'দেশসেবা মানে ভগবান ও সত্যের সেবা এবং অন্যের প্রতি কোন অনিষ্ট সাধন না করা'। বুঝতে পারলাম সংকীর্ণ রাজনীতি তাঁর মধ্যে নেই। খুঁটিনাটি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সবই আমাদের কল্যাণবুদ্ধিতে। বুঝলাম তিনি কোন জিনিসই ভাসাভাসা-ভাবে দেখেন না। গভীরে প্রবেশ করেন। সেদিন শেষ কথা আমাদের বললেন "যে কাজে হাত দেবে তাতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করো, বহু কাজে হাত দিয়ে শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা ব্রহ্মচর্য বিরোধী।" তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও সে সংযম রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে যখন আসামে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হয় এবং তাঁকে সেখানে যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ আসে তখন তিনি এ বিষয়ে লিখেছিলেন "বেজওয়াদা কার্যক্রম পুরা করার ভেতর দিয়েই আমি আসামের শ্রমিকদের সেবা করছি"। যখন যে কাজ সামনে আসে হাতের কাজ ফেলে দিয়ে তাতে লাফিয়ে পড়া শুধু অসংযমের পরিচয় নয়, কর্ম নষ্ট করারও উৎকৃষ্ট উপায়।

আর এক দিন বসে আলাপ করছি। শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এলেন। 'সার্ভেন্ট' কাগজ পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। এস আর বোমানজি বসেছিলেন কাছে। তাঁকে দেখিয়ে বলেন 'বোমানজিকে বলুন, ধনীলোকের ধনীলোক বললে টাকা সহজে বের করে।' এর পেছনে ছিল মহাত্মাজীর এক তিক্ত অভিজ্ঞতা।

১৯২১ সালের প্রথম তিন মাস অর্থাৎ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর প্রথম তিন মাস তিনি আইন আদালত, স্কুল কলেজ প্রভৃতি বর্জনের উপরই বিশেষ জোর দেন। স্কুল কলেজ বর্জন ব্যাপারে আসে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিরোধিতা। ছাত্ররা কিসের জন্য ত্যাগ করবে? পূর্ণতর কোন শিক্ষার জন্য নয়, অশিক্ষার জন্য—এই প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের। কবি সমর্থন করেননি, কিন্তু আমার যতদূর খবর, তাঁর বড়দাদা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মাজীকে পুরাপুরি সমর্থন করেছিলেন। কবি এখানে ভুল করেছিলেন বলেই মনে হয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিকে অনেক সময় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। মহাত্মাজী কবির প্রতিবাদ মেনে নিতে পারেননি, তবে ভাল করে না বুঝে শুধু ভাবপ্রবণতা বা হুজুগের বশবর্তী হয়ে স্কুল কলেজ ত্যাগ করাটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি এ কথা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় শিক্ষায়তন বর্জনের আন্দোলন খুব জোর ধরে। কিন্তু তিনি তার মধ্যে ভাব প্রবণতার আতিশয্য লক্ষ্য করেন। তাই কলিকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন) উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তিনি প্রথমেই বলেন "আমার জীবনে কখনো আজকের মত এত ভয় ও চিন্তাভারাক্রান্ত হইনি।" পাটনা, কাশী, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও জাতীয় বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। ছাত্রদের মধ্য হতে একদল দেশসেবকও বেরিয়ে আসে। ভারতবর্ষে অন্য কোন আন্দোলনে এত ত্যাগী কর্মী

জোটেনি। এই কর্মীদের সঙ্গে মহাত্মাজীর প্রাণের একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি হয়ে উঠেন তাদের পিতৃস্থানীয়।

একটি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত ও মর্মাহত হন। কটকে মহাত্মাজীর বক্তৃতার সময় একজন ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী তাঁকে বলেন 'রামমোহন, তিলক ও আপনি ত ইংরেজী শিক্ষারই ফল।' উত্তরে মহাত্মাজী বলেন, 'আমার মত অতি নগণ্য ব্যক্তির কথা ছেড়ে দিন।' তাঁর মতে শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতির তুলনায় রামমোহন ও তিলক নগণ্য ছিলেন। জনগণের উপর প্রথমোক্তদের প্রভাব ছিল অনেক বেশী। 'রামমোহন নগণ্য' এই উক্তি কবির মর্মে আঘাত দেয়। আমার মনে হয় মহাত্মাজীর আসল বক্তব্য ছিল এই যে, জনগণের ভাষায় তাদের বুঝবার মত করে বললে তাদের উপর প্রভাব বেশী হয়। কিন্তু তিনি যেভাবে তা ব্যক্ত করেছিলেন তা হয়েছিল স্থূল। কবির মর্মাহত হওয়ার ন্যায্য কারণ ছিল। কিন্তু কটকে যে ভদ্রলোক ওই কথা তুলেছিলেন তাঁর যুক্তি অসার। রামমোহন, তিলক ও গান্ধী কেউই ইংরেজী শিক্ষার ফল নন। তিনজনেই ভারতীয় কৃষ্টির অমৃতধারায় সিঞ্চিত। রামমোহন ছিলেন উপনিষদের ভাবধারায় ওতপ্রোত। সেখানেই তাঁর ভিত্তি। তিনি ইংরেজী জানতেন বটে। ইংরেজী সাহিত্যের ভাল দিকটা গ্রহণও করেছিলেন। তিনি ত পার্শীও জানতেন। কই, তাঁকে ত কেউ পার্শী শিক্ষার ফল বলেন না! মুসলমান রাজত্ব থাকলে হয়ত তাই বলা হত। এইখানেই আমাদের দুর্বলতা। তিলক পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তিনখানা বিখ্যাত পুস্তক— (১) বেদে উত্তরমেরুতে বাসস্থান, (২) কালপুরুষ ও (৩) গীতারহস্য। তিনখানিই ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে লিখিত। মহাত্মা গান্ধীও ছিলেন ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির আকণ্ঠ সেবী। আর এই তিনজনের একজনও নগণ্য ব্যক্তি নন। ভারত ইতিহাসে এই তিনজনেরই বিশিষ্ট স্থান আছে। কারো কথার বা মতবাদের প্রভাব জনগণের মনে কতটা হয়েছে এ মাপ-

কাঠিতে মতবাদের গুণাগুণ বা সেই ব্যক্তির বৃহত্ব বা নগণ্যতা বিচার করাও যুক্তিযুক্ত নয়। কোন মহান্ ব্যক্তিকে কোন শিক্ষার ফল বলা মস্ত বড় ভুল। পৃথিবীর বহু দেশেই কোন না কোন সময় বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁরা প্রচলিত শিক্ষার ফল স্বরূপ বলা ভুল। ম্যালেরিয়ার দেশে কুস্তিগির দেখে তাকে ম্যালেরিয়ার ফল বললে হাস্যাস্পদই হতে হয়। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, কুশিক্ষা সত্ত্বেও তার প্রভাব মুক্ত হয়ে বড় হতে পেরেছেন অল্পসংখ্যক লোক।

মহাত্মাজীর আন্দোলন ছিল অহিংস অসহযোগ। তিনি অহিংসার উপর খুব জোর দিতেন। এই আন্দোলনে তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী। মৌলানার একটি বক্তৃতা হিংসামূলক কাজের প্ররোচনাকর। এ কথা সাক্ষাতের সময় ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিডিং মহাত্মাজীকে বলেন। প্রকাশিত বক্তৃতার ওরূপ ব্যাখ্যা হতে পারে এ কথা উপলব্ধি করে মহাত্মাজী যথাবিহিত করতে মৌলানা সাহেবকে অনুরোধ করেন। মৌলানা এক বিবৃতি দিয়ে এ কথা বলেন যে, কোন হিংসামূলক কাজে প্ররোচনা দেওয়া তাঁর মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। এ কাজ খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল। মহাত্মাজী ও মৌলানা দুই জনেরই সত্যনিষ্ঠা ও অহিংসার বিচ্যুতি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে ঐকান্তিকতার জন্যই এ সৎসাহস তাঁরা দেখাতে পেরেছিলেন। আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে মৌলানা এরূপ করেছেন এবং মহাত্মাজীও সহকর্মীর প্রতি মমতাবশতঃ এরূপ করতে বলেছেন এরূপ গুঞ্জন যে না হয়েছিল তা নয়। ভুল ত্রুটী মানুষের হতেই পারে, তা স্বীকার করার মধ্যেই মহত্ব। মৌলানা যে সে সৎসাহস দেখাতে পেরেছিলেন সেজন্য তিনি প্রশংসার্হ। লর্ড রিডিংকেও ধন্যবাদ দিই মৌলানাকে সে সুযোগ দেওয়ার জন্য।

মহাত্মাজী গৌহাটীতে প্রকাশ্য সভায় নিজের ভুল স্বীকার করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। ১৯০৯ সালে লিখিত 'হিন্দ্ স্বরাজ' নামক পুস্তকে তিনি অহমিয়াদের কৃষ্টির মান নীচুস্তরের বলে উল্লেখ

করেন। অনেক শিক্ষিত অহমিয়া সে সম্বন্ধে তাঁকে চিঠি লেখেন। উত্তর দেন তিনি জনসভায়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ড হতে দক্ষিণ আফ্রিকা আসার সময় তিনি ওই পুস্তক লেখেন। ইংরেজদের লিখিত পুস্তকে আসাম সম্বন্ধে যে তথ্য তিনি পেয়েছিলেন তার উপর নির্ভর করেই সে কথা লিখেছিলেন। আসামে আসার পর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে বুঝতে পেরেছেন যে সে তথ্য ভুল। অকপটে ত্রুটী স্বীকার করেন।

আন্দোলনের তিন মাস শেষ হওয়ার পর ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি বেজওয়াদায় (১) তিলক স্বরাজ ফণ্ডে এক কোটি টাকা সংগ্রহ, (২) এক কোটি লোককে কংগ্রেস সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা ও (৩) কুড়ি লক্ষ চরখা চালু করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই কার্যক্রম ৩০শে জুনের মধ্যে সমাধা করতে হবে। উহা বেজওয়াদা কার্যক্রম বলে সুপরিচিত। মহাত্মাজী সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন এ কাজে। জুন মাসের মধ্যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। কুড়ি লক্ষ চরখাও চালু হয়। কিন্তু এক কোটি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয় না। বেজওয়াদা কার্যক্রমের এই সাফল্য লোকের প্রাণে আরো সাড়া জাগায়। এক কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকাই সংগৃহীত হয় বোম্বে শহর হতে। বোম্বেবাসীদের অভিনন্দিত করে মহাত্মাজী ইয়ং ইণ্ডিয়ায় 'সুন্দর বোম্বে' আখ্যা দিয়ে এক নিবন্ধ লেখেন। কংগ্রেস সম্পাদক মতিলালজী ছোট্ট প্রদেশ গুজরাটকে পনের লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য অভিনন্দিত করেন। কিন্তু আমার মনে হয় বিহারই সর্বাধিক অভিনন্দনযোগ্য। বিহার বাংলা ও উত্তর প্রদেশের চেয়ে আয়তনে ছোট, অপেক্ষাকৃত গরীব। বিহার বাংলার চেয়ে অধিক, উত্তর প্রদেশের প্রায় ১½ গুণ অর্থ সংগ্রহ করে। বাংলা দেশ নির্দিষ্ট পনের লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পারে। এই সময় বাংলা কংগ্রেসের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও স্টীমার ধর্মঘটে জড়িয়ে

পড়েন। দেশবন্ধু এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করে বিশাল ভরা পদ্মা নদীর উপর দিয়ে নৌকায় গোয়ালন্দ হতে চাঁদপুর যান। কিন্তু মহাত্মাজী সব কথা শুনে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের টাকা ধর্মঘটীদের জন্য ব্যয় করা অনুমোদন করেন না। দেশবন্ধুর বাড়ীতে এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি পক্ষে বিপক্ষে দুই দিকেরই যুক্তি শুনতে থাকেন। মিঃ এণ্ড্রুজ ছিলেন ধর্মঘটের বিপক্ষে। তাঁর নিশ্চিত মত ছিল ধর্মঘট সফল করা যাবে না, কিছু লোকের অশেষ দুর্গতি হবে। তিনি তাঁর বক্তব্য বলছিলেন। তখন ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বাধা দিচ্ছিলেন। মহাত্মাজী সেরূপ করতে নিষেধ করেন। তথাপি তিনি বাধা দিতে থাকেন। মহাত্মাজী তাঁকে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন 'আপনি এরূপ করলে আমি নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলতে বাধ্য হব।' প্রয়োজন মত কঠোর হওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ধর্মঘটীদের জন্য আর তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের টাকা ব্যয় করা ঠিক হবে না মহাত্মাজী এই কথা বলতে বাংলার নেতাগণ তা মেনে নেন।

বেজওয়াদার পরে জুলাই মাসে বোম্বেতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা হয়। এবার জোর দেওয়া হয় বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও খাদি উৎপাদনের উপর। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার মূলে খাদি ধ্বংস ও বিদেশী মিলে প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান। তাই এবার তিনি বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো স্থির করেন। বোম্বেতে বিপুল পরিমাণ বিদেশী বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করা হল। এর পর তিনি যেখানে গিয়েছেন, প্রায় সব জায়গায়ই বিদেশী বস্ত্রের বিরাট অগ্নিযজ্ঞের ব্যবস্থা হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ করে মিঃ এণ্ড্রুজ একটা ঘৃণার ভাব আছে বলে মনে করেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রতীক বিদেশী বস্ত্র। তাকে নিঃশেষ করার মধ্যে কারো প্রতি ঘৃণা নেই, আছে নিজেদের বেঁচে থাকার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র হিংসাভাবও ছিল না। এক দিকে

বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব, অপর দিকে খাদি উৎপাদন ও প্রচলনের চেষ্টা চলল তীব্রভাবে। ক্রমেই মহাত্মাজী খাদির উপর বেশী করে জোর দিতে আরম্ভ করলেন। দেশী মিলের কাপড়ও ব্যবহার না করে খাদি ব্যবহার করতে বলতেন।

এই জুলাই মাসে করাচীতে খিলাফৎ সম্মেলনে মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে তথা সৈন্য বিভাগে কাজে নিযুক্ত থাকা অনুচিত এরূপ একটি প্রস্তাব পাশ হয়; আলী ভাইরা সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। একদল মৌলানা এই প্রস্তাবের অনুকূলে ফতোয়া জারী করেন। ভারত সরকার করাচী প্রস্তাব ও ফতোয়াকে সৈন্যদের আনুগত্যে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। তাই এই সম্পর্কে বিশিষ্ট কয়েকজন মুসলমান নেতা গ্রেপ্তার হন। মৌলানা মহম্মদ আলী মালাবার যাচ্ছিলেন মহাত্মাজীর সঙ্গে। ওয়ালটেয়ার স্টেশনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে এই সব নেতার বিচারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মহাত্মাজা ও মৌলানা মালাবার যাচ্ছিলেন এইজন্য যে, সেখানকার কোন অঞ্চলে মোপলরা বিদ্রোহ করেছিল, এমনকি জোর করে কিছু হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মোপলাদের মধ্যে অহিংসা ও হিন্দু মুসলমানের একতার বাণী প্রচার। মৌলানা ত পূর্বেই গ্রেপ্তার হলেন আর মহাত্মাজীকে মালাবার প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। এই মালাবার বিদ্রোহের জন্য সরকার মহাত্মাজীকেই দায়ী করে। ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। মালাবারের যে অঞ্চলে এই ঘটনা হয় সেখানে কংগ্রেস বা খিলাফৎ আন্দোলনের কোন প্রভাব ছিল না। অসহযোগ বিরোধীরা এ কাজ করে। মোপলারা অন্যায় করেছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল তা নিষ্ঠুরতার চরম এবং যে কোন সরকারের পক্ষে কলঙ্ক স্বরূপ। মোপলা কয়েদীদের গ্রীষ্মকালে মালগাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে না ছিল হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা, না ছিল তাদের জন্য কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা।

তৃষ্ণার যন্ত্রণায় অস্থির। গাড়ী কোন এক বড় স্টেশনে দাঁড়ালে কয়েদীদের চীৎকারে দরজা খোলা হয়। সে এক বীভৎস দৃশ্য! বেশ কিছু কয়েদী মৃত। সিরাজদৌল্লার অন্ধকূপ হত্যা কাল্পনিক। এখানে ঘটল বিংশ শতাব্দীতে সত্যিকারের অন্ধকূপ হত্যা।

এই প্রসঙ্গে মৌলানা হজরত মোহানীর আচরণ খুব নিন্দার্হ। তিনি বল পূর্বক ধর্মান্তরিত করাকে সমর্থন করেন। মহাত্মাজী তাতে দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে লিখলেন, "ধর্মের নামে অধর্মের অনুষ্ঠানই মৌলানা হজরত মোহানীর ধর্মীয় নীতি।" প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীর শান্তি বা মুক্তি নেই এরূপ ভাবা ধর্মান্ধতা। যত গোলমালের সৃষ্টি সেখানেই। হিন্দু খাঁটি হিন্দু হোক, মুসলমান খাঁটি মুসলমান হোক, খৃষ্টান খাঁটি খৃষ্টান হোক,—এ নীতি অবলম্বন করার মধ্যেই নিহিত সাম্প্রদায়িক ঐক্য বা শান্তি। মহাত্মাজী তাই চাইতেন। ধর্মান্ধরা তা ভুলে সমাজে সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা। ওয়ালটেয়ার হতে মাদ্রাজে পৌঁছেই মহাত্মাজী মৌলানা মহম্মদ আলী ও অন্যান্য মুসলমান নেতার গ্রেপ্তারের কারণ জানতে পারেন। তিনি করাচী প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন এবং ৪ঠা অক্টোবর বোম্বেতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় নেতারা সই করে করাচী প্রস্তাবের সমর্থনে এক ঘোষণা পত্র বের করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীও করাচী প্রস্তাব সমর্থন করে। সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জনসভায় করাচী প্রস্তাব সমর্থিত হয়। এ নিছক আইন অমান্য। কিন্তু সরকার এজন্য কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। সরকারের দমননীতি ব্যর্থ হল আর জয় হল ব্যাপক আইন অমান্যের। করাচী প্রস্তাব বহুল প্রচারিতও হল।

এইবার দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের সময় সেপ্টেম্বর মাসেই জনগণের কাপড়ের অভাব জনিত দুঃখের কথা উপলব্ধি করে তিনি হাঁটুর উপর পর্যন্ত ছোট কাপড় পরিহিত হন। গায়েও আর জামা নেই। দরিদ্রের প্রতি দরদের জীবন্ত অভিব্যক্তি। কিন্তু এর

জন্য হলেন তিনি মিঃ চার্চিলের বিদ্রূপের পাত্র। উপাধি পেলেন 'অর্ধনগ্ন ফকির'। ব্রিটিশ শাসন ভারতকে অর্ধনগ্ন করেছে। তাই সে ভারতের প্রতিনিধি 'অর্ধনগ্ন' হওয়াই গৌরবের মনে করলেন। প্রথম যখন তাঁকে এই বেশে দেখে আলাপ করার সুযোগ হয় বলি, "মহাত্মাজী, এরূপ বেশ আপনারই সাজে, আমাদের সাজে না।" তখন মহাত্মাজী বলেন, "তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কি?" আমি হেসে উঠি এবং বলি, "আপনি বুঝবেন না, কিন্তু তফাৎ আছে।"

বৎসর পূর্ণ হওয়ার মাত্র তিন মাস বাকী। মহাত্মাজী স্বরাজ লাভের জন্য আইন অমান্যের পরিকল্পনা করছেন, আর বৃটিশ সরকারও ভারতীয়দের শান্ত করবার জন্য প্রিন্স অব ওয়েলস বা যুবরাজকে ভারতে নিয়ে আসার ঘোষণা করে। ভারতীয়দের রাজানুগত্যের প্রতি ভরসাই এ সিদ্ধান্তের মূলে। কংগ্রেস যুবরাজকে বয়কট করা স্থির করে।

৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় ব্যক্তিগত আইন অমান্য ও সমষ্টিগত বা ব্যাপক আইন অমান্য সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহাত্মাজী, সমর্থন করেন দেশবন্ধু। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিজ্ঞা পত্রের গোড়ায়ই ছিল 'ভগবানের নামে এই শপথ করছি।' অহিংস কর্মীর শক্তির উৎস ভগবানে বিশ্বাস। যে কয়টি প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় তা এই :—'আমি সূতাকাটা জানি, আমি সকল প্রকারের বিদেশী বস্ত্র বর্জন করেছি এবং কেবল মাত্র খাদি পরিধান করি, আমি হিন্দু-মুসলমান একতা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক একতায় বিশ্বাসী, খিলাফৎ ও পাঞ্জাব অন্যায়ের প্রতিকার ও স্বরাজ লাভের জন্য অহিংসা অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করি, আর হিন্দু হলে ব্যক্তিগত জীবনে অস্পৃশ্যতা বর্জন করব।' প্রস্তাবে এ কথাও বলা হয় যে, কোন স্বেচ্ছাসেবক নিজের জন্য বা সে জেলে গেলে তার পরিবারবর্গের ভরনপোষণের জন্য সাধারণের প্রদত্ত টাকা হতে আর্থিক সাহায্য আশা করবে না। এক

কথায় স্বেচ্ছাসেবককে ভগবদ্‌বিশ্বাসী, সংযমী, অহিংস ও ত্যাগী হতে হবে। এই আদর্শ ধরে তুললেন মহাত্মাজী দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য। সমষ্টিগত বা ব্যাপক আইন অমান্যের বেলায় একটি জিলা বা তহশিল (থানা) নিয়ে প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু সে অঞ্চলের অতি অধিক সংখ্যক লোককে সেখানে উৎপন্ন খাদি পরিহিত হতে হবে এবং অসহযোগের আর আর অত্যাবশ্যক সর্ত যথা অহিংসা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদকদ্রব্য বর্জন প্রভৃতিও অধিক সংখ্যক লোক পালন করছে এমন হওয়া চাই। এই সব সর্ত মেনে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সর্ব প্রকারের দুঃখ কষ্ট বরণ বা ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই সব সর্ত পূরণ হলে প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার অধিকার রইল ব্যাপক সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার। তথাপি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সুরাট জিলার বারদৌলি তালুকে যে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হবে তার ফলাফল লক্ষ্য করার জন্য অন্য সব স্থানকে অপেক্ষা করতে বলা হয়।

বারদৌলীতে জমির খাজনা বন্ধের আন্দোলন হওয়ার কথা। ওই অঞ্চলে সোজা সরকারকে খাজনা দেওয়া হত তখনও। দিল্লীতে কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনা। মহাত্মাজী বোম্বে হয়ে ১৮ই নভেম্বর বারদৌলী পেঁছবেন এরূপ স্থির। কিন্তু তার পূর্বের দিন (১৭ই) যুবরাজ বোম্বে আসেন। সেদিন সেখানে হরতাল হয়। হরতাল পালন নিয়ে শোচনীয় দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়। এমনকি দাঙ্গাকারীরা মহাত্মাজীর কথা শুনতেও অস্বীকার করে। মনে হয় এর পেছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। সে পরিকল্পনা ব্যর্থ করার মত প্রভাব তখনও মহাত্মা গান্ধী বা তাঁর সহকর্মীদের হয়নি। অবশেষে মহাত্মাজী পাঁচ দিন উপবাস করার সংকল্প ঘোষণা করেন এবং বোম্বের অধিবাসীদের নিকট শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন করেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকদের প্রচেষ্টায় এবং মহাত্মা গান্ধী সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্শী সম্প্রদায়ের উপরেই শান্তির সর্ত নির্ধারণের ভার দেওয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

কিন্তু বোম্বের মত স্থানের এরূপ হিংসার অভিব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করা চলে না। ২৩শে নভেম্বর হতে বারদোলী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। তা স্থগিত করেন। ঠিকই করেছিলেন। কোন এক জায়গায় এরূপ ব্যাপক আইন অমান্য সফল করতে হলে চারদিকের আবহাওয়া অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। বোম্বেকে পূর্বে তিনি 'সুন্দর বোম্বে' বলে অভিহিত করেছিলেন, এবার তিনি 'গভীর কলঙ্ক' নিবন্ধ লিখলেন।

এদিকে সরকার যুবরাজের ভারত ভ্রমণ সফল করার জন্য বহু প্রদেশে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করে। কিন্তু যুবরাজ যেখানেই গেলেন সেখানেই হরতাল এবং শহরের জনমানবশূন্য দৃশ্য। হাজারে হাজারে লোক বে-আইনী স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করল। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে লালাজী, দেশবন্ধু, মতিলালজী প্রভৃতি কারারুদ্ধ। কিছুদিন পরেই আমেদাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন বসবার কথা। তার নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু। তাঁকে সভাপতি করার জন্য মহাত্মাজী সব প্রদেশে চিঠি পাঠান। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডিসেম্বর মাসেই পুনরায় মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুর মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। অবশ্য মতদ্বৈধ সব সময়েই যে ক্ষতিকর তাও নয়। আর প্রকৃত মতপার্থক্য এবং তা বিদ্বেষহীনভাবে পরিবেশন অনেক সময় অগ্রগতির সহায়ক।

মালব্যজী এই সব গ্রেপ্তারে ব্যথিত হন এবং যুবরাজকে বয়কট করাও পছন্দ করেন না। তাই তিনি একটা আপোষের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। ভাইসরয় তখন কলিকাতায়, তিনি নিজে ১৭ই ডিসেম্বর আসেন সেখানে। শ্রীযমুনাদাস দ্বারকাদাস ও হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে পাঠান আমেদাবাদে মহাত্মাজীর কাছে। মালব্যজী এসে এক দিকে ভাইসরয় ও অপর দিকে প্রেসিডেন্সী জেলে দেশবন্ধু ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করেন। এই দুই নেতা ও ভাইসরয় মালব্যজীর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ১৮ তারিখে দেশবন্ধু ও মৌলানা মহাত্মাজীকে তার করেন—আমরা নিম্ন সর্তে হরতালের আহ্বান

প্রত্যাহার করা অনুমোদন করি: (১) কংগ্রেস উত্থাপিত সমস্ত বিষয়ের বিবেচনার জন্য সরকার শীঘ্রই একটি সম্মেলন (গোল টেবিল বৈঠক) আহ্বান করবে, (২) অধুনা জারী করা সরকারী, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ প্রত্যাহার করবে, (৩) এই নূতন আইনে ধৃত সকল কয়েদীকে বিনাসর্তে মুক্তি দিবে। মহাত্মাজী সেইদিনই তাঁদের নিম্ন তার করেন—"আপনাদের তার। সম্মেলনের তারিখ ও কোন্ কোন্ লোকের দ্বারা তা গঠিত হবে তা পূর্বেই স্থির হওয়া দরকার। করাচী ও ফতোয়া কয়েদীদের মুক্তিও হওয়া চাই। আপনাদের সর্তের উপরি এই দুইটি সর্ত পালিত হলে হরতাল প্রত্যাহার করা যেতে পারে। মহাত্মাজীর এরূপ তার করা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল। আলী ভাইদের জেলে রেখে কোন গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হলে মহাত্মাজীর পক্ষে ঘোরতর অন্যায় হত। গোল টেবিল বৈঠকের সভ্য কে কে হবেন ইত্যাদি পূর্বে ঠিক না হলেও পরে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাতে লাভবান হত সরকার। লালাজী ও মতিলালজী জেল হতে 'ভ্রান্তি-জনক সর্তে' শান্তি স্থাপনের প্রয়াস অনুমোদন করেন না বলে খবর পাঠান।

জাতির এক সন্ধিক্ষণে আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন (ডিসেম্বর, ১৯২১) বসে। মালব্যজী সেখানেও শান্তির ও গোলটেবিল বৈঠকের কথা উঠান। মহাত্মাজী দৃঢ়কণ্ঠে বলেন "আমি শান্তিকামী লোক, কিন্তু আমি কবরের বা শ্মশানের শান্তি চাই না।" বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে শান্তি প্রস্তাবের কথা উঠান মালব্যজী। মহাত্মাজী শুধু নেতাদের সঙ্গে যে সব তার বিনিময় হয়েছিল তা পড়ে দেন। মালব্যজী মোটে একজন সভ্যের সমর্থন পান। অতএব মহাত্মাজী কয়েকদিন পূর্বে দেশবন্ধু, মৌলানা আজাদ ও মালব্যজীর প্রস্তাব সম্বন্ধে যে মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন তা কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে।

তাঁর নেতৃত্বে বারদৌলীতে ব্যাপক আইন আমান্য আন্দোলন আরম্ভ হবে তা এক প্রকার সুনিশ্চিত। স্বেচ্ছাসেবকের প্রতিজ্ঞার মধ্যে এ কথাও রইল যে, আমি দেশের জন্য সর্ব প্রকারের ত্যাগ স্বীকার যথা কারাবরণ এমনকি মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত আছি। সব দিকেই একটা দৃঢ় সংকল্প।

আমেদাবাদে মহাত্মাজী কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত হন। প্রয়োজন বোধে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবেন। কিন্তু সরকারের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া করার অধিকারী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি। অবশ্য মহাত্মাজী প্রদত্ত ক্ষমতা মোটেই প্রয়োগ করেননি।

বার বার আন্দোলন স্থগিত করা অসুবিধাজনক বুঝেও মালব্যজী ও জিন্না সাহেবের অনুরোধে পুনরায় চোদ্দ দিনের জন্য বারদৌলী আন্দোলন স্থগিত করেন মহাত্মাজী। অবশ্য ভাইসরয় আপোষপন্থী এই দুই নেতার কথায় বড় একটা গা করেন না। অবশেষে মহাত্মাজী ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ ভাইসরয়কে এক চরম পত্র পাঠান। ১১ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সরকার ভারতের দাবী পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আন্দোলন স্থগিত করার পরামর্শ দিবেন এ কথা ছিল তাতে। ভাইসরয় ১১ তারিখের পূর্বেই দাবী অগ্রাহ্য করেন। মহাত্মাজী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত। তাঁর মনে খুব উৎসাহ।

মানুষ ইচ্ছা করে এক, কিন্তু হয়ে যায় অন্যরূপ। ৮ই তারিখ ভোরে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জিলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে ২১ জন পুলিশকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার খবর পড়ে মহাত্মাজী হতভম্ব হয়ে যান। এর পূর্বেও অনেক বিশৃঙ্খলার খবর নানা জায়গা হতে আসছিল। ভেবেছিলেন হয়ত শোধরানো যাবে। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনা তাঁকে হতবাক্ করে দিল। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হল এই জন্য যে, এই নৃশংস কাণ্ডের সঙ্গে কংগ্রেস ও খিলাফতের লোকেরা জড়িত ছিল। মালাবার মোপলাদের হিংসাত্মক কাজের জন্য তিনি আন্দোলন

স্থগিত করার কথা ভাবেননি, কিন্তু কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্মীরা জড়িত থাকায় আন্দোলন বন্ধ করা স্থির করলেন এবং বারদৌলীতে ওয়ার্কিং কমিটীর জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন। ওয়ার্কিং কমিটী বারদৌলী বা অন্য জায়গায় ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা স্থির করে। যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত অহিংস আবহাওয়া সৃষ্টি না হচ্ছে, আন্দোলন আরম্ভ করা হবে না। কারাবরণের জন্য বিশেষভাবে যে সব কার্যক্রম স্থির করা হয়েছিল সে সব বন্ধ করার এবং গঠনমূলক কাজে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। এই প্রস্তাব বারদৌলী প্রস্তাব নামে বিখ্যাত। মর্যাদাবোধ মহাত্মাজীকে পথ নির্ধারণে বাধা দেয়নি। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ভাইসরয়কে চরম পত্র দিয়ে এভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে খুব কম লোকেই পারতেন। এইখানেই মহাত্মাজীর বিশেষত্ব।

ওয়ার্কিং কমিটী ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা আহ্বান করে। বারদৌলী প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর একদল লোকের কাছ থেকে আসে বিরোধিতা। তাদের যুক্তি, কোথায় বারদৌলী আর কোথায় চৌরিচৌরা! চৌরিচৌরার অপকর্মের জন্য বারদৌলীর আন্দোলন স্থগিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এত বড় বিশাল দেশ ভারতবর্ষ, সে দেশে কোন জায়গায় কোন হিংসাত্মক কার্য হবে না এরূপ আশা করা ভুল। সেরূপ অবস্থা কখনো হবে না. আইন অমান্য কখনো করা যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে এ কথা যুক্তিযুক্ত মনে হলেও নিতান্ত অসার। চৌরীচৌরার মত নৃশংস কাণ্ডের সঙ্গে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্মী জড়িত থাকে কেন এ কথা ভাবা দরকার। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং কর্মীদের অহিংসায় বিশ্বাস খুব ভাসা-ভাসা বলেই সত্যিকারের অহিংসার ভাব জাগ্রত হয়নি। এটাই আসল জিনিস। তা উপলব্ধি করেছিলেন মহাত্মাজী। এ অবস্থায় ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করলে পরিণাম অশুভই হত। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পূর্বে সমস্ত

প্রদেশের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মহাত্মাজী মিলিত হন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধমতালম্বীদের কথাই বিশেষ ভাবে শোনেন। সব কথা শুনে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। উত্তর প্রদেশের একজন সভ্য ত বলেন 'মহাত্মাজী, বৃটিশ গবর্নমেণ্টও আমাদের কথা শোনে না, আপনিও শুনছেন না। এই সরকারের সঙ্গে আপনার তফাৎ কি!' মহাত্মাজী হাসতে হাসতে বলেন 'তফাৎ হচ্ছে এই যে, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ইস্তফা দিতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু আমি প্রস্তুত।'

মতিলালজী ও লালাজী তখন জেলে। তাঁরা দুজনেই বারদৌলী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে গোপনে জেল হতে চিঠি পাঠান। উভয়েই অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, এ চিঠি অন্যকে দেখানো মহাত্মাজীর উপর নির্ভর। তিনি দুখানা চিঠিই আদ্যোপান্ত পড়ে শুনান প্রতিনিধিদের সভায়। পড়া শেষ হলে শুধু এই মন্তব্য করেন "এঁরা জেলে। সব তথ্য এঁদের কাছে নেই। থাকলে হয়ত তাঁরা অন্যরূপ মত দিতেন। অতএব এঁদের মতের বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া ঠিক হবে না।" জেলের বাইরে এসে দুজনেই অন্যরূপ মত দিয়েছিলেন। মতিলালজী জেল থেকে বেরিয়ে এসেই লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় বলেন, "আমি জেলে থাকা অবস্থায় বারদৌলী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন ওই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করে জেল থেকে গোপনে একটা চিঠি পাঠাই। কিন্তু যখন লক্ষ্ণৌ জেলে এলাম তখন বুঝলাম যে আমি একদল উচ্ছৃঙ্খল লোকের দলপতি। কোন সেনাপতি যখন দেখতে পান যে তিনি একদল উচ্ছৃঙ্খল লোকের প্রধান, তখন তাঁকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতেই হয়। মহাত্মাজী বারদৌলীতে তা-ই করেছিলেন।" লক্ষ্ণৌ সভার সময় মহাত্মাজী জেলে। তাঁর মুক্তির পর যখন তাঁকে এ কথা জানাই তখন তিনি বলেন, "কারামুক্তির পর লালাজীও বারদৌলী প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।"

দিল্লীতে সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা আসে মহারাষ্ট্রের নেতাদের

কাছ থেকে। ডাঃ মুঞ্জে অতি তিক্ত ও ঝাঁজালো ভাষায় মহাত্মাজীর নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রের এই সব নেতা কখনো অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব মনে প্রাণে সমর্থন করেননি। এঁদেরই এক নেতাকে একবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় বলতে শুনি "তিলক মহারাজ বলতেন 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ', গান্ধী মহারাজ বলছেন 'শঠেঽপি সত্যং সমাচরেৎ'—ইহা পৃথিবীতে কখনো সম্ভব নয়।" এঁরা বরাবরই গান্ধী নীতির বিরোধী। মহাত্মাজীর পক্ষে বহুমত, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহ্যতঃ মেনে চলেছেন মাত্র। সুবিধামত নিজেদের মতের অভিব্যক্তি দিতেন। এইবার সুযোগ বুঝে খোলাখুলি গান্ধী-বিরোধিতায় নামেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও মার্জিত ভাষায় মহাত্মাজীর নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটা দুঃখের এই জন্য যে, তার পূর্বের দিন রাত্রিতে আমরা বাংলার প্রতিনিধিরা দুইটি সংশোধনের কথা বলি এবং তা গ্রহণ করলে আর আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না জানাই। মহাত্মাজী তা গ্রহণ করেন। সেনগুপ্তও ছিলেন এই কথার মধ্যে। তথাপি তিনি কেন ওরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন তা আজও দুর্বোধ্য। তবে সুখের কথা এই যে, বাংলার সভ্যদের অধিকাংশ শ্রীসেনগুপ্তের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই সভায় খানিক সময় হাকিমজীর অনুপস্থিতিতে মহাত্মাজী সভাপতিরূপে কাজ করেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবের পক্ষের লোকদের বক্তৃতা না দিতে অনুরোধ করেন। তা রক্ষিত হয়। ডাঃ মুঞ্জে ও শ্রীসেনগুপ্তের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়।

কিন্তু এর ফল হল এই যে, সরকার ভাবল মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করার এই প্রকৃষ্ট সময়। আকাশে বাতাসে তাঁর গ্রেপ্তারের গুজব। তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়ায় 'আমাকে যদি গ্রেপ্তার করা হয়' এই নাম দিয়ে নিবন্ধ লেখেন। তাতে তাঁর গ্রেপ্তারের পর কোন প্রকারের হরতাল, মিছিল বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন। লোকজনকে সম্পূর্ণ অহিংস থাকতে এবং গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে

উপদেশ দেন। ১০ই মার্চ, ১৯২২ তারিখ রাত্রিতে সবরমতী আশ্রমে মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হন। তিনি খুব খুশী। লোকজন তাঁর পূর্ব নির্দেশ মত যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেয়। এই সংযমের অপব্যাখ্যা করে আর্ল উইণ্টারটন বলেন 'তাঁর গ্রেপ্তারের পর ভারতে একটি কুকুরও ঘেউ ঘেউ করেনি'। অহিংসার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ উক্তি স্বাভাবিক। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী জনগণের সংযমের প্রশংসা করে। ১৯১৯ সালের ৮ই এপ্রিল তাঁর গ্রেপ্তারের পর লোকজন অনেক স্থানে পাগল হয়েছিল, এবার শান্ত থাকায় মহাত্মাজীও খুশী।

ইয়ং ইণ্ডিয়ার তিনটি প্রবন্ধের জন্য মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ রাজদ্রোহের। তিনি নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেন এবং লিখিত বিবৃতি দেন। তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "এই গবর্নমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া আমি একটি গুণ বলেই মনে করি, কারণ মোটের উপর ইহা পূর্ববর্তী যে কোন সরকারের চেয়ে ভারতের অধিকতর ক্ষতি সাধন করেছে। যার এরূপ বিশ্বাস তার পক্ষে এই সরকারের প্রতি কোন অনুরক্তি থাকা পাপ।" তিনি সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য আবেদন করেন। জজ তাঁকে ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে বলেন "আমার জীবনে আপনার মত লোকের বিচার করিনি, ভবিষ্যতেও করব না। আপনি অপরাধ স্বীকার করেছেন। আপনাকে যদি তিলকের শ্রেণীভুক্ত করি তা হলে আমার মনে হয় আপনি তা অযৌক্তিক মনে করবেন না। যদি ভারতবর্ষে অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ছয় বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই আপনি মুক্তি পান তা হলে আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবে না।" মহাত্মাজী হাসিমুখে বললেন, "লোকমান্য তিলকের সঙ্গে আমার নাম জড়িত হওয়ায় আমি শ্রেষ্ঠ সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হলাম।" বিচারক এবং দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী উভয়ের সৌজন্যপূর্ণ আচরণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

অবশেষে আন্দোলনের নেতা কারাগারে। এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হল না। কবে হবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে ভিত্তি স্থাপিত হল।

ইয়ং ইণ্ডিয়ার মুদ্রক ও প্রকাশক হিসাবে শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কারেরও এক সঙ্গে সাজা হয় দেড় বৎসরের। তাঁর শরীর খুব সুস্থ ছিল না। স্নায়ুরোগ। দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে তিনি এই রোগের দরুন একেবারে কাজের বাইরে চলে গিয়েছেন। তাঁর মত চটপটে, কর্মকুশল ও বুদ্ধিমান লোক সাধারণের কাজে খুব কম সংখ্যক দেখেছি। মহাত্মাজী ও ব্যাঙ্কার দুজনকেই নিয়ে যায় পুনার নিকটবর্তী যারবাদা জেলে। সেখানে তিনি ব্যাঙ্কারকে তাঁর কাছে রাখার কথা বলেন, যেন অসুস্থ মানুষটিকে একটু দেখাশোনা করতে পারেন। জেল কর্তৃপক্ষ সে কথা গ্রাহ্য করে না। মহাত্মাজী প্রাণে ব্যথা পান। রোগীর সেবা মহাত্মাজীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এক দিকে তিনি যেমন কঠোর ছিলেন অন্য দিকে তাঁর মধ্যে মাতৃসুলভ কোমল ভাবও ছিল যথেষ্ট। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা এখানে বলতে চাই। একদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে আমি একটি জেলের ব্যবস্থা সর্বাধিক ভাল বলি—যদিও ত্রুটী ঢের আছে। তখন তিনি বলেন 'না, না, যারবাদা জেল সবচেয়ে ভাল।' জিজ্ঞাসা করি 'কি হিসাবে!' অমনিই মহাত্মাজী বলেন 'কারণ আমি সেখানে ছিলাম।' খুব হাসির রোল পড়ে গেল। বিচারাধীন থাকা কালীন তিনি ছিলেন সবরমতী জেলে। সেখানে তাঁকে চরখা রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যারবাদা জেলে তাঁকে চরখা নিতে দেওয়া হয় না। প্রতিদিন চরখায় সূতা কাটা তাঁর ব্রত, এ কথা বললেও কোন ফল হয় না। তাই বাধ্য হয়ে উপবাস করেন। একদিন উপবাসী থাকবার পর তাঁকে চরখা দেওয়া হয়। এই জেলে প্রতিদিন তাঁর শরীর তালাসী নেওয়া হত, তাঁকে কোন রাজনৈতিক কয়েদীর সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না।

এ সব উপরের ইচ্ছা বা অনুমোদন ভিন্ন হয়নি। সরকার শক্তির এই স্থূল প্রদর্শন না করলেই ভাল হত।

তখন ওই জেলে মহারাষ্ট্রের মূলসীপেটা সত্যাগ্রহীরাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহাত্মাজীর বিশেষ অনুরক্ত শঙ্কর রাও দেও ও আন্না সাহেব দাস্তানে। আর জয়রামদাস দৌলতরামও ছিলেন তখন ওই জেলে। জেলের কানুন ভঙ্গ করার জন্য মুলসীপেটা সত্যাগ্রহীদের কাউকে কাউকে বেত মারা হয়। খুব ব্যথিত হন মহাত্মাজী। সত্যাগ্রহীদের অভিযোগ জেল কর্তৃপক্ষের খারাপ ব্যবহার। তাঁরা সবাই অনশন আরম্ভ করেন। মহাত্মাজী খবর পেয়ে জয়রামদাসকে দিয়ে সত্যাগ্রহীদের তাঁর মত জানিয়ে পাঠান। এজন্য জয়রামদাসকে সাজা দেওয়া হয়। সাজা আসলে প্রাপ্য তাঁর নিজের এ কথা মহাত্মাজী জেল কর্তৃপক্ষকে জানান। আর যাতে এ অবস্থার অবসান হতে পারে তজ্জন্য তিনি মুলসীপেটা সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রথমে তা দিতে রাজী হয় না। এক দিকে সত্যাগ্রহীদের অনশন চালিয়ে যাওয়া, অপর দিকে মহাত্মাজীর অনশনের সম্ভাবনা—তাই অবশেষে সে অনুমতি দেওয়া হয়। জেল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার মাধ্যমে একটা আপোষ হয়। কয়েদীরা অনশন ত্যাগ করে। এটাও স্থির হয় যে, কোন জেল কর্মচারীকে আক্রমণ ভিন্ন অন্য কোন অপরাধের জন্য কখনও বেত মারা হবে না।

এর পর থেকে মহাত্মাজীর জেলজীবন সাধারণভাবেই চলতে লাগল। প্রার্থনা, তুলা ধোনা, পাঁজ করা, সূতা কাটা এবং পড়াশুনা করে দিন কাটান তিনি। এখানেও কর্মময় জীবন। অনেক বই পড়েন, তার মধ্যে বেশীরভাগ ধর্মপুস্তক। ছেলেদের জন্য গুজরাটী ভাষায় একখানা পাঠ্য পুস্তকও লেখেন। দুর্ভাগ্য, সেখানা হারিয়ে যায়।

মহাত্মাজাকে ছাগলের দুধ, কমলা লেবু ও কিসমিস দেওয়া হত।

কিন্তু অন্য কোন কয়েদীকে কমলা লেবু ও কিসমিস দেওয়া হত না বলে তিনি তা খাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু এগুলো তাঁর শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ফলে দু বৎসর যেতে না যেতেই জানুয়ারী (১৯২৪) মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৃহৎ অন্ত্রের সংযুক্ত নলের প্রদাহ। একদিন খুব জ্বর উঠে। পুণার সেসুন হাসপাতালের ডাক্তার কর্নেল ম্যাডক এসে তাঁকে নিজ দায়িত্বে সেখানে নিয়ে যান এবং মহাত্মাজীর সম্মতি নিয়ে অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচার চলা সময় হাসপাতালের বৈদ্যুতিক আলো নিভে যায়। হারিকেন ল্যাণ্টার্নের সাহায্যেই কর্ণেল কৃতিত্বের সঙ্গে অস্ত্রোপচার শেষ করেন। মহাত্মাজী বেঁচে যান। তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন অথচ তাঁর জীবন রক্ষা পেল এক ইংরেজ সার্জনের মহৎ হৃদয় ও নিজ বিষয়ে দক্ষতার জন্য। ভাবতেও ভাল লাগে। মহাত্মাজী যখন গোল টেবিল বৈঠকের জন্য বিলাত যান (১৯৩১) তখন কর্নেল ম্যাডক চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করে বিলাতে। মহাত্মাজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

অস্ত্রোপচার হয় ১২ই জানুয়ারী। তার পর একটু সুস্থ হলে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ সালে তাঁকে কারামুক্তি দেওয়া হয়।

ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩ই মার্চ সমুদ্রতীরে বোম্বের নিকটবর্তী জুহু নামক স্থানে যান। এখানকার আবহাওয়ায় শরীর আরো কিছু ভাল হলে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পুনরায় ইয়ং ইণ্ডিয়া ও নবজীবনের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর অনুপস্থিতিতে এই দুই কাগজের প্রচার সংখ্যা কমে যায়। অনেকে স্বাস্থ্যের কারণে তাঁর এ দায়িত্ব নিতে আপত্তি করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, দর্শকের সংখ্যা যদি কমে তিনি সহজেই এ দায়িত্ব বহন করতে পারবেন। কারণ তা হবে তাঁর পক্ষে আনন্দদায়ক কাজ এবং এক হিসাবে মানসিক বিশ্রামের সামিল। বিনা প্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রবৃত্তি আমাদের দেশে ব্যাপক।

তাই তাঁদের অনিবার্য শাস্তি হিসাবে তা মেনে নিতে হয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন।

মহাত্মাজী কারারুদ্ধ হওয়ার পর দুই বৎসর চলে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত। এক দল কাউন্সিল এসেম্বলীতে প্রবেশ করতে চায়। এই দল 'স্বরাজ্য দল' নামে পরিচিত। দেশবন্ধু, মতিলালজী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি এই দলের নেতা। অপর দল মনে করে কাউন্সিল প্রবেশ অসহযোগের সহিত সামঞ্জস্যহীন এবং তার ফল হবে অসহযোগের আবহাওয়ার অবসান। রাজাগোপালাচারি, বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি এই দলের নেতা।

মহাত্মাজী প্রথম ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লেখেন যে, তাঁর কোন নূতন কার্যক্রম নেই, পুরনো কার্যক্রমের উপর অধিকতর না হলেও পূর্বের মত আস্থা বর্তমান। অবশ্য দেশবন্ধু ও মতিলালজীর সঙ্গে আলোচনার পূর্বে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি কোন মত দেননি। সে আলোচনা হয় মে মাসের শেষ ভাগে জুহুতে। আলোচনা শেষে তিনি এক বিবৃতি দেন। দেশবন্ধু ও মতিলালজী পৃথক্ বিবৃতি দেন। মহাত্মাজী এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন যে, তাঁর পরিকল্পিত অসহযোগের সঙ্গে কাউন্সিল প্রবেশ সামঞ্জস্যহীন। তবে তিনি দেশবন্ধু ও মতিলালজীকে তা বুঝাতে পারেননি বলে দুঃখিত। তিনি এ কথাও মনে করেন যে, এই দুই নেতার অভিজ্ঞতা হতে যখন তাঁদের মতের অসারতা উপলব্ধি করবেন তখনই তা পরিত্যাগ করবেন, তার পূর্বে নয়। দুঃখের বিষয় দেশবন্ধু এর এক বৎসর পরেই (জুন, ১৯২৫) মারা যান। মতিলালজী ১৯২৯ সালে স্পষ্ট তাঁদের অনুসৃত নীতির ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেন। দেশবন্ধু জীবিত থাকলে হয়ত আরো পূর্বেই সে ঘোষণা হত।

এর কিছুদিন পরেই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা হওয়ার কথা। কী ভাবে শীঘ্র স্বরাজ লাভ হতে পারে মহাত্মাজী সে কথাই গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে,

আদর্শে বিশ্বাসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের দ্বারাই তা সম্ভবপর। কংগ্রেসকে সেরূপ লোকের একটি সুসংহত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য চারটি প্রস্তাবের নোটিশ দিলেন ঃ—(১) কংগ্রেসের কোন নির্বাচিত কমিটীর সভ্যকে প্রতি মাসে ১০ তোলা নিজ হাতে কাটা সূতা দিতে হবে, (২) যে এই নির্দেশ পালন করবে না তার পদ শূন্য বলে ঘোষণা করা হবে, (৩) যে ব্যক্তিগত জীবনে কংগ্রেসের আদালত, কাউন্সিল প্রভৃতি বয়কট নীতি পালন করবে না সে কোন কমিটীর নির্বাচিত পদাধিকারী হতে পারবে না, (৪) শ্রীগোপীনাথ সাহা কর্তৃক মিঃ ডের হত্যা কংগ্রেসের মূলনীতি ও অহিংস অসহযোগ নীতির বিরোধী। এরূপ কাজ স্বরাজ লাভের দিকে জাতির অগ্রগতির অন্তরায়।

মহাত্মাজী জানতেন স্বরাজ্য দলের পক্ষ হতে এর ঘোর বিরোধিতা হবে, তবু ওই সব প্রস্তাব উপস্থিত করেন এই ভেবে যে, এরূপ আদর্শে বিশ্বাসী লোকের প্রতিষ্ঠানেই তাঁর নেতৃত্ব সম্ভবপর এবং ফলপ্রসূ হতে পারে। তিনি এই প্রস্তাবসমূহকে তাঁর নেতৃত্বের আবেদনের সর্তসমূহ বলে ঘোষণা করেন।

জুন মাসের শেষ ভাগে আমেদাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসে। মতিলালজী কংগ্রেসের সংবিধান বিষয়ক প্রস্তাবকে শুধু বিধিবহির্ভূত বলেন না, মহাত্মাজীকে ইংরেজ সরকারের চেয়েও অধিকতর স্বৈরাচারী বলে ঘোষণা করেন। মহাত্মাজী অবশ্য একটি কটু কথাও বলেন না, তবে নিজ প্রস্তাবে অটল থাকেন। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিকাংশ সভ্য প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত নয় বলে মত দেন। মহাত্মাজী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মতিলালজী, দেশবন্ধু ও তাঁদের সমর্থকরা সভা হতে বেরিয়ে যান। মহাত্মাজী ব্যথিত হলেন। কিন্তু এঁরা চলে গেলে সভায় যে গুরু দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল তার বদলে দেখা দিল এক প্রকার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। অতিশয় ব্যথিত হলেন তিনি। এমনকি তিনি এতটা বিচলিত হয়েছিলেন যে চোখের জল ফেলেন। এরূপটি আর জীবনে কখনো দেখিনি।

তিনি যেভাবে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছিলেন তা যেন ভেঙে গেল। সব কয়টি প্রস্তাবের পক্ষেই অধিকাংশ ভোট পান, কিন্তু সে আধিক্য এত কম যে তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় মনে করলেন। এই অধিবেশনের পর ইয়ং ইণ্ডিয়ায় 'পরাজিত ও অপদস্থ' নামে প্রবন্ধ লিখলেন। সাময়িকভাবে গান্ধীনেতৃত্বের অবসান হল কংগ্রেসে। এক দিকে স্বরাজ্য দলের প্রবল বিরোধিতা, অপর দিকে গান্ধীনীতি অনুগামীদের দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব বশতঃ তিনি উপলব্ধি করলেন যে, স্বরাজ্য দলকে নিজেদের মতানুযায়ী কাজ করার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে এবং অন্য সকলকে গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে সুসংগঠিত করতে হবে। এই ভাবেই হল কংগ্রেসে তাঁর অহিংস নীতির প্রয়োগ। তাঁকে পাঁচ বৎসরেরও উপর ধৈর্য ধরে কাজ করে যেতে হয়, যখন পুনরায় দেশ তাঁর মত ও পথ গ্রহণ করে।

১৯২৪ সাল জাতির জীবনে অন্য দিক দিয়েও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বৎসর ভারতের বহু স্থানে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়। সব চেয়ে দুঃখজনক অবস্থা হয় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের) কোহাটে। মহাত্মাজী এজন্য নিজেকে দায়ী মনে করেন। স্বরাজ লাভের জন্য জনগণের মনে যে চেতনা এসেছে তা কুপথে পরিচালিত হওয়ার ফলেই এরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা। জনগণের মনে চেতনা এনে দেওয়ার মূলে ছিলেন তিনি। তাই তা কুপথে যাওয়ার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করলেন। প্রতিকারের অন্য কোন রাস্তা না পেয়ে একুশ দিনের উপবাস করে প্রায়শ্চিত্ত করা স্থির করেন। সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলীর বাড়ীতে এই উপবাস শুরু হয়। দুর্বল শরীরে এই উপবাস অনেকের মনে খুব চিন্তার কারণ হয়। কিন্তু তিনি ভালভাবেই কঠোর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। তাঁর এই উপবাস বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে।

মে মাসের শেষ ভাগেই তিনি হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে ইয়ং

ইণ্ডিয়ায় প্রবন্ধ লেখেন। কোহাট হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার ভার পড়ে মহাত্মাজী ও মৌলানা সৌকৎ আলীর উপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা একমত হতে পারেননি। সৌকৎ আলী সাহেব আমেদাবাদ রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় নিজেকে মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কোহাট ব্যাপারে হলেন অন্যরূপ। কারো অন্ধভক্ত না হওয়া ভাল, ঘোষণা না করা আরো ভাল।

উপবাস ভঙ্গের মাত্র দু সপ্তাহ যেতে না যেতেই ২৫শে অক্টোবর দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায় প্রভৃতিকে বাংলা সরকার গ্রেপ্তার করে। দেশবন্ধু মহাত্মাজীকে কলিকাতা আসবার জন্য তার করেন। এরূপ গ্রেপ্তারের ফলে মহাত্মাজী খুব বিচলিত হন, এবং শরীর দুর্বল থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা আসেন। এভাবে স্বরাজ্য দল দুর্বল হোক তা তিনি মোটেই চাননি। তিনি সর্বতোভাবে এই দলকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন যেন তাঁরা তাঁদের কার্যক্রমের পুরাপুরি প্রয়োগের সুযোগ পান। তিনি মনে করেছিলেন এই ভাবেই স্বরাজ্য দল তাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন শীঘ্র করতে পারবে এবং পুনরায় সকলে মিলে অহিংস অসহযোগের পথে সংগ্রামে নামতে পারবে।

কলিকাতার আলাপের পরিণতি হল দেশবন্ধু ও মতিলালজীর সঙ্গে তাঁর এক চুক্তি। সেই চুক্তির সবটা তাঁর মনঃপূত ছিল না, তবু তা করলেন। বন্ধুস্থানীয় রাজনৈতিক বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের সঙ্গে এই ভাবে হল তাঁর অহিংসার প্রয়োগ। এ চুক্তি অনেকের পছন্দ হয়নি। স্বরাজ্য দল হল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজের জিম্মেদার আর গঠনমূলক কাজের ভার পড়ল মুখ্যতঃ কংগ্রেসের অপর দলের হাতে, অবশ্য উভয় দলেরই এ কাজে সমর্থন রইল।

এইবার তাঁর কলিকাতা অবস্থান কালে একদিন অনেকের সঙ্গে বসে আলোচনা করছেন। এই সময় শ্রীমদনমোহন বর্মন মহাত্মাজী ও মহাদেব ভাইয়ের জন্য দুখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর আমেদাবাদের টিকেট

এনে দিলেন। টিকেট পেয়েই বললেন 'আপনি ভুল লোকের কাছে এসেছেন।' টিকেট নিতে অস্বীকৃত হবেন ভেবে শ্রীবর্মনের মুখ ত বিষণ্ণ। কিন্তু সেকেণ্ড দশেক পরেই মহাত্মাজী বললেন 'যে ব্যক্তি কোন কিছু দিলে কখনও গ্রহণ করতে অস্বীকার করে না।' ঘরশুদ্ধ একটা হাসির রোল।

গান্ধী-দাশ-নেহেরু চুক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য মহাত্মাজী বেলগাঁও কংগ্রেসের (১৯২৪ ডিসেম্বর) সভাপতি পদ গ্রহণেও স্বীকৃত হলেন। তাঁর নেতৃত্বে হল অসহযোগ নীতি পরিত্যক্ত— পুনরায় প্রায় সকলের সমর্থনে তাকে চালু করবার আশায়। বেলগাঁও কংগ্রেসে তিনি খুব ছোট অভিভাষণ দেন। হিন্দু মুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, খাদি উৎপাদন ও প্রচলন এবং মাদকদ্রব্য বর্জনের উপর জোর দেন তিনি। এই বেলগাঁও কংগ্রেসে গান্ধী-দাশ-নেহেরু চুক্তি সমর্থিত হয়। মতিলালজী এই চুক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাও বলেন 'মহাত্মাজী আমাদের সেনাপতি, সৈন্য হিসাবে আমাদের সেনাপতির কথা শুনে চলা উচিত।' এর প্রতিবাদ করেন লালাজী। তিনি বলেন 'মতিলালজীই প্রথম মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, আজ তাঁর মুখে এ কথা শোভা পায় না।' তিনি এই চুক্তিকে 'অসামঞ্জস্যের গোছা' বলে অভিহিত করেন।

বেলগাঁও কংগ্রেসের পর ১৯২৫ সালে মহাত্মাজী ভারতবর্ষের বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ বিশেষ করে গঠনমূলক কাজকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানে অস্পৃশ্যদের এমনকি প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে পর্যন্ত যাবার অধিকার ছিল না। অহিংস সত্যাগ্রহ করে ভাইকমে তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। মহাত্মাজী পুরাপুরি সমর্থন দেন এ আন্দোলনে।

বাংলা দেশে আসেন মে মাসে।

বেলগাঁও কংগ্রেসের সময় ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরে আমরা কিছু কর্মী যে ভাবে গঠনমূলক কাজ করছি তা বলি। এ কথাও জানাই যে,

তাঁর আমেদাবাদ প্রস্তাবের বহু পূর্বেই আমরা এ নিয়ম করেছিলাম যে অন্ততঃ মাসিক তুই হাজার গজ সূতা না কাটলে কেউ কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না। তিনি ভবিষ্যতে যখন বাংলা দেশে আসবেন তখন তুই দিনের জন্য এই অঞ্চলে আসতে রাজী হন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফরিদপুর বাংলা প্রাদেশিক সম্মিলনে তাঁর আসা স্থির হয়। তখন তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে চিঠি দিই। যিনি তাঁর ভ্রমণ ব্যবস্থা করছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন তারিখ ঠিক করার জন্য। আমি বহু ঘোরাঘুরি করেও ঠিক করতে পারি না কে তাঁর ভ্রমণ ব্যবস্থা করছেন। আমি একটু তুঃখিত ও বিরক্ত হয়ে তাঁকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখি। চিঠি পেয়েই উত্তর দেন 'আমি নিজেই জানি না কে আমার ভ্রমণ ব্যবস্থা করছেন। তোমার মনে যে অনিচ্ছাকৃত ব্যথা দিয়েছি তজ্জন্য ক্ষমা করো। এই সমস্ত ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়েই কত বড় মহান্ ব্যক্তি ছিলেন তিনি তা বুঝতে পারা যায়। এইবারে প্রথম পর্যায়ে বাংলা দেশে প্রায় চল্লিশ দিনের জন্য ভ্রমণ ব্যবস্থা। অনেক স্থানে তাঁর সঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ছোট বড় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁকে আরো নিবিড়ভাবে দেখবার সুযোগ হয়। ফরিদপুর প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতি হিসাবে দেশবন্ধু ইংরেজ সরকারের সহিত কতক সর্তে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে চান। তাতে তাঁর অনুগামীদের একদল বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়। দেশবন্ধু বিব্রত বোধ করেন। মহাত্মাজী তাঁর বোঝা হালকা করতেই চেষ্টা করেন সেখানে।

ফরিদপুর হতে সোজা আসেন ঢাকা জিলায় মালিকান্দা—আমার জন্মস্থান। মালিকান্দা তখন উত্তম খাদি তৈরীর জন্য বাংলায় সুনাম অর্জন করেছে। তাঁকে স্টীমার হতে লঞ্চে নিয়ে আসতে যাই। আমাকে দেখেই বলে উঠেন 'এই যে আমার জেলার।' তিনি যেখানে যেতেন সেখানকার ব্যবস্থাপকদের হাতেই নিজেকে সঁপে দিতেন। অবশ্য ব্যবস্থাপক বেমানান কিছু করলে আইন অমান্য

করতেন। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন সহযোগী, নিতান্ত প্রয়োজনে অসহযোগী।

এর পূর্বের সন্ধ্যায় ভীষণ ঝড়ের কথা বলি, পদ্মা বক্ষে লঞ্চে আমাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেন 'আমি ঝড় খুব পছন্দ করি।' চিরবিপ্লবীর মতই কথা।

মালিকান্দা হতে আরম্ভ করে ফুরশাইল পর্যন্ত দুই দিনের সফরে সব জায়গায়ই হাজারে হাজারে লোক সমবেত হয় কিন্তু কোথাও 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলে চীৎকার ও তাঁর পায়ে পড়বার জন্য চেষ্টা হয়নি। হিন্দুরা হাত জোড় করে নমস্কার ও মুসলমানরা ডান হাত তুলে আদাব দিয়েছে। এতে তিনি খুব খুশী। এ কথা লিখতে গিয়ে তখনকার এ অঞ্চলের কর্মীদের কথা মনে পড়ছে। তাদের সবাই আজ জীবিতও নেই। তাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবের।

মালিকান্দায় আশ্রম হতে আমাদের বাড়ী যান। যাওয়ার পথে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন 'আসা করি তোমার বিয়ের বয়স পার হয়ে গিয়েছে।' তখন আমার বয়স চৌত্রিশ চলছে। উত্তরে বলি 'একটা ঘটনা বলতে পারি কি?' তাঁর সম্মতি পেলে বলি, "......পরিচিত ছিলেন একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি হিসাবে। নিজের গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি যে সোসাইটির সভ্য তার প্রেসিডেন্টের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যান দেশ ছেড়ে।" তক্ষুনি তিনি বলেন "কবর বা শ্মশানে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত নয়।" বুদ্ধিমান এবং যত্নশীল ব্যক্তির মনও দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ হরণ করে গীতার এই বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। আমাদের বাড়ী গিয়ে কোন ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, কোথায় থাকতাম, শুতাম, পড়াশুনা করতাম ইত্যাদি খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করলেন এবং সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন। বুঝলাম অনুগামী ও সহকর্মীদের জন্য অন্তরে কি গভীর ভালবাসা ও দরদ!

ভাগ্যকুলের জমিদারদের পরিচালিত কোম্পানীর একখানা লঞ্চ দিয়েছিলেন তাঁরা মহাত্মাজীর দুই দিনের ব্যবহারের জন্য। অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে জানিয়েছিলাম যদি তাঁরা খানিক সময়ের জন্য মহাত্মাজীকে চান ত সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে কোন সাড়া পাইনি। তাই ভাগ্যকুল মহাত্মাজীর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মালিকান্দা হতে লৌহজং যাওয়ার কথা। আমরা বসে আলাপ করছি। এমন সময় দেখি লঞ্চ ভিড়ে গেল ভাগ্যকুলের রায়দের ঘাটে। সেই বাড়ীর একজন এসে বললেন 'মেয়েরা মহাত্মাজীকে দেখতে চান'। আমি একটু বিরক্ত হই এবং আপত্তি জানাই। বলি যে, আমি ত এখানে কার্যক্রম রাখতে চেয়েছিলাম। তাতে সাড়া না দিয়ে এ ভাবে নিয়ে আসা মহাত্মাজীর পক্ষেও মর্যাদাকর নয়। মহাত্মাজী বলেন "আমার নিজের দেশের লোকের কাছে আমার কোন মর্যাদার প্রশ্ন নেই, চল।"

লৌহজং বিক্রমপুরের কেন্দ্রস্থল। সেখানেই সমস্ত বিক্রমপুরের পক্ষ হতে সাধারণ সভায় তাঁকে মানপত্র ও টাকার তোড়া দিই। মানপত্র ছিল ইংরেজীতে—হাতের তৈরী কাগজে হাতে লেখা। তাতে এ কথাটাও ছিল যে, বেলগাঁও কংগ্রেস প্রস্তাব গঠন-মূলক কাজ ও অসহযোগ আন্দোলনের উপর ঘুম পাড়ানো ঔষধের মত কাজ করেছে। এই মতের জন্য তিনি অসন্তুষ্ট হননি, কারণ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। তবে তিনি নিজ মতে দৃঢ় ছিলেন। অবশ্য মানপত্র ইংরেজীতে লেখা অপছন্দ করেন এ কথা আমাদের জানান। হয় হিন্দী, নয় ত বাংলায় লিখতে বলেন। কিন্তু এদিনকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা অন্য একটি। সেদিন ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পদ্মাবক্ষে লঞ্চের ছাদের উপর শুয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে আমাদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন প্রেমধর্ম সম্বন্ধে। এরূপ ভাবে তাঁকে আমার জীবনে আর কখনো দেখিনি। এ কথাও বললেন, সে ধর্মকে রূপ দেওয়ার জন্যই তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

'এই আশ্রমের সফলতা আমার সফলতা আর ব্যর্থতা আমার ব্যর্থতা।' বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ অভিন্ন এই ভাব ফুঠে উঠল তাঁর কথায়। লৌহজং হতে তার পরের দিন যান বাহেরক ও ফুরশাইল। এখানে মানপত্র প্রভৃতি দেওয়া হয় বাংলায়। তাঁর জবাব হতে বুঝতে পারি যে তিনি বাংলা মানপত্রের সার বুঝেছেন। তাঁর সব দিকেই প্রখর দৃষ্টি ছিল। বাহেরকে কিছু নড়বড়ে ও উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট চরখা চালানো দেখে সঙ্গে সঙ্গেই বলেন যে এরূপ হলে চরখার কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সমস্ত বিক্রমপুরের কর্মীরা ফুরশাইলে এসে সমবেত হয়। লঞ্চে যেতে যেতে তাদের সঙ্গে মহাত্মাজী আলাপ আলোচনা করেন। একজন মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করেন 'আপনি বলছেন চরখায় স্বরাজ। কি করে তা বুঝিয়ে বলুন।' মহাত্মাজী বলেন 'আমি এ পর্যন্ত এ দাবী করিনি যে চরখায়ই স্বরাজ, কিন্তু আজ বলছি চরখায়ই স্বরাজ।' চরখার সফলতার অর্থ জনগণের অর্থ নৈতিক উন্নতি, হিন্দু মুসলমানের একতা ও অস্পৃশ্যতা বর্জন। পরাধীন ভারত সংগঠনের দ্বারা যদি চরখার মারফতে বস্ত্রস্বাবলম্বী হতে পারে তবে যে শক্তি উদ্বুদ্ধ হবে তাতে স্বরাজ লাভ হস্তামলকবৎ এই ছিল তাঁর কথার সার। চাঁদপুর যাওয়ার পথে নদীতে খানিকটা ঝড় আরম্ভ হয়। ঝড়ের সময়কার দৃশ্য দেখতে উপরে যান। সেখানে হাওয়ার জোরে একটি জানালা তাঁর হাতের আঙ্গুলের উপর পড়ে। খুবই আঘাত লাগে। আঙ্গুল কেটে রক্ত বেরোয়। কয়েক সেকেণ্ড প্রায় জ্ঞান হারান। আঙ্গুলের কাটা জায়গায় ডাক্তার টিনচার আইয়োডিন লাগাতে চাইলে তিনি আঙ্গুলটিকে বার দুই হাওয়ায় দুলিয়ে বলেন 'এই আমার জীবাণু প্রতিষেধক ওষুধ'।

ত্রিপুরা, নোয়াখালী জিলায় ট্রেনে রাত্রিতে যাওয়ার সময় প্রত্যেক স্টেশনে হিন্দু মুসলমান বহু লোক এসে হারিকেন ল্যাণ্টার্ন তাঁর প্রায় মুখের সামনে ধরে তাঁকে দেখতে থাকল। রাত্রে বিশ্রামের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হায় রে, মহাত্মা হওয়ার কি এই শাস্তি!

নোয়াখালীতে তখন হিন্দু মুসলমানের ভিতরে অপ্রীতির ভাব চলছিল। একজন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী যুবক এসে মহাত্মাজীকে সে কথা বলে। মহাত্মাজী তাকে জিজ্ঞাসা করেন 'এই জিলায় হিন্দু মুসলমানের শতকরা হার এবং তাদের জমির হার কত?' যুবকটি বলে 'মুসলমান শতকরা ৭০ ভাগ এবং হিন্দু ৩০ ভাগ আর জমির মালিক হিন্দু শতকরা ৭০ ভাগ আর মুসলমান ৩০ ভাগ।' মহাত্মাজী বলেন 'এইখানেই ত সংঘর্ষের কারণ।' অর্থনৈতিক বৈষম্য মিলনের প্রবল অন্তরায় এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। অবশ্য তা দূর করার জন্যও ছিল তাঁর নিজস্ব অহিংস পন্থা।

মহাত্মাজীর বাংলা অবস্থানকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু দাশ দুইজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান ব্যারাকপুর, আর দার্জিলিং যান দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যারাকপুর থেকে ফিরে এসে এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইয়ং ইণ্ডিয়ায় 'ব্যারাকপুরের ঋষি' নাম দিয়ে নিবন্ধ লেখেন। তাতে ব্যারাকপুর যাওয়াকে তীর্থযাত্রা বলে বর্ণনা করেছেন। কি সৌজন্য ও হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ দুজনের মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই বলে জাতির অগ্রগতিতে তাঁর অবদান ভুললে অকৃতজ্ঞতাই হবে। বাঙ্গালী কতক পরিমাণে সে দোষে দোষী। মহাত্মাজী ব্যারাকপুর গিয়ে আমাদের সুরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন থাকা উচিত এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মানুষ এক সময় এগিয়ে যান, আর হয়ত এগোতে পারেন না। দুই-এক জনই মাত্র তার ব্যতিক্রম। কিন্তু যাঁরা কখনো এগিয়ে গিয়ে দেশকে পথের সন্ধান দিয়েছেন তাঁরা নমস্য। সুরেন্দ্রনাথ সেই নমস্যদের একজন।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে গ্রাম উন্নয়ন কাজের তথা গঠনমূলক কাজের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উভয়েই এ কাজে বিশ্বাসী। তখন বিলাতে রাজনীতিকদের বিশেষ করে তৎকালীন সেক্রেটারী অব স্টেট

লর্ড বার্কেনহেডের কাছ থেকে সুবিচার পাবেন দেশবন্ধু এই বিশ্বাস করছিলেন। মহাত্মাজী বলেন, 'যখন আমরা দুর্বল তখন বৃটিশ সরকার কিছুই করবে না।' উত্তরে দেশবন্ধু বলেন 'আপনি বড়ই যুক্তিবাদী।' মহাত্মাজী চুপ হয়ে যান। যুক্তির অতীতও একটা রাজ্য আছে—যেখানে মানুষ অন্তর দিয়ে পোঁছতে পারে। কিন্তু দেশবন্ধুর সে আশা সফল হল না। তিনি যে আলো দেখছিলেন বলে মনে করছিলেন তা ছিল দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র।

জলপাইগুড়ি হতে মহাত্মাজী যাবেন ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ নামক এক গ্রামে। স্টেশনে এসে খবর পাওয়া গেল দার্জিলিং মেল দেড় ঘণ্টা দেরীতে আসছে এবং পার্বতীপুরে গিয়ে ঢাকা মেল পাওয়া যাবে না। পার্বতীপুর হতে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করলে গোয়ালন্দ গিয়ে স্টীমার ধরতে পারবেন। মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করা হল কি করা যাবে। তখন যে কথা বলেন তা চিরদিন আমার মনে জাগরূক থাকবে—"জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা দেওয়া ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা দেওয়ার সামিল। ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঠিক থাকলে তা রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা করতে তা কর।" অতএব স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা হল পার্বতীপুর হতে। জনগণের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের গভীর যোগাযোগ। হাজারে হাজারে লোক আসবে আর তিনি না যাওয়ার জন্য তারা ব্যথিত হয়ে ফিরে যাবে এ কষ্ট তাদের তিনি দিতে চাননি। এজন্য অতিরিক্ত খরচ করাও তিনি ন্যায্য মনে করেছেন। যদিও তিনি নিজের জন্য খরচ করা ব্যাপারে কৃপণ ছিলেন।

ঢাকা জিলায় নারায়ণগঞ্জ শহরে এতটা বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়েছিলেন যে সেরূপ তাঁকে কখনো দেখিনি। অবশ্য সঙ্গত কারণ ছিল। নারায়ণগঞ্জে স্টীমার স্টেশনে নেমে মোটরে আসবার পথে ধাক্কাধাক্কি। অতি কষ্টে মোটরে উঠবার পর লাফিয়ে লাফিয়ে লোক পাদানিতে উঠছে। তাদের কোন প্রকারে নামানো গেলেও মোটর

জোরে চালাবার উপায় ছিল না। গাড়ীর সামনে ছিল একদল সাইকেল আরোহী ভলান্টিয়ার এবং তারা চলছিল আস্তে আস্তে। তাই একদলকে নামানো গেলে আর একদল পাদানিতে লাফিয়ে উঠে। মহাত্মাজী নিজে পর্যন্ত চীৎকার করে বলতে আরম্ভ করলেন 'স্বেচ্ছাসেবকরা আমার গাড়ী যাবার রাস্তা করে দাও।' কিন্তু তারা কোন কথা শুনল না। সভার প্যাণ্ডেলের সামনে গাড়ী থামলে নেমেই তিনি বেশ রাগত আদেশের স্বরে বললেন, "স্বেচ্ছাসেবকরা, যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক। যদি একজন স্বেচ্ছাসেবকও নিজ স্থান ত্যাগ করে তক্ষুনি আমি গাড়ীতে ফিরে আসব।" তখন অবশ্য স্বেচ্ছাসেবকেরা পাথরের মত নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রইল। যারা শৃঙ্খলা রক্ষা করবে তারাই যদি বিশৃঙ্খলার কারণ হয় তবে ধৈর্যচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক।

গানের প্রতি মহাত্মাজীর আকর্ষণের কথা পূর্বে বলেছি। এবার ঢাকা শহরে দেখলাম বাদ্যযন্ত্রও তাঁকে কম আকর্ষণ করে না। তিনি ঢাকা ন্যাশনাল কলেজ ভবনে ছিলেন। সেখানেই এসে ঢাকার বিখ্যাত শ্রীভগবান সেতারী তাঁকে সেতার বাজিয়ে শোনাবেন এরূপ কার্যক্রম রেখেছিলেন উদ্যোক্তারা। সেদিন তাঁর খুব কাজের চাপ। মাত্র পনের মিনিট সময় দিতে পারবেন বলেন। আমরা বলি 'আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা থাকবেন, ভাল না লাগলে এর পূর্বেও চলে আসতে পারেন।' সেতারী তন্ময় হয়ে বাজালেন, আর মহাত্মাজীও তন্ময় হয়ে শুনলেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে।

১৭ই জুন ভোরে তিনি খুলনা এসে পৌঁছান। তার পূর্বের দিন দেশবন্ধু দার্জিলিংয়ে দেহত্যাগ করেন। খবর পেয়ে খুবই ব্যথিত হন। তাঁর এই অকালমৃত্যু ছিল অপ্রত্যাশিত। দেশবন্ধুর মৃতদেহ কলিকাতায় নিয়ে আসা হয়। মহাত্মাজীও যথাসময়ে পৌঁছে যান। শিয়ালদহ হতে কাঁধে করেই দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেওড়াতলা শ্মশানে। মহাত্মাজীও প্রথমে খানিক সময় কাঁধ দেন। কিন্তু

লোকে লোকারণ্য। কিছু দূর এগোলেই ভিড়ের চাপে মহাত্মাজীর পক্ষে ওভাবে চলা সম্ভবপর হয় না। শ্মশানে বসেই দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। স্মৃতিরক্ষার জন্য কি করা যায় ভেবে স্থির করলেন দেশবন্ধুর বাড়ীতে মেয়েদের জন্য একটি হাসপাতাল করা। এই বাড়ী কয়েক মাস পূর্বে দেশবন্ধু মেয়েদের কল্যাণের জন্য দান করেছিলেন। মহাত্মাজী এ কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে দশ লক্ষ টাকার আবেদন করেন। একটি অছিমণ্ডলী গঠিত হয় কার্য পরিচালনার জন্য। এর পর দুই মাসের উপর অনন্যকর্মা হয়ে মহাত্মাজী টাকা সংগ্রহে লেগে যান। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশবন্ধুর ন্যায় ত্যাগী লোকের স্মৃতিতে মেয়েদের জন্য হাসপাতাল তৈরীর কাজে মহাত্মাজীর ন্যায় লোকের চেষ্টায়ও দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়নি। আট লক্ষ টাকার কিছু উপরে সংগৃহীত হয়। সেই টাকা দিয়ে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা বর্তমানে বেশ একটি বড় প্রতিষ্ঠান।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহাত্মাজী স্বরাজ্য দলকে আরো শক্তিশালী করতে চান। সেপ্টেম্বর মাসে পাটনায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বেলগাঁও চুক্তি রদবদল করা হয়। স্বরাজ্য দলের সুবিধার জন্য পয়সা দিয়েও কংগ্রেস সভ্য হওয়ার ব্যবস্থা হয়। কাউন্সিল ইত্যাদিতে প্রবেশও স্বরাজ্য দলের লোকেরা কংগ্রেসের নামেই করতে পারবে। খাদির কাজের জন্য কংগ্রেসের অধীনে নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ নামে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা গঠিত হয়। সভাপতি মহাত্মা গান্ধী। কার্যকরী সম্পাদক শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কার। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযমুনালাল বাজাজ।

মহাত্মাজী চাইলেন স্বরাজ্য দলকে শক্তিশালী করতে কিন্তু হল অন্যরূপ। ১৯২৫ সালেই স্বরাজ্য দলে ভাঙ্গন দেখা দিল। মহারাষ্ট্র নেতারা পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে এমনকি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন। তাঁদের মতে ভাল মন্দ সকল প্রস্তাবের

বিরোধিতা নিরর্থক। ১৯২৫ সালে কানপুর কংগ্রেসের সময় শ্রীজয়াকর, কেলকার ও ডাঃ মুঞ্জে তাঁদের স্বরাজ্য পার্টি টিকেটে নির্বাচিত কাউন্সিল ও এসেম্বলীর পদে ইস্তফা দিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের মতের পক্ষে প্রচার কার্য চালানো। ১৯২৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আকোলায় এঁরা 'পারস্পরিক সহযোগী পার্টি' গঠন করলেন। স্বরাজ্য দল দুই ভাগে বিভক্ত হল। দুই দলের মিলনের জন্য চেষ্টা হয়। সবরমতী আশ্রমে মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে একটি চুক্তি হয়। কিন্তু সে চুক্তি কার্যকরী হয় না। এক দল অপর দলের উপর দোষারোপ করে।

১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বরাজ্য দল তথা কংগ্রেস 'পারস্পরিক সহযোগী পার্টি'র কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। দেশ স্বরাজ্য দলের নীতি পরিত্যাগ করে পারস্পরিক সহযোগিতার দিকে পা বাড়াল।

১৯২৫ সালে মহাত্মাজী ধারাবাহিকভাবে তাঁর আত্মজীবনী বা সত্যের প্রয়োগ গুজরাটী ভাষায় লিখতে থাকেন নবজীবনে। শ্রীমহাদেব দেশাই তা অনুবাদ করে বের করেন ইয়ং ইণ্ডিয়ায়। এ অনুবাদ মহাত্মাজীর অনুমোদিত। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এরূপ আত্মজীবনী খুব কমই পড়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯২০ সালের পরের কোন ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করেননি।

মহাত্মাজী গঠনমূলক কাজের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য সে কাজের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কিন্তু সে ঐক্যে গুরুতর আঘাত লাগল স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যায়। নেতারা অনেকেই গৌহাটী কংগ্রেসে (১৯২৬ ডিসেম্বর) আসবার পথে। সাময়িক উত্তেজনার বশে কাজটি হয় নি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখা করার অছিলা করে এক মুসলমান যুবক তাঁকে শায়িত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। অথচ এই স্বামীজীকে একদিন দিল্লীর জুম্মা মসজিদে নিয়ে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ানো হয়েছিল। হায় রে

জনমত, হায় রে ধর্মান্ধতা ! তবে এই যুবকের চেয়ে যারা দেশে এরূপ বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তারাই অধিকতর দায়ী। গৌহাটী কংগ্রেসে মহাত্মাজী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে সে কথার উপরই জোর দেন। প্রস্তাব সমর্থন করেন মৌলানা মহম্মদ আলী। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে মহাত্মাজীর প্রাণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্বামীজী ছিলেন নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ দেশ-সেবক। তাঁর এভাবে মৃত্যু মুসলমান সমাজ তথা সারা দেশের পক্ষে কলঙ্ক স্বরূপ।

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে গঠনমূলক কাজ পরিচালনা করছেন। সিংহল থেকে নিমন্ত্রণ এল। ১৯২৭ সালে যান সেখানে। সিংহলে অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাই অহিংসার বাণী প্রচারক পেলেন সেখানে বিপুল অভ্যর্থনা। কেউ বা ভাবল বুদ্ধদেব দ্বিতীয় রূপ গ্রহণ করে এসেছেন, কেউ বা ভাবল ইনি অশোকের পুত্র মহেন্দ্র দ্বিতীয় বার এলেন প্রেমধর্ম প্রচারে। ধনী দরিদ্র সবাই ছুটল দর্শনের জন্য তাঁর পিছনে। তিনি সেখানে অহিংসা, খাদি ও মাদকদ্রব্য বর্জনের প্রচার করেন। ভারতবর্ষে খাদির কাজ প্রসারের জন্য ভিক্ষা চান। এক লক্ষ টাকাও সংগৃহীত হয়।

সিংহল থেকে ফিরে ম্যাঙ্গালোরে বক্তৃতা করছেন এমন সময় ভাইসরয়ের কাছ থেকে খবর এল ৫ই নভেম্বর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। ছুটে গেলেন দিল্লী। সেখানে ভাইসরয় তাঁকে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য সাইমন কমিশন নিযুক্তির খবর সমন্বিত একখানা কাগজ দেন। তা পেয়ে মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করেন 'শুধু কি এই কাজ ছিল ?' উত্তরে 'হ্যাঁ' বলাতে তিনি বলেন যে, একখানা খামে পুরে পাঠালেই ত চলত। কষ্ট করে এত দূর আসতে হত না।

ভারতের সকল রাজনৈতিক দল সাইমন কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত করে। ১৯২৭ সালে কংগ্রেসেও ওইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত এবং মালব্যজীও প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বরাজ লাভ হলে ভারতের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ হবে তা অর্থাৎ সংবিধান রচনা করার জন্য একটি কমিটী গঠনের প্রস্তাবও হয় ওই কংগ্রেসে। ১৯২৮ সালের মে মাসে বোম্বেতে সর্বদল সম্মিলনে সংবিধান রচনার জন্য মতিলালজীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। সেই কমিটীর রিপোর্ট 'নেহেরু কমিটী রিপোর্ট' নামে খ্যাত। এই রিপোর্ট সকল দলের লোকের সমর্থিত। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সুপারিশ এই রিপোর্টে। অবশ্য স্বাধীনতার জন্য প্রচার করার অধিকার স্বীকৃত ছিল। এই রিপোর্ট দোষক্রটীহীন নয়, কিন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের প্রায় সর্ববাদীসম্মত রিপোর্ট নেহেরু কমিটীর খুব বড় অবদান। উহা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দলিল। মহাত্মাজী এই রিপোর্ট সমর্থন করেন।

১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসে। তখন সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। লাহোরে সে উপলক্ষ্যে পুলিশ লাঠি চালনা করে। লালাজীও প্রহৃত হন। বৃদ্ধ বয়সে সে আঘাতের ফলে ১৭ই নভেম্বর লালাজী মারা যান। দেশের এই সঙ্কটজনক সময়ে তাঁর মৃত্যুও ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হল। নাগপুরে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের উত্থাপক ও সমর্থক দুজনেই পরপারে। স্বরাজ এখনো বহুদূরে।

১৯২১ সালে মহাত্মাজী স্বরাজ লাভের জন্য বারদৌলীতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন। অবস্থাগতিকে তা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু ১৯২৮ সালে বারদৌলীর লোকেরা স্বরাজের জন্য নয়, খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করে। মহাত্মাজীর পুরা সমর্থন ছিল এর পিছনে। নেতৃত্ব করেন বল্লভভাই প্যাটেল। যদিও প্রজাদের আপত্তি ন্যায্য ছিল এবং সত্যাগ্রহ স্বরাজের জন্য নয় তথাপি অত্যাচার চলেছিল পুরাদমে। সরকার কোন কিছু করতে পশ্চাৎপদ হয়নি। আন্দোলন দমন

করার নামে চলেছিল চরম নৃশংসতা ও বর্বরতা। অবশেষে জনগণের জয় হয়। সরকারী কমিশনের রিপোর্ট হতে প্রমাণিত হয়, যে পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল তা অযৌক্তিক। ন্যায্য প্রতিকার পেতেও কি পরিমাণ কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল! এক দিকে কাউন্সিল প্রবেশের ব্যর্থতা, অপর দিকে বারদোলী সত্যাগ্রহের জয়, একপ্রকার সর্ববাদীসম্মত নেহেরু রিপোর্ট পুনরায় গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল। তাই ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মাজী পুনরায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৫, '২৬ ও '২৭ সালের কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন বটে, তবে তা অনেকটা দর্শকেরই মত। তেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি।

১৯২৮ সালের কংগ্রেসে মহাত্মাজীর উত্থাপিত প্রস্তাবের মর্ম ছিল এই :—রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কল্পে নেহেরু কমিটী যে রিপোর্ট দিয়েছে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে, মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত স্বাধীনতার প্রস্তাবের প্রতি আনুগত্য জানিয়েও নেহেরু কমিটী প্রস্তাবিত সংবিধান অনুমোদন করে ; কারণ ভারতের বিভিন্ন দলের উহা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট তা অনুমোদন করে তবে কংগ্রেস তা পুরাপুরি ভাবে গ্রহণ করবে। যদি পার্লামেণ্ট তা অনুমোদন না করে বা অগ্রাহ্য করে তবে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করবে এবং দেশকে খাজনা বন্ধ ইত্যাদির পরামর্শ দেবে। অবশ্য কংগ্রেসের নামে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারে কোন বাধা থাকবে না।

এই প্রস্তাব আপসরফার ফল। সুভাষবাবু জওহরলালজী উভয়েই এই আপসে রাজী হন। কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনে দুই-জনেই সংশোধনী প্রস্তাব দেন। মহাত্মাজী দুঃখ করে বলেন 'যদি চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনড় না রাখতে পারেন তবে স্বরাজের কথা বলা নিরর্থক।' মহাত্মাজীর প্রস্তাব অনেক বেশী ভোটে গৃহীত হল।

১৯২০ সালে কলিকাতায়ই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পুনরায় ১৯২৮ সালে কলিকাতায়ই অসহযোগের সম্ভাবনা ঘোষিত হল।

এর পর মহাত্মাজী ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরে তাঁর বাণী প্রচার করেন। কলিকাতায় বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের দরুন মিউনিসিপ্যাল আইনে তাঁর এক টাকা জরিমানা হয়। তাঁর অজান্তে এক ব্যক্তি জরিমানার টাকাটি দিয়ে দেয়।

১৯২৯ সালে সকলের মনেই একটা উৎসাহ। সরকারও ভাবল আবার হয়ত আইন অমান্য শুরু হতে পারে। ভাইসরয় বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য বিলাতে যান। সেখান হতে ফিরে ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা করেন। তাতে অনেকের মনে আশা জাগে যে, হয়ত ভারত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন পাবে। ভাইসরয়ের বিবৃতি হতে অনেকের মনে এই ধারণা হল যে, কনফারেন্স বসবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সংবিধান রচনা করার জন্য। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত রূপে জানবার জন্য মহাত্মাজী ও মতিলালজী ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেন। ভাইসরয় এমন কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না যে, কনফারেন্সে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সংবিধান রচনা করা হবে। এর কয়েক দিন পরেই লাহোর কংগ্রেস অধিবেশন। লাহোর কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগ পুনরুজ্জীবিত হবে এ কথা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল।

কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রাথমিক মনোনয়নে সবচেয়ে বেশী ভোট পান মহাত্মাজী, তারপর সর্দার বল্লভভাই এবং সর্বনিম্ন ভোট পান জওহরলালজী। কিন্তু মহাত্মাজী ওই পদ নিতে অস্বীকার করেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে বল্লভভাইও অস্বীকৃত হন। জওহরলালজী তখন স্বায়ত্ত শাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতা এই ব্যাপারে মহাত্মাজী হতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। মহাত্মাজী তাঁকেই এই পদ দিতে চাইলেন। এই মহাত্মাজীর কার্যধারা। এখানেই তিনি অনেকের চেয়ে পৃথক্।

জওহরলালজী সভাপতি হলেন। অবশ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বনাম স্বাধীনতার প্রশ্ন লাহোরে উঠেনি। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মাজীর উত্থাপিত প্রস্তাবেই এ কথা ছিল যে, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি বৃটিশ পার্লামেণ্ট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন মঞ্জুর না করে তবে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাকে তার মূলনীতি বলে গ্রহণ করবে। লাহোরে হল তা-ই।

লাহোরে পুনরায় অসহযোগের কার্যক্রম গৃহীত হল। মতিলালজী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, কাউন্সিল এসেম্বলীতে থেকে দেশকে স্বরাজের দিকে এক পাও এগোতে পারা যাবে না। প্রধান প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহাত্মাজী। তা গৃহীত হয়। কংগ্রেসসেবীদের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে ক্ষমতা দেওয়া হয় উপযুক্ত সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার। পুনরায় মহাত্মাজী কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা।

লাহোরে বিষয় নির্বাচন সমিতির অধিবেশন চলা সময় একদিন ভোর সাড়ে চারটায় তাঁর দেওয়া সময়ে দেখা করতে যাই। ভীষণ ঠাণ্ডা, গরম কোটের উপরও কম্বল জড়িয়ে যাই। মহাত্মাজী বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র ব্যবহার করছেন। প্রথমেই বললেন 'এই শীতের সময় কংগ্রেস অধিবেশন করা চলবে না। দরিদ্রদের অশেষ কষ্ট হয়।' দরিদ্রের জন্য কি দরদ! তার পূর্বের দিন বিষয় নির্বাচন সমিতিতে স্বনিয়ন্ত্রিত অস্পৃশ্যতা ও মাদকদ্রব্য বর্জন কমিটী নিয়োগের প্রস্তাবে তিনি পরাজিত হন। তার উল্লেখ করে বললেন "যদি আমার প্রধান প্রস্তাবেও পরাজিত হই তা হলেও আমি একটি দল গঠন করে আইন অমান্য পরিচালনা করব।" ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে যেরূপ উদ্বূদ্ধ দেখেছিলাম এবারও ঠিক সেরূপ দেখলাম। মনে খুব আশা ও আনন্দ।

লাহোর কংগ্রেসের পর স্বাধীনতার সংকল্পের মুসাবিদা করেন

মহাত্মাজী। ওয়ার্কিং কমিটী তা গ্রহণ করে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতবর্ষে সেই সংকল্প গৃহীত হয়। এর পর থেকে প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হত। এই সংকল্পের আসল কথা, ইংরেজ শাসনে ভারতের চতুর্বিধ—আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। এইজন্যই চাই ইংরেজ শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীনতার আসল কথা হল আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন। অহিংসার পথেই তা সম্ভবপর। মহাত্মাজী ছিলেন তাতে অবিচলিত। আবার সে পথে জাতির যাত্রা হল শুরু।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লবণ সত্যাগ্রহ হতে ভারত ছাড় আন্দোলন আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত

কি ভাবে আইন অমান্য আরম্ভ করা যায় ভাবছেন মহাত্মাজী। লবণ আইন অমান্য করা স্থির করলেন। এক ইংরেজ যুবক রেজিনাল্ড রেনল্ডের হাত দিয়ে চিঠি পাঠালেন ভাইসরয়ের কাছে। জানালেন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব দেশের পক্ষে এক মস্ত বড় অভিশাপ। শাসনকর্তা ও জনগণের মধ্যে দুস্তর অর্থনৈতিক ব্যবধান। ইংরেজ রাজত্বের এই অবিচার দূর করার জন্য অনুরোধ জানালেন। সে অনুরোধে যদি ১১ই মার্চের মধ্যে কোন সাড়া পাওয়া না যায় তবে লবণ আইন অমান্যের অভিযান শুরু হবে। দরিদ্রকেও লবণের উপর ট্যাক্স দিতে হয়। ফলে দরিদ্র লোকেরা নিজেদের এবং তাদের গরু মহিষের জন্য পর্যাপ্ত লবণটুকু পায় না। এমনকি সমুদ্রতীরের লোকেরাও লবণ তৈরী করে খেতে পারে না। ইংরেজ বণিকের স্বার্থে এই ব্যবস্থা। ভাইসরয় উত্তরে জানালেন যে, মহাত্মাজীর কার্যক্রমের ফলে জনসাধারণের শান্তি বিপন্ন হবে, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত। মহাত্মাজী উত্তর পেয়ে ভাবলেন যে, চেয়েছিলেন রুটী, পেলেন পাথরের টুকরা।

১২ মার্চ, ১৯৩০। মহাত্মাজী ৭৯ জন সবরমতী আশ্রমের সহকর্মী নিয়ে সেখান হতে আরব সাগরের তীরে দাণ্ডী নামক স্থানে পদব্রজে রওনা হলেন। ইহা বিখ্যাত দাণ্ডী অভিযান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রথম সমুদ্রের জল হতে লবণ তৈরী করে আইন ভঙ্গ করবেন। দীর্ঘ দু শ' মাইল পথ। তাঁর মৌন দিবস সোমবার বাদে অন্যদিন নিয়মিত চলতেন। ওই দিনটা বিশ্রাম নিতেন। এভাবে দাণ্ডী পৌঁছতে তাঁর চব্বিশ দিন লাগে। যাত্রাপথে প্রচার চলতে থাকে। ফলে সারা ভারতে উদ্বেলিত হয়ে উঠে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। মহাত্মাজী প্রথম

আইন অমান্য করার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে লবণ তৈরী ও বিক্রী করে আইন অমান্য আরম্ভ হয়।

সরকার প্রথম এই আন্দোলনের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব দেখায়। মহাত্মাজীকে বে-আইনী ভাবে লবণ তৈরীর জন্য গ্রেপ্তার করে না। পরে তিনি ধরসনার লবণ গোলা দখল করার সংকল্প জানান। সে কাজ আরম্ভের পূর্বের দিন (৫ই মে রাত্রিতে) তাঁকে ১৮২৭ সালের ২৫ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের পর ধরসনা আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংসভাবে পরিচালিত হয় এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের উপর চালায় নির্মম অত্যাচার। সে দৃশ্য দেখে বিদেশীরাও অহিংস সত্যাগ্রহীদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়। শুধু ধরসনায় নয়, মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের পর জাতি একটা দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেয়। এক লক্ষের উপর লোক কারাবরণ করে। ১৯২১ সালের চেয়ে অধিকতর সাড়া দেয় দেশ। কোন প্রকারের হিংসাত্মক কার্য সংঘটিত হয় না। এবার মেয়েরা খুব ব্যাপক ভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে দেখা দেয় অভূতপূর্ব জাগরণ। আন্দোলন কয়েক মাস চলার পর শ্রীতেজ বাহাদুর সপ্রু ও জয়াকর আপস করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ভাইসরয় ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে আপসের সর্ত নিয়ে মতৈক্য না হওয়ায় তা হল না। অতএব বিলাতে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি যাননি। মৌলানা মহাম্মদ আলী অবশ্য গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে। হয় স্বরাজ নিয়ে দেশে ফিরবেন নয় তাঁর মৃত্যু ঘটবে এই ছিল তাঁর কথা। স্বরাজ নিয়ে ফিরতে পারেননি, হল দেহাবসান। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু খুবই দুঃখের। পরবর্তী কালে মহাত্মাজীর সঙ্গে মতদ্বৈধ সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর দান ভুলবার নয়।

১৯৩১ জানুয়ারী মাসে মহাত্মাজীও কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় আরো কয়েকজনকে মুক্তি দেয় সরকার। মুক্তির পর মহাত্মাজী এলাহাবাদ

যান। মতিলালজী গুরুতর অসুস্থ। ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান। খুবই ব্যথিত হন মহাত্মাজী। একে একে কয়েক জন বিশিষ্ট সহকর্মীকে হারালেন। দেশবন্ধু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালাজী, মৌলানা মহম্মদ আলী ও মতিলালজী। কিন্তু ব্যথিত হলেও তাঁর সত্যিকারের বিশ্বাস ছিল 'মৃত্যুর ভিতর দিয়েই জন্মের সার্থকতা'।

এই সময় মহাত্মাজী ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পনের দিন ধরে আলাপ আলোচনা হয়। ফল মার্চের গোড়ায় এক চুক্তি। তা গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে বিখ্যাত। এই চুক্তি অনুযায়ী—(১) সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানের লোকদের লবণ তৈরী করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তারা মাথায় করে যতটা নিতে পারে তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেও পারবে; (২) শান্তিপূর্ণ পিকেটিংয়ে বাধা দেওয়া হবে না; (৩) রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে; (৪) সব কয়টি অর্ডিনান্স তুলে নেওয়া হবে; আর কংগ্রেস প্রতিনিধি বিলাতে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন। একমাত্র মহাত্মাজী হলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি। বিলাত যাওয়ার কয়েক দিন পূর্বে আলাপের সময় বললেন, "জনগণের সাধারণ ভাবে কংগ্রেসের প্রতি একটা শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে ত্যাগ স্বীকার করলে স্বাধীনতা লাভ হতে পারে তার জন্য তারা প্রস্তুত নয়।" দেখলাম এজন্যই চিন্তিত বেশী। স্বাধীনতা লাভ যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন সম্ভবপর নয়, আর স্বাধীনতা কখনও দানের বস্তু হতে পারে না, ত্যাগের দ্বারাই অর্জন করতে হয় এ কথা তিনি মর্মে মর্মে বুঝতেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি কংগ্রেসের জয় কিনা এ প্রশ্নে মহাত্মাজী বলেছেন কারো জয় বা কারো পরাজয় নয়। সরকার ও কংগ্রেস উভয়েরই জয়। তবে এ কথা ঠিক যে স্বরাজ লাভ হয়নি।

এই চুক্তির পর ২৯শে মার্চ কংগ্রেসের অধিবেশন বসে করাচীতে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতি। ভারতবর্ষে ধনী-দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান দূর হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন এই মহাত্মাজীর মত। করাচী

কংগ্রেস সেদিকে প্রথম পদক্ষেপ করল। বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ কাজের জন্য ভিন্ন সাধারণতঃ সর্বোচ্চ বেতন হবে মাসিক পাঁচশ' টাকা। সর্বনিম্ন আয় যেমন স্থির হওয়া প্রয়োজন তেমনি সর্বোচ্চ আয়ও। অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে তা প্রথম ধাপ।

১৯৩০ সালের আন্দোলনে স্বাধীনতাকামী সীমান্তের পাঠানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন খান আবতুল গফ্ফর খান। তিনি পাঠানদের অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী তিনি। জনগণ তাঁকে বলত সীমান্ত গান্ধী। করাচীতে তাঁর প্রভাব উপলব্ধি হয়। তিনি হয়ে উঠেন মহাত্মাজীর একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। মহাত্মাজী তাতে খুব খুশী। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পনের বৎসর পরেও খান সাহেব পাকিস্তানের কারান্তরালে। এটা খুবই দুঃখের।

১৯৩১ সালেই লর্ড আরউইন ভারত ত্যাগ করেন। নূতন ভাইসরয় আসেন লর্ড উইলিংডন। মনে হয় তিনি লর্ড আরউইনের নীতি পরিবর্তন করতে চান। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্বন্ধে এক জার্মান পণ্ডিত লিখেছিলেন 'দায়ে পড়ে বিবাহের পরিণতি বিচ্ছেদ, এ চুক্তির পরিণতিও তা-ই হবে।' মহাত্মাজীর দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যাওয়া বন্ধ হওয়ার অবস্থায়ই এসেছিল। যা হোক, শেষ মুহূর্তে যাওয়া স্থির হয়। ঠিক সময়ে জাহাজ ধরবার জন্য দিল্লী হতে স্পেশ্যাল ট্রেনে বোম্বে যান। সঙ্গে মহাদেব দেশাই, প্যারীলাল, দেবদাস গান্ধী ও মীরাবেন। জাহাজে উঠে তিনি তাঁর ও সাথীদের জিনিসপত্রের পরিমাণ কমাতে বলেন এবং অনেক জিনিস ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। জাহাজে তিনি প্রার্থনা করে, চরখায় সূতা কেটে, লেখাপড়া করে ও ডেকে বেড়িয়ে সময় কাটাতেন। তিনি সাধারণতঃ শিশুদের খুব ভালবাসতেন। জাহাজে ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও তাঁর অন্তরের সম্পর্ক গড়ে উঠে। যে সব বন্দরে জাহাজ থামে সেখানে পান বিপুল অভ্যর্থনা। লণ্ডনে থাকেন শহরের গরীব পল্লী ইস্ট এণ্ডে

কিংসলি হলে। মিস মুরিয়েল লিস্টারের অতিথি। গোল টেবিল বৈঠক বসে সেণ্ট জেমস প্রাসাদে। খানিকটা দূর। কিন্তু সে অসুবিধা সত্ত্বেও গরীবদের মধ্যে থাকাই পছন্দ করেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক শুরু হয় এবং তা আড়াই মাসের উপর চলে। মহাত্মাজীকে সভাপতির ঠিক বাঁ পাশেই আসন দেওয়া হয়। এই বৈঠকে মহাত্মাজীর বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দাবী করেন। যে দেশের অধিকাংশ লোক পেট পুরে খেতে পায় না সে দেশে উচ্চ কর্মচারীদের পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা মাসিক বেতন অন্যায়। কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই প্রতিনিধিত্ব কববার যোগ্য। তিনি খুব যুক্তি দিয়ে জোর সহকারে এ কথাগুলি বলেন। তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা বিশেষ নির্বাচন সজ্ঞ স্বীকারের বিরোধিতা করেন। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ ভোটারের মারফতে নির্বাচনের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। কারণ তাতে অস্পৃশ্যতাকে চিরস্থায়ী করা হবে। সামাজিক অবিচার কখনো দূর হবে না। বৃটিশ সরকারের মতিগতি ছিল সেদিকে। তিনি তাদের হুঁসিয়ার করে দেন। এ কথাও বলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি নিজ প্রাণ দিয়ে তার প্রতিরোধ করবেন। এ কথার সারমর্ম তখনো অনেকে উপলব্ধি করতে পারেনি।

গোল টেবিল বৈঠকে সরকার ত নিজেদের ইচ্ছামত ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে নিমন্ত্রণ করেন। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মাজী। বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছা ছিল বলে মনে হয় না। তাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও লোভ জাগ্রত করে একটা অস্বাভাবিক ও অচল অবস্থার সৃষ্টি করে চতুর ইংরাজ রাজনীতিবিদ্‌গণ। সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া অপরাধ নয়, সংখ্যা-গরিষ্ঠ হওয়াও অপরাধ নয়। প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি

বিশেষ অধিকার দাবী করে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোল টেবিল বৈঠকটা যেন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের বৈঠকে পরিণত হল : জেনে বুঝেই বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা এ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন তলিয়ে গেল। মহাত্মাজী এ চাতুরী বুঝতে পেরে হলেন নিরাশ।

ইংলণ্ডে থাকাকালীন অনেক লোকের সঙ্গে মিশবার সুযোগ হয় তাঁর। যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ও মনীষী বার্নার্ড শ' তাঁদের অন্যতম। অক্সফোর্ড, কেম্বি্রজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেস্টারে যান। শেষোক্ত দুই স্থানের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা ভারতে বিলাতী বস্ত্র বয়কট আন্দোলনের ফলে তাদের যে অসুবিধা হয়েছে তার উল্লেখ করে। মহাত্মাজী তাদের এ কথা বুঝিয়ে বলেন যে, ভারতের আপামর জনসাধারণ তাদের তুলনায় অনেক বেশী গরীব এবং সেই গরীবদের কষ্টলাঘবের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অতএব ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র প্রচলনের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকদের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল, কিন্তু তাদের চেয়ে গরীবদের প্রতি প্রেম ছিল আরো বেশী। এর মধ্যে ইংরেজ ভারতবাসীর প্রশ্ন ছিল না। আসল কথা দরিদ্রের প্রতি দরদ ।

কর্নেল ম্যাডক তখন চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করে বিলাতে। মহাত্মাজী তাঁর বাড়ী গিয়ে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি দেন। বিলাতে লেডী মিণ্টোর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। মহাত্মাজী তাঁকে বলেন 'আপনার স্বামী ভারতবর্ষে পৃথক্ নির্বাচন প্রথার ন্যায় একটি ক্ষতিকর জিনিসের প্রবর্তন করেন।'

ইংলণ্ডেও তিনি খুব ভোরে বেড়াতে যেতেন। চপ্পল পায়ে, কোন মোজা না পরে, চাদর গায়ে বেড়াতেন। ওই শীতেও কোন কোট, ওভারকোট ইত্যাদি ছিল না। 'অর্ধনগ্ন ফকির' বেশেই চলতেন।

সেই বেশেই তিনি রাজা ও রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এখানেও তিনি হলেন শিশুদের খুব প্রিয়। তিনি তাদের গান্ধী খুড়ো।

গোল টেবিল বৈঠক হতে ফিরবার পথে বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ও মনীষী রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যান জেনেভা হ্রদের তীরে তাঁর বাড়ীতে। রোমাঁ রোলাঁ ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধী আধুনিক ভারতের এই তিন মহান্ পুরুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা।

২৮শে ডিসেম্বর ফিরে আসেন বোম্বেতে। বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন আজাদ ময়দানের জনসভায়। যদিও তিনি খালি হাতে এসেছিলেন।

মহাত্মাজীর অনুপস্থিতিকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা খুব জটিল হয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলা দেশে কার্যতঃ গান্ধী-আরউইন চুক্তির অবসান ঘটায় সরকার। আবদুল গফ্ফর খান, ডাঃ খান সাহেব ও কাজি আতাউল্লা খান আটক হন ১৮১৮ সালের তিন আইনে। মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার জন্য বোম্বে আসবার পথে জওহরলালজী গ্রেপ্তার হন। বাংলা দেশে বিশেষ করে চট্টগ্রামে জোর অত্যাচার চলে। হিজলী বন্দিনিবাসে গুলি চালনা হয়। সমস্ত সংবাদ পাওয়ার পর ২৯শে ডিসেম্বরই মহাত্মাজী সাক্ষাতের জন্য ভাইসরয়ের কাছে তার করেন। ভাইসরয় অযৌক্তিক অনমনীয় ভাব অবলম্বন করেন। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী এক লম্বা তার করেন। তাতে জানান "ভাইসরয় এ কথা বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক কার্যাবলীর জন্য আপনার কোন দায়িত্ব আছে অথবা আপনি তা অনুমোদন করেন। যদি সেরূপ হয় তবে ভাইসরয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছেন এবং কি ভাবে সহযোগিতার ভাব বজায় রাখার জন্য আপনার প্রভাব খাটাতে পারেন

সে বিষয়েও তাঁর মত জানাতে ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু ভাইসরয় এ কথার উপর জোর দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করেন যে, আপনার সঙ্গে তিনি বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশে ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেছেন সে বিষয়ে কোন আলোচনা করতে প্রস্তুত নন।" উত্তরে মহাত্মাজীও লম্বা তার করেন। তাতে তিনি জানান যে, "ভাইসরয় আমার সাক্ষাৎকারের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। আলোচনার পূর্বেই যদি বিশিষ্ট সহকর্মীদের কার্যাবলী অনন্থমোদন করার ন্যায় হীন আচরণের অপরাধ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তথাপিও জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করতে পারব না।" খোলা মন নিয়ে বিনা সর্তে মহাত্মাজী আলোচনা করতে চাইলেন। ভাইসরয় অপমানজনক সর্ত আরোপ করলেন। কোন মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তা মানতে পারেন না।

ভাইসরয় জেনে বুঝেই এইরূপ করেছিলেন মনে হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তি করে ভুল করা হয়েছিল বলে বিলাতে একদল লোকের মত ছিল। সেই ভুল সংশোধনে ব্রতী হলেন লর্ড উইলিংডন। এ অবস্থায় কি করা উচিত সে প্রস্তাবের মুসাবিদা করে উপস্থিত করলেন মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটীর সামনে। তাঁর আবেদনে যদি ভাইসরয় সন্তোষজনক সাড়া না দেন তবে ট্যাক্স বন্ধ সমেত বিবিধ উপায়ে আইন অমান্য করা হবে। কিন্তু এবার সরকার পরিকল্পিত ভাবে কাজ করেছিল। মহাত্মাজীকে আইন অমান্য করার সুযোগ দেয়নি। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩২ মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার পূর্ব হতেই বিভিন্ন প্রদেশে কাকে কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে তার তালিকা করে রেখেছিল। কাজও হল তদনুযায়ী। গান্ধী-আরউইন চুক্তির কবর দেওয়ার জন্যই সরকার তাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। সরকারের পরিকল্পিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণও আইন অমান্য করে প্রত্যুত্তর দেয়।

মহাত্মাজী যারবাদা কারাগারে। বরাবরকার মত এবারও জেলে কর্মময় জীবন। এমনকি নিজের কাপড় চোপড়ও খানিকটা নিজেই সাফ করেন।

দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ডাঃ প্রাণজীবন মেহতার মৃত্যু সংবাদ ১৫ই আগস্ট পেয়ে খুব ব্যথিত হলেন।

তার দুই দিন পরে ১৯৩২ সালের ১৭ই আগস্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রকাশ করেন। তাতে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়। তার প্রতিবাদে মহাত্মাজী বৃটিশ সরকারকে এক চরম পত্র দেন। যদি রোয়েদাদের পরিবর্তন না হয় তবে ২০শে সেপ্টেম্বর হতে তিনি আমৃত্যু অনশন আরম্ভ করবেন। বল্লভভাই ও মহাদেব ভাই তখন মহাত্মাজীর সঙ্গে ওই জেলে। সবাই মিলে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা বিবেচিত হয়। মহাত্মাজী নিজেই বলেন যে, সরকার তাঁকে জেলের ভিতরে বা বাইরে মরতে দিতে পারে। নানারূপ প্রচার হবে। ধূর্ত দেউলিয়া লোকের ন্যায় আমি আত্মহত্যার একটি উপায় বের করেছি এরূপ বলা হবে। আমাদের নিজেদের লোকেরাও এর সমালোচনা করবে। জওহরলালও এ কাজ পছন্দ করবে না। সে বলবে এরূপ ধর্মের অভিব্যক্তির যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি মনে করেন তাঁর কর্তব্য সুস্পষ্ট। গোল টেবিল বৈঠকের সময় তিনি এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পরে ১১ই মার্চ তারিখে স্যার স্যামুয়েল হোরের নিকট লিখিত চিঠিতেও তাঁর উপবাসের কথা স্পষ্টভাবে জানান। বৃটিশ সরকারের কাছে চরম পত্র দেওয়াটা তিনি জনসাধারণকে জানাননি। ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধী-হোর-ম্যাকডোনাল্ডের চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়।

সমস্ত ভারতবর্ষে গভীর চিন্তা ও উত্তেজনা। মহাত্মাজীর আমরণ উপবাসের ঘোষণা এক দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর রোয়েদাদের রদবদল

এবং অন্য দিকে সম্পূর্ণরূপে অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট করল। সকলেরই মনে এই ইচ্ছা মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা করতেই হবে। নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য। সপ্রু, জয়াকর ও আরো অনেকে এলেন। তপশীলীদের দাবী আদায়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীভীমরাও আম্বেদকার। যাহোক সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যারবাদা জেল প্রাঙ্গণে আমগাছের তলায় উপবাসের পঞ্চম দিনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উহা যারবাদা চুক্তি নামে বিখ্যাত। এই চুক্তি অনুযায়ী হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু ও তপশীলীদের পৃথক্ নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচন বন্ধ হল, সমস্ত হিন্দুর ভোটেই নির্বাচন হবে; তবে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল। ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদে যতটি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল এই চুক্তি অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধান সভা সমূহে তার প্রায় ডবল আসন সংরক্ষিত হল। প্রাথমিক নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা থাকল যাতে শুধু তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকদের ভোটাধিকার রইল। অবশ্য চূড়ান্ত নির্বাচন যুক্ত ভোটেই হবে।

এই চুক্তি বৃটিশ সরকার মেনে নেয় এবং মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা পেল। ২৬শে সেপ্টেম্বর বৈকালে উপবাস ভঙ্গ করলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ওই দিন দুপুরে মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ভাবাবেগে বিচলিত হয়ে পড়েন। উপবাসের দরুন মহাত্মাজীর অবস্থা খারাপ সংবাদ পেয়ে তিনি কলিকাতা হতে ছুটে আসেন এখানে। দুজনের অন্তরের কি গভীর যোগাযোগ! উপবাস আরম্ভের প্রাক্কালে মহাত্মাজী কবির আশীর্বাদ প্রার্থনা করে পত্র দিয়েছিলেন। কবিও মহাত্মাজীর পত্র পাওয়ার পূর্বেই তাঁর সমর্থন জানিয়ে তার করেন। উপবাস ভঙ্গের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজের একটি গান গাইলেন। এর পরের দিন ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মাজীর জন্মতিথি। তিথি অনুযায়ী জন্মদিন পালন করা প্রাচীন ভারতীয় প্রথা। যদিও সারা ভারতবর্ষে ২রা অক্টোবর মহাত্মাজীর জন্মদিন প্রতিপালিত

হয়, এখনও কোন কোন স্থানে বিশেষ করে গুজরাটে তিথি অনুযায়ী দিনটি পালন করা হয়। ২৭শে তিথি অনুযায়ী পুণায় মহাত্মাজীর জন্মদিন পালন করা হয়। পুণার জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বক্তৃতা দেন। "মহাত্মাজীর তপশ্চর্যার ফল হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তাঁর আরো বড় জয় হবে যদি আমরা অস্পৃশ্যতারূপ অন্যায়কে চিরকালের জন্য দূর করতে পারি।"—ঘোষণা করলেন কবি। মহাত্মাজী নিজেও উপবাস ভঙ্গের পর বিবৃতি দিয়ে সবাইকে অস্পৃশ্যতারূপ কলঙ্ককে সমূলে উৎপাটিত করার কথা বলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর মালব্যজীর সভাপতিত্বে বোম্বেতে এক জনসভা হয়। সেই সভায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজের জন্য এক সর্ব ভারতীয় অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ গঠনের প্রস্তাব হয়। সেই লীগের সভাপতি হলেন শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা ও সম্পাদক শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর। পরে এই লীগ হরিজন সেবক সঙ্ঘ নামে রূপান্তরিত হয়।

মহাত্মাজী অস্পৃশ্যদের হরির প্রিয় জন বা 'হরিজন' আখ্যা দেন। এই নামকরণ নিয়েও হয় আপত্তি। তার পিছনে যুক্তি যে একেবারে নেই তা নয়। পৃথক নামকরণও পার্থক্য জীইয়ে রাখে। অথচ সর্ব প্রকারের ভেদ দূর করাই ছিল মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য। এক কূয়া হতে জল নেওয়া, সবার সঙ্গে এক বিদ্যালয়ে পড়া, মন্দিরে প্রবেশ প্রভৃতি অধিকার এদের দিতেই হবে এই ছিল তাঁর কথা। স্বামী বিবেকানন্দ এদের অবদমিত সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন। মহাত্মাজী সে কথা যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। আধুনিক কালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রাজা রামমোহন রায় এদের অসুবিধা দূর করতে চেয়েছিলেন। এঁরা মহাত্মাজীর পূর্ববর্তী। কিন্তু এঁদের কাছ থেকে তিনি হরিজন সেবার প্রেরণা লাভ করেননি। নিজের অন্তর থেকেই সে প্রেরণা জাগে। অবশ্য মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা অধিকতর ফলবতী হয়। বহু মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়, বহু বিদ্যালয়েও এদের প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়, ইত্যাদি। এর

প্রধান কারণ মহাত্মাজী এদের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ তাঁর পরিকল্পিত স্বরাজ লাভের জন্য অস্পৃশ্যতা বর্জন অত্যাবশ্যক ছিল।

উপবাস ভঙ্গ হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর। ৩০শে সেপ্টেম্বর হতে পুনরায় মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়। জেল থেকে মহাত্মাজী হরিজন সেবার পুরাপুরি অধিকার চান। প্রথমে সরকার তা দেয় না। অবশেষে ৪ঠা নভেম্বর হতে সে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ৮ই মে তিনি পুনরায় একুশ দিন অনশন করার সংকল্প ঘোষণা করেন। এ অনশন সরকারের বিরুদ্ধে নয়। নিজের এবং সহকর্মীদের হরিজন সেবার জন্য আরো আত্মশুদ্ধি এর উদ্দেশ্য। অনশন আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পেয়ে তিনি যান পুণায় স্যার বিঠলদাস থ্যাকারসের প্রাসাদোপম 'পর্ণকুঠী'তে। সেখানে গিয়েও তিনি অনশন করেন। কারণ যে উদ্দেশ্যে অনশন করেন তা ত মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয় না। তখন মাধব শ্রীহরি আনে কংগ্রেসের ডিক্টেটর প্রেসিডেণ্ট। মহাত্মাজী তাঁকে ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার উপদেশ দেন এবং উপবাস শেষে বেঁচে থাকলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দেবেন জানান। শ্রীআনে এই উপদেশ মেনে যথারীতি নির্দেশ দেন। এই সময় শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ভিয়েনায়। আন্দোলন স্থগিতের ঘোর প্রতিবাদ করেন তাঁরা। মহাত্মাজী ব্যর্থ হয়েছেন, কংগ্রেসে অন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন, তাঁর সময় চলে গিয়েছে, তাঁর নেতৃত্ব হতে অবসর গ্রহণ করা উচিত এরূপ মত ব্যক্ত করেন। এঁরা যে ভ্রান্ত, পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। এর কাছাকাছি সময়ে এক জার্মান পণ্ডিত তাঁর বইতে লেখেন, "ইউরোপে আমরা অনেক সময় ভেবেছি তাঁর (গান্ধীর) সময় চলে গিয়েছে, কিন্তু এর চেয়ে অধিকতর ভুল আর কিছু হতে পারে

না।" ভারতবর্ষে ও বাইরে অনেকে অহিংস কার্যপদ্ধতি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করে এরূপ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। নূতন একটা জিনিস সম্বন্ধে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

উপবাস ভঙ্গের কিছুদিন পরে জুলাই মাসে পুণায় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন হয়। সেই সময় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে গোপন নীতি অবলম্বন করে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তা সম্যক্‌ভাবে অবগত হন মহাত্মাজী। উহা সত্যাগ্রহের নীতি নয় এ কথা স্পষ্টভাবে বিশিষ্ট কর্মীদের বলেন। তখন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য যুগলকিশোর, শ্রীগিরিধারী কৃপালানী ও শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী। আন্দোলন পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব ছিল এই তিন জনের। এই কর্মী সভায় গিয়ে বুঝতে পারি সব দিকে মহাত্মাজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কয়েক জন সভার তিন-চার দিন পূর্বে যান। আমিও সেরূপ একজন। শুধু আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে। খোঁজ করে জানতে পারি মহাত্মাজীর ইচ্ছানুসারে এ ব্যবস্থা হয়েছে। এরূপ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে থাকলে আমার সব দিক দিয়ে সুবিধা ও লাভ হবে এই বুদ্ধিতে তিনি তা করেছিলেন। লাভবান হয়েছি অনেক। তবে তা আলোচ্য নয় এখানে। মহাত্মাজীর দুর্বল শরীর। বহু চিন্তা। তার মধ্যেও সব দিকে নজর আমাকে মুগ্ধ করে। বুঝতে পারি তিনি বাস্তব জগতের মানুষ। বাস্তব আদর্শবাদী। এই কর্মী সভার আলোচনার ফল হল ব্যাপক আইন অমান্য বন্ধ। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার অনুমতি রইল।

এই সময় তিনি নিজ হাতে গড়া সবরমতী আশ্রম 'হরিজন সেবক সঙ্ঘের' হাতে তুলে দিলেন। তিনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য করা স্থির করেন। ১লা আগস্ট দিন নির্দিষ্ট। তার পূর্ব রাত্রেই আশ্রমের ৩৪ জন সহকর্মীসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক দিন পর তাঁকে ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যারবাদা গ্রামের সীমা ছেড়ে পুণায় গিয়ে বাস করার আদেশ জারী হয়। তিনি অবশ্য এই আদেশ অমান্য

করেন। এজন্য বিচারে তাঁর এক বৎসর জেল হয়। তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাবরণের পর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলতে থাকে। তিনি জেলে অবস্থানকালে হরিজন সেবার জন্য পূর্বের মত সুবিধা দাবী করেন। সরকার তা দিতে অস্বীকার করে। তিনি উপবাস আরম্ভ করেন। প্রথম সরকার খুব দৃঢ়তা দেখায়। কিন্তু অবস্থা খারাপ হলে তাঁকে সেসুন হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে ২৩শে আগস্ট বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পর মহাত্মাজী এ কথা ঘোষণা করেন যে, তিনি কারামুক্তির জন্য অনশন করেননি, হরিজন সেবার সুযোগের জন্যই করেছিলেন। কাজেই তিনি সাজা হওয়ার দিন হতে এক বৎসর পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক কাজে নিজেকে নিযুক্ত করবেন না। শুধু হরিজন সেবাই করবেন।

নভেম্বর মাসে হরিজন সেবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে বেরোন। ধনী দরিদ্রের কাছে অর্থ সংগ্রহ করেন। দরিদ্রের কাছ থেকে অল্প অল্প করে সংগ্রহ করাই তিনি অধিক পছন্দ করতেন। এ ভাবে দশ মাসে আট লক্ষ টাকা সংগৃহীত হল।

কিন্তু এই মহৎ কার্য করতে গিয়েও তাঁকে বাধার সন্মুখীন হতে হয়। ২৫শে জুন, ১৯৩৪ পুণা শহরে মিউনিসিপ্যালিটীর অভ্যর্থনা সভায় যাওয়ার সময় এক যুবক তাঁর গাড়ী মনে করে তার উপর বোমা ছোঁড়ে। উদ্দেশ্য মহাত্মাজীকে হত্যা। কিন্তু ভুলক্রমে সে বোমা অন্য গাড়ীতে পড়ে এবং কয়েক জন লোক আহত হয়। মহাত্মাজী সভায় গিয়ে উপস্থিত হন। এই ঘটনায় তিনি মোটেই দমে যাননি। অস্পৃশ্যতা সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। আবার নিজের অনুগামীদের অন্যায়ের জন্যও সাত দিন উপবাস করেন। একজন গোঁড়া হিন্দু হরিজন আন্দোলন নিয়ে মহাত্মাজীর প্রতি কটু বাক্য ব্যবহার করে। উত্তেজিত হয়ে তাকে আঘাত করে মহাত্মাজীর অনুগামীরা। এর জন্য করেন সাত দিন উপবাস। ১৯৩৩ সালে মহাত্মাজী পুণা হতে ইংরেজী সাপ্তাহিক হরিজন পত্রিকা প্রকাশ করা

স্থির করেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১১ই ফেব্রুয়ারী। সম্পাদক শ্রী আর, ভি, শাস্ত্রী। পরে এর গুজরাটী ও হিন্দী সংস্করণ বেরোয়। সরকারী আইনের প্রতিবাদে ১৯৩২ সালে ইয়ং ইণ্ডিয়া ও নবজীবন প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়। জাতির অগ্রগতিতে হরিজন পত্রিকার দান অসামান্য। মহাত্মাজী নিয়মিত লিখতেন এই কাগজে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ বিহারে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাট ধ্বংসলীলা চলে। বহু ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হয়, কয়েক হাজার লোক মারা যায়। মহাত্মাজী বিহারে এক মাস ভ্রমণ করেন। সেবাকার্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। বিহার ভূমিকম্প পাপের ফল, তিনি এরূপ বিবৃতি দেন। তা নিয়ে বিরূপ সমালোচনাও হয়।

এরূপ অবস্থায় মে মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করে। এই মে মাসে কোয়েটাতে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। কিন্তু এখানে মহাত্মা গান্ধীকে সরকার যেতে দেয় না এটি সৈন্যদের ছাউনি শহর এই অজুহাতে।

১৯৩৪ সাল মহাত্মাজীর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে তিনি কংগ্রেসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, কিন্তু এই বৎসরে তিনি কংগ্রেসের সভ্য না থাকার সিদ্ধান্ত করেন। এতদিন সারা ভারতবর্ষের আন্দোলন ও কাজকর্ম পরিচালনা করতেন সবরমতী আশ্রম হতে, এবার তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র হল ওয়ার্ধায়। একান্ত অনুগামী যমুনালালজীর বিশেষ আগ্রহেই তা হয়। এতদিন গঠনমূলক কাজের অর্থনৈতিক দিক বলতে তিনি শুধু চরখার উপরই জোর দিতেন, এবার অন্যান্য গ্রাম শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। বিধান সভা ইত্যাদিতে প্রবেশ সম্বন্ধে যদিও তাঁর মত অপরিবর্তিত ছিল তথাপি আইন অমান্য স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবারও কাউন্সিল প্রবেশের জন্য এক দল উৎসুক হওয়ায় তিনি কংগ্রেসের ভিতরে পার্লামেণ্টারী দল থাকার

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। অবশ্য তা সব সময় বিরোধিতার জন্য নয়, যতটুকু কাজ কাউন্সিলের মারফতে সম্ভব তা করবার জন্য। আর গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সভ্যরা যাতে গঠনমূলক কাজে অধিকতর উৎসাহী হয় তজ্জন্য তিনি বার্ষিক সম্মেলন করার প্রস্তাব করেন। প্রথম বৎসরের পর সব কয়টি সম্মেলনই হয় গ্রামে।

আইন অমান্য স্থগিত হওয়ার কিছুদিন পরে মহাত্মাজী এক বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেসের সভ্যপদ ত্যাগ করার সংকল্প ঘোষণা করেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ লোক তাঁর নীতিতে বিশ্বাসী নয় অতএব তাঁর পক্ষে কংগ্রেসের বাইরে থেকে কাজ করাই যুক্তিযুক্ত এ কথা বলেন। তিনি চরখা ও খাদিকে সর্বোপরি স্থান দেন কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সূতা কাটে না। কংগ্রেসে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, সত্যাগ্রহের মৌলিক নীতির প্রতি শুধু একটা মৌখিক বা ভাসা-ভাসা আস্থা, অস্পৃশ্যতা বর্জনের উপর বেশী জোর দেওয়ায় আইন অমান্যের কাজে ঢিলা পড়ার জন্য এক দলের অসন্তোষ এই সব কারণ উল্লেখ করেন। কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করলেও কংগ্রেসকে তাঁর পরামর্শ দিতে সব সময়ই প্রস্তুত থাকবেন এ কথাও বলেন। ১৯৩৪ সালের বোম্বে কংগ্রেস (অক্টোবর, ১৯৩৪) দুঃখের সঙ্গে তাঁর সরে যাওয়ার সংকল্প মেনে নেয়, তাঁর অসামান্য নেতৃত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেস তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশ হতে বঞ্চিত হবে না এই আশা ব্যক্ত করে। প্রয়োজন মত পরামর্শ ও নির্দেশ সব সময়ই তিনি দিয়েছেন। এক কথায় পূর্বের মতই তিনি কংগ্রেসের উপদেষ্টা ও পরিচালক রয়ে গেলেন।

এই কংগ্রেসে সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। এই কংগ্রেসে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ নামক একটি স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংস্থা পরিচালিত হবে মহাত্মাজীর পরামর্শ ও নির্দেশে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ জে, সি, কুমারাপ্পা সম্পাদক নিযুক্ত হন। গ্রামীণ অর্থনীতি এত ভাল খুব কম

লোকই ভারতবর্ষে বুঝতেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন ত্যাগী কঠোর পরিশ্রমী, সাদাসিধে ও কর্মকুশল। জন্মেছিলেন খৃষ্টান পরিবারে, কিন্তু সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ছিলেন গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ। জীবনে যে কয়জন লোকের সঙ্গে কাজ করে গর্ব অনুভব করেছি এবং প্রাণে এক অপরিসীম উৎসাহ পেয়েছি তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। দুঃখের বিষয় তিনি এখন আর এ জগতে নেই। অথচ তাঁর মত লোকের প্রয়োজন দেশে আজ সর্বাধিক। গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের কাজের জন্য এরূপ লোক নির্বাচন মহাত্মাজীর লোকনির্বাচনক্ষমতার পরিচায়ক।

তখন কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক এক দলের আবির্ভাব হয়। তাঁদের মুখপাত্র হিসাবে বোম্বে কংগ্রেসে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাবকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করেন। তখন তাঁরা গান্ধী নীতির বিরোধী। কালক্রমে অবশ্য জয়প্রকাশ নারায়ণের মতের পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে তিনি নিজেকে একজন গান্ধীনীতি অনুগামী বলে মনে করেন। এ পরিবর্তনের মূলেও ছিল বিরোধীদের প্রতি মহাত্মাজীর স্বাভাবিক উদারতা ও স্নেহপ্রবণ ব্যবহার।

মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্যক্রম ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়, তাতে প্রকাশ পায় তাঁর সামগ্রিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯২১ সাল হতে কংগ্রেসে তিনি চরখা ও সূতা কাটার উপর জোর দেন। ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ নামে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার সভাপতি। ১৯৩৪ সালে তিনি তাঁর অহিংস অর্থনীতিকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করলেন গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ। সে সঙ্ঘের তিনি উপদেষ্টা ও পরিচালক। তাঁর অহিংস অর্থনীতির আসল উদ্দেশ্য ছিল চারটি ঃ—(১) প্রত্যেকের জন্য সুষম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বস্ত্র, (২) রুচিসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসতবাটী, (৩) ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, ও (৪) অসুস্থের চিকিৎসা। এ সময় উপলব্ধি করলেন উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চরখার অতিরিক্ত অন্য

বাকী গ্রামশিল্পের পূনরুজ্জীবন প্রয়োজন। সুষম খাদ্য পেতে হলে কৃষি, গো-পালন প্রভৃতির উন্নতির প্রয়োজন। সেদিকে বিশেষ নজর দিলেন তিনি। তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। একজন লোকের কমপক্ষে কি কি খাওয়া প্রয়োজন তার তালিকা প্রস্তুত করালেন এবং কি ভাবে তা সমস্ত দেশে উৎপন্ন করা যায় সে বিষয়ে পুরা দৃষ্টি দিলেন। খাদ্য ব্যাপারে পরনির্ভরতা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। ভারতে সহজে উৎপন্ন শাক পাতা, তরিতরকারী, ফলমূল ইত্যাদি হতে কি ভাবে গরীবের সুষম খাদ্য জুটতে পারে সেদিকে চলল প্রয়োগ। সয়াবীন নিয়েও আরম্ভ করলেন প্রয়োগ। কলে ছাঁটাই চাউলের চেয়ে ঢেঁকিতে ভানা চাউল অধিকতর পুষ্টিকর, চিনির চেয়ে গুড় ভাল এ সব বিষয়ে প্রচারও চলল গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের তরফ হতে। দেশের সমস্ত খেজুর ও তাল গাছের রস হতে গুড় তৈরী করলে আখ চাষের জন্য এতটা জমির ব্যবহার না করে সেই জমিতে ধান, গম ও অন্য খাদ্য উৎপন্ন করা যায়। তাই চলল খেজুর ও তাল গুড় তৈরীর ব্যাপক প্রচেষ্টা। তিনি খাদ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন তথাপি গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের তরফে মাছ চাষের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন। আসল কথা ছিল জনগণের সুষম খাদ্য। ভারতের বর্তমান অবস্থায় কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবন ভিন্ন কৃষিও অচল হতে বাধ্য। আজ কৃষককে বৎসরের অধিকাংশ সময় বেকার থাকতে হয়। চরখা এবং তাঁত অবশ্য প্রধান কুটির এবং গ্রাম শিল্প। ঢেঁকিতে চাউল তৈরী, ঘানিতে তেল উৎপন্ন, খেজুর ও তাল গুড় তৈরী, কুটিরে কাগজ তৈরী প্রভৃতিও গ্রামের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজন। গ্রামগুলি আজ অতিশয় নোংরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং মল মূত্রাদি সাররূপে ব্যবহার করার উপর জোর দেয় গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ। জনসাধারণ যদি সুষম খাদ্য পায় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকে তবে অসুখের পরিমাণও খুব কম হবে। তাঁর কাছে চিকিৎসার স্থান ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল সুষম খাদ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন। এই মুখ্য জিনিসের উপরই ছিল তাঁর বিশেষ লক্ষ্য।

তিনি ওয়ার্ধায় এসে প্রথম কিছুদিন বাস করেন মহিলা আশ্রমের দোতালার একটি ঘরে। সেখানে বসেই গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের গঠন-বিধি তৈরী হয়। যমুনালালজী তাঁর বাগানবাড়ী এই কাজে দান করলে গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ এখানে স্থাপিত হয়। এই জায়গার নামকরণ হয় মগনবাড়ী—মগনলাল গান্ধীর স্মরণে। মহাত্মাজীও এই মগনবাড়ীতে বাস করতে থাকেন এবং সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। কিছুদিন এখানে থাকার পর তাঁর মনে হয় গ্রামের সমস্যা সম্যক্‌রূপে বুঝবার এবং তার সমাধানের জন্য গ্রামে বাস করা উচিত। তাই ১৯৩৬ সালে ওয়ার্ধা হতে পাঁচ মাইল দূরে সেগাঁও নামক গ্রামে গিয়ে বসতি আরম্ভ করেন। এই সেগাঁওই রূপান্তরিত হয় 'সেবাগ্রাম' নামে, এবং ক্ষুদ্র বসতি পরিণত হয় এক আশ্রমে। প্রথম প্রথম ওয়ার্ধা হতে সেবাগ্রামের রাস্তা বেশ দুর্গম ছিল, বিশেষ করে বর্ষাকালে। মহাত্মাজী হেঁটে অথবা খানিকটা হেঁটে খানিকটা গরুর গাড়ীতে আসতেন। জলকাদাময় ওই রাস্তা দিয়ে বহু বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি যেতেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তখন হতে সেবাগ্রাম হল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র।

১৯৩৪ সালে চরখা সঙ্ঘের কাজেও মহত্ত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। এতদিন পর্যন্ত চরখার কাজ মুখ্যতঃ চলছিল গরীবকে রিলিফ বা সাহায্য দেওয়ার উপায়স্বরূপ। খাদি সস্তা দামে উৎপন্ন করে শহরে বিক্রী করা এই ছিল উদ্দেশ্য। তাতে গরীব কাটুনীরা আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে এক আনার মত রোজগার করত। এ এক প্রকারের শোষণ। মহাত্মাজী চাইলেন শোষণ বন্ধ করতে এবং খাদিকে গ্রাম-উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ হতে রূপ দিতে। তাঁর বক্তব্য হল এই যে, সূতা কাটার উদ্দেশ্য বস্ত্র স্বাবলম্বন ও গ্রামের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত খাদি উৎপন্ন হলে তা নিকটবর্তী অঞ্চলে

বিক্রী হবে। বিক্রীর সময় দাম এভাবে স্থির করতে হবে যেন কাটুনী এক ঘণ্টা কাজ করে অন্ততঃ এক আনা রোজগার করতে পারে। এরও একটা ভিত্তি ছিল, আন্দাজে হিসাব নয়। ভারতবর্ষে পরিবার পিছু গড়ে পাঁচজন লোক। এর মধ্যে দুই জন কাজ করবে, আর বাকী তিন জন হবে তাদের উপর নির্ভরশীল। ১৯৩৪ সালের দামে এই পাঁচ-জনের গরীবভাবে খাওয়া বা জীবন যাপন মাসিক ৩০্ টাকায় হওয়া সম্ভবপর ছিল বলে তাঁর ধারণা। অতএব এই হিসাবে একজনের আয় মাসিক অন্ততঃ ১৫্ টাকা বা দৈনিক আট আনা হওয়া চাই। অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি এক আনা। মজুরী নির্ধারণের মানদণ্ড হল দুইজনের আয়ে পাঁচজনের জীবনধারণ। মহাত্মাজী সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয় নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। চরখা সঙ্ঘ মহাত্মাজীর ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে। বস্ত্র স্বাবলম্বনের দিকে জোর দেয় এবং দৈনিক আয় এক আনার বদলে তিন চার আনা করে। জানি না কবে মহাত্মাজীর দুই জনের আয়ে পাঁচ জনের জীবনধারণের এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যাবে। যত শীঘ্র করা যায় ততই দেশের মঙ্গল।

১৯৩৭ সালে মহাত্মাজী চরখা সঙ্ঘকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে রেজিস্ট্রী করার সিদ্ধান্ত করেন। এ বিষয়ে আলোচনার সময় কেউ কেউ সরকারকে টাকা দিতে হবে এই বলে আপত্তি উঠাল। মহাত্মাজী তখন বাইবেলের বিখ্যাত উক্তিটি করেন—"যা রাজার তা তাঁকে দাও।" যথারীতি রেজিস্ট্রী হয়।

বোম্বে কংগ্রেসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে 'না গ্রহণ, না বর্জন' নীতি গৃহীত হয়। মহাত্মাজীর এই মত ছিল। এ রোয়েদাদ কংগ্রেসের আদর্শবিরোধী বলে গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের জন্য বর্জন করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে চায় না কংগ্রেস। কারণ কংগ্রেসের কাম্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য। কিন্তু এ প্রস্তাব কিছু সংখ্যক লোকের

মনঃপূত হয় না। পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীআনে এই প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেস জাতীয় দল গঠন করে ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। বাংলা ও পাঞ্জাব এই দুই হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ। বাংলা কংগ্রেস একটি সাধারণ আসনেও জয়ী হয় না। সব কয়টি দখল করে কংগ্রেস জাতীয় দল। পাঞ্জাবে কংগ্রেস মাত্র একটি আসন দখল করে, বাকী সব কংগ্রেস জাতীয় দল। অন্যান্য প্রদেশে অবশ্য কংগ্রেসই অধিকাংশ সাধারণ আসন দখল করে।

১৯৩৩ সালে মহাত্মাজীর ছোট ছেলে শ্রীদেবদাস গান্ধীর সঙ্গে রাজাগোপালাচারিজীর কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীর বিবাহ হয়। এটি অসবর্ণ বিবাহ। বর বৈশ্য, কন্যা ব্রাহ্মণ। মহাত্মাজী প্রথম অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে। এরূপ ধরনের বিবাহও তাঁর পছন্দসই ছিল না। বর ও কন্যা উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুদিন কোন যোগাযোগ না থাকলেও যদি মত অপরিবর্তিত থাকে তবে বিবাহে সম্মতি দিতে রাজী হন। সেরূপই হয়। অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে এই সময় মহাত্মাজীর মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। সেবাগ্রামে তিনি এরূপ ধরনের বিবাহ দেওয়ায় খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকতেন বিবাহে। গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ ও গান্ধী নিধির প্রাক্তন সম্পাদক জি, রামচন্দ্রনের বিবাহ উল্লেখযোগ্য। এই সব বিবাহে খরচ হত নাম মাত্র। কোন প্রকারের আড়ম্বর ছিল না।

১৯৩৪ সাল হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি গ্রাম উন্নয়ন তথা গঠন-মূলক কাজে সমস্ত শরীর মন বুদ্ধি নিয়োজিত করেন। উদ্দেশ্য দেশকে স্বরাজ লাভের জন্য শক্তিশালী করা। ভারতবর্ষে শতকরা ৮০ জনের উপর লোক গ্রামে বাস করে। তাদের অধিকাংশ বুভুক্ষু, অশিক্ষিত ও শোষিত। তারা নিজেরাও নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন। গ্রামগুলি অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন। মহাত্মাজীর ভাষায় 'গোবর গাদা'। অতএব এই গ্রামবাসীদের সেবাই তিনি মনে করতেন ভারতের শ্রেষ্ঠ

সেবা। কর্মীদের সে ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন তিনি। কাজের সফলতা উপযুক্ত কর্মীর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। তাই তিনি সঙ্ঘের সভ্যদের বার্ষিক সম্মিলনের ভিতর দিয়ে প্রকৃত পথের নির্দেশ দিতে থাকেন।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ প্রথম স্থাপিত হয় ১৯২৩ সালে শ্রীযমুনালাল বাজাজের প্রচেষ্টায়। মহাত্মাজী তখন জেলে। যাঁরা মহাত্মাজীর প্রদর্শিত সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী তাঁরাই এই সঙ্ঘের সভ্য হন। কিন্তু দীর্ঘকাল এই সঙ্ঘ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। ১৯৩৪ সালে মহাত্মাজী গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মিলনী করার প্রস্তাব করেন। ওই সালে সঙ্ঘের গঠনবিধিও পরিবর্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ সঞ্চার হয় সঙ্ঘের। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে মহাত্মাজীর কার্যক্রমে বিশ্বাসী কর্মীরা এসে সমবেত হয়। প্রথম সম্মিলনী হয় ১৯৩৫ সালে ওয়ার্ধায়। তার পরের পাঁচটি সম্মিলনই হয় গ্রামে। গ্রামের উন্নতির উদ্দেশ্যে এবং সকল কর্মীর গ্রামের সমস্যার সঙ্গে সুপরিচিত হওয়ার জন্য এই পথ দেখান মহাত্মাজী। দ্বিতীয় সম্মিলন (১৯৩৬) হয় মধ্য-প্রদেশের চান্দা জিলার শাওলী নামক গ্রামে। সেই গ্রামে একটি খাদি কেন্দ্র ছিল। তৃতীয় সম্মিলন (১৯৩৭) হয় কর্নাটকের বেলগাঁও জিলার হুদলী নামক গ্রামে। এই গ্রামে কর্নাটকের প্রসিদ্ধ নেতা গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডের বাসস্থান। তাঁরই ইচ্ছায় এখানে এই সম্মিলন হয়। বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মাজী সভাপতি, আর ইনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। লোকমান্য তিলকের বিশিষ্ট সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন একজন মহাত্মাজীর পুরাপুরি অনুগামী। এরূপ সরল নিরভিমান ও তেজস্বী নেতা যে কোন প্রদেশের পক্ষে গৌরবের। দুঃখের বিষয় তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। চতুর্থ সম্মিলন (১৯৩৮) হয় উৎকল প্রদেশের পুরী জেলার ডেলাঙ্গ নামক গ্রামে। সেখানে গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম সম্মিলন (১৯৩৯) হয় বিহারে বেতিয়ার নিকটবর্তী বৃন্দাবন নামক গ্রামে। আর ষষ্ঠ সম্মিলন হয়

বাংলা দেশে ঢাকা জিলার মালিকান্দা গ্রামে। এই সব সম্মিলনে মহাত্মাজী উপস্থিত থেকে, ভাষণ দিয়ে, আলোচনা ইত্যাদি করে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতেন। সমবেত প্রার্থনা এবং সূতা কাটায় তিনি যোগ দিতেন। সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা ও সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ শ্রীধর ধোত্রে। কিশোরলালজী ছিলেন চিন্তাশীল, সুবক্তা ও সুলেখক। গান্ধী নীতির ব্যাখ্যাতা হিসাবে তিনি ছিলেন গঠনমূলক কর্মীদের খুব শ্রদ্ধার পাত্র। এরূপ সরল নিরভিমান পণ্ডিত লোক খুব কম দেখেছি। হাঁপানি রোগে ভুগতেন। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট কাজ করতেন। বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে মহাত্মাজীর চিন্তাধারা খুব সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করতেন। তাতে কর্মীরা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হত। ১৯৩৯ সালের বীরভূম জিলার তাঁতি-পাড়া গ্রামে বাংলার গঠনমূলক কর্মীদের সভায় তাঁর বক্তৃতা সবাইকে প্রেরণা যোগায়। সে ঝঙ্কার আজও প্রাণের তারে বাজে। আজকের বিচার-বিভ্রান্তির দিনে তাঁর অভাব খুবই অনুভব করছি।

এই সব সম্মিলনে যাতে কম খরচ হয় সেদিকে দৃষ্টি ছিল প্রখর। সঙ্ঘের সভ্যরা খুব সাদাসিধে ভাবে থাকতেন, খাওয়া দাওয়াও ছিল সাধারণ রকমের অথচ পুষ্টিকর। যাতে অভ্যর্থনা সমিতির উপর চাপ বেশী না পড়ে তজ্জন্য প্রত্যেক সভ্য থালা, গ্লাস, বালতি ও হারিকেন ল্যাণ্টার্ন নিয়ে আসত। অসুস্থ বা বয়স্থ ভিন্ন কারো জন্য খাটের ব্যবস্থা হত না। খড়ের বা চেরা বাঁশের ছাউনিওয়ালা ঘর, আর খড়ের উপর বিছানা পেতে ছিল শোয়ার ব্যবস্থা। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক কয়েক দিন (চার থেকে সাত দিন) একত্র থেকে পরস্পরের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হত। আদর্শ ত এক ছিলই। এর ভিতর দিয়ে অজান্তে গড়ে উঠত ভারতীয় ঐক্য। অবশ্য যাতে সব সভ্যই উপস্থিত হতে পারেন তজ্জন্য অসমর্থ সভ্যদের যাতায়াতের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিত অভ্যর্থনা সমিতি। সম্মিলনে কলের চাউল, আটা, তেল প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। ঢেঁকি ছাঁটা

চাউল, জাঁতা ভাঙ্গা আটা, ঘানির তেল ব্যবহৃত হত। গুড়ই খাওয়া হত, চিনি নয়। দুধ হিসাবে শুধু টাটকা গরুর দুধই দেওয়া হত—মহিষের দুধ নয়। ঘিও ব্যবহৃত হত গরুর দুধ হতে তৈরী। মহিষের দুধ উৎপাদনের চেষ্টা না করে শুধু গরুর দুধ উৎপাদনের পক্ষপাতী ছিলেন মহাত্মাজী। ইহা বিজ্ঞানসম্মতও। শিশুদের জন্য মায়ের দুধ উত্তম। তার পর গরুর দুধ। অতএব গরুর যত্ন নেওয়াই প্রথম কর্তব্য। ভারতের বর্তমান অবস্থায় গরুরই যথেষ্ট যত্ন নেওয়া যখন সম্ভব হচ্ছে না, তদুপরি মহিষের যত্ন নেওয়ার কথা অবাস্তব এই ছিল তাঁর মত।

সম্মিলনের সঙ্গে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনী হত। শাওলী সম্মিলনে সারা ভারতবর্ষ হতে জিনিস এসেছিল। তা মহাত্মাজীর মনঃপূত হয়নি। এর পর যে প্রদেশে সম্মিলনী হয়েছে সে প্রদেশের বা অঞ্চলের জিনিস স্থান পেয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস প্রত্যেক অঞ্চলে তৈরী ও ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ হতে এই সব প্রদর্শনী হত। এইখানেই প্রশ্ন উঠে তবে কি মহাত্মাজী বৃহৎ শিল্পের বিরোধী ছিলেন? তা নয়। তিনি চাইতেন দুইয়ের সামঞ্জস্য। যে সব জিনিস সহজে কুটিরে উৎপন্ন করা যায় তার জন্য বৃহৎ শিল্প কারখানা করার বিরোধী ছিলেন তিনি। ১৯৩৮ সালে ওয়ার্ধায় মগন সংগ্রহালয়ের উদ্বোধনের পর এক দল অর্থনীতিবিদ্ তাঁকে প্রশ্ন করেন এবং তিনি তার উত্তর দেন। সে প্রশ্নোত্তর তুলে দিলেই তাঁর মত বুঝতে পারা যাবে।

প্রঃ—আপনি কি ব্যাপক উৎপাদনের (বৃহৎ শিল্পের) বিরোধী?

উঃ—আমি কখনো সেরূপ বলিনি। আমার সম্বন্ধে লোকের অনেক কুসংস্কার আছে। ওরূপ বিশ্বাস তার মধ্যে একটি। গ্রামবাসীরা যা সহজে উৎপন্ন করতে পারে তার ব্যাপক উৎপাদন প্রচেষ্টার আমি বিরোধী।

বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্পের সামঞ্জস্যের জন্য এই ক্ষেত্রবিভাগ নিতান্ত প্রয়োজন। তার অভাবে সরকারের অর্থব্যয় সত্ত্বেও কুটির

শিল্পের প্রসার হচ্ছে না। এ কথা সরকারকে ও গঠনমূলক কর্মীদের উপলব্ধি করতে হবে। আজ আমাদের যথেষ্ট অর্থ নেই, বিশেষজ্ঞ নেই যে আমরা সব জিনিস তৈরীর জন্য বৃহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে পারি। কাজেই যা সহজে কুটিরে উৎপন্ন করা যায় তা উৎপাদনের জন্য কারখানা তৈরী না করে অন্য অত্যাবশ্যক জিনিসের জন্য কারখানা সৃষ্টি করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। নতুবা আধুনিকতার নামে অনগ্রসরতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। মহাত্মাজী বর্তমান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ এক ব্যক্তির নামানুসারে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান। কাজেই একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল। তাই শাওলী সম্মিলনে মহাত্মাজী এ বিষয়ে সভ্যদের হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "গান্ধীবাদ বলে কোন জিনিস নেই, এবং আমার মৃত্যুর পর কোন সম্প্রদায় রেখে যেতে চাই না। আমি কোন নূতন মতবাদ প্রবর্তনের দাবী রাখি না।···জগৎকে আমার নূতন কিছু শেখাবার নেই। সত্য ও অহিংসা পাহাড় পর্বতের মতই প্রাচীন। আমি খুব ব্যাপকভাবেই দুইয়ের প্রয়োগ করেছি মাত্র।" মালিকান্দা সম্মিলনেও দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "আসল কথা এই যে, আপনাদের 'গান্ধীবাদ' নামই বাদ দিতে হবে। নইলে আপনারা অন্ধকূপে পতিত হবেন। 'গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক' এই ধ্বনি আমার প্রিয় লাগে। 'বাদ' নাশ হওয়া ত উচিতই। বাদ ত বাজে জিনিস। আসল জিনিস অহিংসা। উহা অমর। তা বেঁচে থাকুক, এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। গান্ধীবাদের ধ্বংস ত আমি শীঘ্রই দেখতে চাই। আপনারা কোন সম্প্রদায় তৈরী করবেন না। সম্প্রদায় তৈরী করা আমার স্বপ্নেও কখনো আসেনি। আমার মৃত্যুর পর যদি কোন সম্প্রদায় গড়ে উঠে তবে আমার আত্মা কাঁদবে।" রাজনৈতিক ও গঠনমূলক কাজ একে অন্যের বিরোধী কিনা এবং দুইয়ের মধ্যে কোন মিল আছে কিনা এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেন তিনি শাওলীতে—"আমি

দেখছি রাজনীতি ও গঠনমূলক কাজ পরস্পর সামঞ্জস্যহীন বা বিরোধী এরূপ একটা বিশ্বাসের প্রবণতা রয়েছে। এই বিশ্বাস হতে ভুল বুঝাবুঝির উদ্ভব।...তথাকথিত রাজনীতি ও গঠনমূলক কাজ দুয়ের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। আমাদের কার্যপ্রণালীতে যোগাযোগ-হীন কামরা নেই। তবে কাজের সুবিধার জন্য এক সময়ে এক জনের একটি কাজে নিযুক্ত থাকা ভাল।”

হুদলী সম্মিলনে বিশদ আলোচনা করে সঙ্ঘের কর্মীদের শুধু ব্যক্তিগত হিসাবে নয় সঙ্ঘের সভ্য হিসাবেও রাজনীতিতে ভাগ নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। মহাত্মাজীর সম্মতি ছিল তাতে। এতে কোন কোন মহলে এরূপ ধারণা হয় যে, মহাত্মাজী কংগ্রেসের বাইরে পৃথক্ একটি কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়ে তুলছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা তখন সারা ভারতবর্ষে মাত্র চারশত খানেক। তারা সকলেই কংগ্রেসের কোন-না-কোন গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত। তথাপি হুদলা সিদ্ধান্তের ফলে এরূপ ভুল ধারণা হওয়া সম্ভব ভেবে মহাত্মাজী ওই সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয়নি মনে করলেন এবং প্রকাশ্যভাবে বললেন, “হুদলীতে আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করার কথা বলি। না বুঝে আমি ভুল করেছি। তবে যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।...ক্রটী যখন স্বীকার করা হয় তখন আর ক্রটী থাকে না। নিজের ভুল স্বীকার করায় শক্তি বাড়ে।” তিনি ভুল করেন এ কথা অকপটে স্বীকার করতে মহাত্মাজীর কোন দ্বিধা ছিল না। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। তাঁর কথা ছিল এই যে, তিনি ভুল করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন, তবে যখন যেটা সত্য বলে মনে করেছেন তা-ই কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। আজ দেখছি উচ্চপদে ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ভুল করেছেন বা করতে পারেন বলেই স্বীকার করতে চান না। তাঁরা যে অতি সাধারণ লোকের স্তরে এই তার প্রমাণ।

ডেলাঙ্গে চতুর্থ সাম্মলনের সময় একটি ঘটনায় মহাত্মাজীর মন খুব

বিচলিত হয়। রক্তের চাপ বেড়ে যায়। বেশ চিন্তার কারণ হয়। কস্তুরবা ও মহাদেব ভাইয়ের স্ত্রী দুর্গাবাঈ পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথ দর্শন করে আসেন। সম্মিলন আরম্ভ হওয়ার দিনেই মহাত্মাজী সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পুরীর মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশের অধিকার নেই অতএব সেখানে কারো প্রবেশ করা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও এঁদের মন্দিরে প্রবেশের কথা শুনে মহাত্মাজী অত্যন্ত দুঃখিত হন ও তার অভিব্যক্তি দেন। প্রিয়জনদের পর্যন্ত নিজ মতে আনতে পারেননি বলেই অপরিসীম দুঃখ।

কস্তুরবা বা দুর্গাবাঈ তখন অস্পৃশ্যতা মানতেন না। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পাওয়া উচিতও মনে করতেন। তথাপি এ কাজ কেন করলেন। আমার ত মনে হয় ভক্তির আবেগে তাঁরা জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁরা কোন অপরাধ করেছেন বলে ডেলাঙ্গেও আমার মনে হয়নি, আজ পঁচিশ বৎসর পরেও তা মনে হচ্ছে না। শ্রী চৈতন্যদেব বলতেন 'হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ।' তিনি জানতেন পুরীর মন্দিরে চণ্ডালদের তথা হরিজনদের প্রবেশের অধিকার নেই। তথাপি তিনি ভাবে গদগদ হয়ে মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ তথা ভগবান দর্শন করতেন। তিনি কোন অন্যায় করেছেন বলে বাংলা বা উড়িষ্যার কোন লোক ভাবেননি। কস্তুরবা ও দুর্গাবাঈয়ের বেলায় আমরা কেন তা ভাবব এই কথা এখনো আমার মনে হচ্ছে। নিজের আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে মহাত্মাজী অন্যের প্রাণের দিকটা ভুলে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কস্তুরবা ত স্বামীর গভীর মর্মবেদনা উপলব্ধি করে ক্ষমা চাইলেন। এখানেই কস্তুরবা বাপুর চেয়ে বড়। তিনি ছিলেন সরল সাদাসিধে ধর্মপরায়ণ মহিলা। আদর্শকে রূপ দেওয়ার বোঝা তাঁর ঘাড়ে ছিল না।

বৃন্দাবনে (বিহার) পঞ্চম সম্মিলনীতে বলেন "আপনারা কেউ কেউ গান্ধীবাদী হিসাবে পরিচিত। গান্ধীবাদী কোন যোগ্য নাম নয়। তার চেয়ে অহিংসাবাদী বলে পরিচিত হওয়া ভাল। গান্ধী ভাল ও

মন্দ, শক্তি ও দুর্বলতা, হিংসা ও অহিংসার সংমিশ্রণ। কিন্তু অহিংসায় কোন ভেজাল নেই।"

সঙ্ঘের সভ্যদের দুর্বলতার দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং হঠকারিতা রয়েছে এ কথা বলেন। আদর্শনিষ্ঠার প্রতি খুব জোর দেন। "সত্যাগ্রহীর ভগবানে জীবন্ত বিশ্বাস প্রয়োজন। যার সে বিশ্বাস নেই তার গান্ধী সেবা সঙ্ঘ ত্যাগ করা উচিত, সত্যাগ্রহের নামও ভুলে যাওয়া উচিত।" একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করেন, "কমিউনিস্টরা এবং কোন কোন সোস্যালিস্ট ভগবানে বিশ্বাস করে না। তারা কি সত্যাগ্রহী হতে পারে না?" উত্তরে মহাত্মাজী বলেন, "দুঃখিত, না। কারণ সত্যাগ্রহীর ভগবান ভিন্ন আর কোন অবলম্বন নেই। যার অন্য কোন অবলম্বন আছে বা যে অন্য কোন সাহায্যের উপর নির্ভর করে, সে সত্যাগ্রহ করতে পারে না। সে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী, অসহযোগী হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্যাগ্রহী নয়।"

মালিকান্দায় ষষ্ঠ সম্মিলন হয় ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই অহিংসার প্রয়োগ লক্ষ্য করবার মত। মালিকান্দায় মহাত্মাজীর সে প্রয়োগ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই প্রস্তাব মহাত্মাজীর মুসাবিদা। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বাতিল করে এড্ হক কমিটী গঠনের প্রস্তাবও করে ওয়ার্কিং কমিটী। এতে সুভাষবাবুও তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ওয়ার্ধা হতে মহাত্মাজীর রওনা হওয়ার দিন সাতেক পূর্বে সুভাষবাবু মহাত্মাজীকে এ সময়ে বাংলা দেশে না আসবার জন্য অনুরোধ করেন। আমাকে টেলিফোন করে বলেন "এ সময়ে আসাটা বন্ধ কর।" আমি তাঁকে বলি "শেষ মুহূর্তে কার্যক্রম বাতিল করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, মহাত্মাজী তোমার রাজনৈতিক কাজের

বিরোধিতার জন্য বাংলা দেশে আসছেন না। আসছেন গঠনমূলক কাজের প্রসারের জন্য। আর মহাত্মাজীর নিজ মত বলবার অধিকার আছে। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি মালিকান্দা আসবার জন্য। মহাত্মাজীর মর্যাদা যেমন রক্ষা করব, তেমনি তোমারও। জনসভায় মহাত্মাজী বলবেন। তুমিও তোমার বক্তব্য বলবার পূর্ণ সুযোগ পাবে।" তখন সুভাষবাবু শুধু এ কথা বলেন "জনসাধারণ এ সময় উত্তেজিত। কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখন স্থগিত রেখে পরে আনলেই ভাল হয়।" আমি অবশ্য তাতে সম্মত হই না। এই কথাবার্তার কয়েক ঘণ্টা পরে মহাদেব ভাই ট্রাঙ্ক টেলিফোন করেন মহাত্মাজীর আসা সম্বন্ধে। সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে তা বলি। সুভাষবাবুকে মালিকান্দা আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছি এ কথা শুনে মহাত্মাজীর মনের দ্বিধা চলে যায় এবং তিনি যথাসময়ে আসছেন এ কথা মহাদেব ভাই আমাকে জানান। কস্তুরবাও আসেন সঙ্গে।

বাংলা দেশে এসে মহাত্মাজী প্রথম শান্তিনিকেতনে যান। কবিগুরু তাঁকে আম্রকুঞ্জে সমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা দেন। বলেন "আপনাকে আমাদের একজন বলেই গ্রহণ করেছি, কারণ আপনি সমস্ত মানব জাতির।" এর পূর্বে তিনি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপ করেন এবং আলাপের শেষে মহাত্মাজীর হাতে ছোট্ট একখানা চিঠি দেন। তাতে অতীতে যেমন মহাত্মাজী এ প্রতিষ্ঠানকে এক বার নষ্ট হওয়ার অবস্থা হতে বাঁচিয়েছেন ভবিষ্যতেও তেমনি একে বাঁচিয়ে রাখার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। মহাত্মাজী সম্বর্ধনা সভায় এ বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন "একে রক্ষা করার আমি কে? ভগবানই একে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন, কারণ ইহা একটি অকপট আত্মার সৃষ্টি।... আমার সাধ্যানুযায়ী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমি গুরুদেবকে দিয়েছি।"

পূর্বেকার সাহায্যের কথা উল্লেখ আছে কবিগুরুর পত্রে। শান্তিনিকেতন পরিচালনায় দেনাগ্রস্ত হন কবি। নাচ, গান ইত্যাদি

করে দেনা শোধের আশায় অসুস্থ শরীরেও কবিগুরু এক দল নিয়ে দিল্লী যান। মহাত্মাজী তখন দিল্লীতে। অসুস্থ শরীরে কবিগুরু নাচ গানের দল নিয়ে দিল্লীতে এ কথা শুনে তিনি ব্যথিত হন। তিনি সাক্ষাৎ করে বলেন "গুরুদেব, এই অসুস্থ শরীরে নাচ গানের দল নিয়ে কেন এসেছেন?" উত্তরে কবিগুরু বলেন "কি করব, বিশ্বভারতীর দেনা হয়েছে তাই বাধ্য হয়ে এসেছি।" দেনার পরিমাণ জেনে নিয়ে মহাত্মাজী বলেন "যদি ওই পরিমাণ টাকা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে ত নাচ গান ইত্যাদি হতে বিরত হবেন?" কবিগুরু সম্মতি জানান। মহাত্মাজীর কথায় শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা ওই টাকা (ষাট হাজার) দিয়ে দেন। অসুস্থ শরীরে কবিগুরুকে আর কষ্ট করতে হয় না। মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন। মতভেদ সে বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি।

কলিকাতা হতে মালিকান্দা আসবার পথে শিয়ালদহ ও আরো কয়েকটি স্টেশনে 'গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক', 'এড্ হক কমিটী চাই না' প্রভৃতি চীৎকার ও কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন হয়। সকালে মালিকান্দা পৌঁছেই মহাত্মাজীর প্রথম কাজ ছিল প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন। কয়েক হাজার লোক সমবেত। শান্তভাবে উপবিষ্ট। এত ভিড়ের মধ্যেও মহাত্মাজীর যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার। কিন্তু একটু দূর হতে ৪০।৫০ জন লোক কালো পতাকা হাতে 'গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক' এই চীৎকার করতে করতে আসতে থাকে। মহাত্মাজী তাদের সামনে আসতে দিতে বলেন। সেরূপ ব্যবস্থা হয়। তারপর তিনি তাদের লক্ষ্য করে খুব মিষ্টি ভাষায় যুক্তিপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেন। তারা চুপ হয়ে যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মহাত্মাজী বক্তৃতা দেন এক বারও চীৎকার করে না। বিরোধীদের সংখ্যা যত কমই হোক না কেন তাদের হৃদয় জয় করবার প্রচেষ্টা দেখলাম মহাত্মাজীর মধ্যে। জনসাধারণও 'গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক' এর প্রতিবাদে কোন চীৎকার করেনি। তারা সব সময়েই শান্ত ছিল। মহাত্মাজী জনতার শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রশংসা

করেন ঃ "আপনারা এত বেশী সংখ্যায় এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনারা নিয়মানুবর্তী ও সংযত থেকে আমাকে এ পর্যন্ত আসতে দিয়েছেন। আমি আশা করি আপনাদের নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম অন্যেরা অনুকরণ করবে।" একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত ছিল এই সম্মিলনে। প্রতিদিন হাজারে হাজারে মেয়ে পুরুষ, হিন্দু মুসলমান আসত মহাত্মাজীকে দর্শন করতে। কোন গণ্ড-গোল নেই, হুড়াহুড়ি নেই। গাছতলায় শুয়ে থেকে রান্না করে খেয়ে তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করেছে। তাদের অধিকাংশেরই মহাত্মাজীর রীতিনীতি বা স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। অধিকাংশই এসেছিল তাঁকে অর্থাৎ মহাপুরুষকে দর্শন করে পুণ্য লাভ করতে—তাতেই তারা সন্তুষ্ট।

পর্দানশীন মুসলমান মেয়েরা এমনকি মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়ীর মেয়েরাও পূর্বে ব্যবস্থা করে এসেছে তাঁর ঘরে তাঁকে দেখতে। এ অঞ্চলে অর্থাৎ ওই থানায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা তখন ছিল শতকরা প্রায় ৭৫ জন। তাদের হিন্দুদের কাছে ভয় করার কিছু ছিল না। আর তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। তথাপি একজন মুসলমানও মহাত্মাজীর প্রতি কোন অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেনি। সব সময় শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়েছে।

সম্মিলনী উপলক্ষ্যে রোজই বৈকালে জনসভার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিন বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো ও শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনের। সতীনবাবুর বক্তৃতা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুর সমর্থক বলে যারা পরিচয় দেয় এরূপ কিছু লোক গণ্ডগোল ও মারপিট আরম্ভ করে। সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবকরা মার খায়, কিন্তু মারে না। তবে সাধারণ লোকেদের যখন মারতে আরম্ভ করে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক খালি হাতে এবং আক্রমণকারীদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে

নিয়ে মার দেয়। এদের মধ্যে নমঃশূদ্র শক্তিশালী লোকও ছিল। তারা এসে আমাকে বলে যে, মহাত্মাজী না থাকলে এদের পিটিয়ে নদীতে ফেলে দিতাম। সম্মিলনীর অধিবেশন হয় পদ্মা নদীর চরে এক বিরাট জায়গা জুড়ে। এ সব কথা মহাত্মাজীকে খুলে বলি। তিনি সব শুনে অতিশয় সুপরামর্শ দেন: "বক্তৃতা মঞ্চ ও স্থান বিরোধীদের হাতে ছেড়ে দাও। তারা যত খুশী বক্তৃতা দিক।" এর ফল হল ভাল। এদের বক্তৃতা শুনতে বড় বেশী কেউ যেত না। আর মহাত্মাজী আসছেন শুনলে ত সবাই সভাস্থান হতে ছুটে আসত তাঁকে দেখতে। এরূপ ভাবে দুই-তিন দিন চলার পর বিরোধীরা হাল ছেড়ে দেয়। নির্দিষ্ট দিনে মহাত্মাজীর বক্তৃতা হয়। এক বিরাট জনতা। চল্লিশ হাজারের উপর লোক নিঃশব্দে মহাত্মাজীর বক্তৃতা শোনে। বিরোধীরাও কালো পতাকা দেখায় না বা কোনরূপ চীৎকার করে না। এই জনতার অর্ধেকই ছিল মুসলমান।

এই সব সম্মিলন খুব কম খরচে হোক তা চাইতেন মহাত্মাজী। সভ্যদের যাতায়াত বাবদ দেওয়া টাকা বাদ দিলে মালিকান্দায় সর্ব সাকুল্যে খরচ হয়েছিল আট হাজার টাকার মত। বাপুর আদর্শ ছিল পাঁচ হাজার টাকা। খাওয়া খরচ হয়েছিল গড়ে মাথাপিছু দৈনিক সাড়ে পাঁচ আনা। সকাল বেলার জল খাবার এবং দুপুর ও বিকালের খাওয়া সমেত। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতিতে ছয় আনা করে খাওয়ার বাজেট পাশ করানো ছিল। মহাত্মাজীর উপস্থিতিতেই তা পাশ হয়। মহাত্মাজীর সঙ্গী একজন গিয়ে খাওয়ার বিলাসিতা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে নালিশ করে। তাঁর মঞ্জুরীকৃত পরিমাণের চেয়ে কম খরচ করছি এ কথা বলায় খুব খুশী হয়ে বলেন "তব্ মিঞা তিন আনা মে খিলাও।" তখন আমি বলি "বাপু, যা খাওয়াচ্ছি সুষম খাদ্যের দৃষ্টিতে তা প্রয়োজন, অতএব আমি কম খাওয়াতে পারব না।" মহাত্মাজী আর কিছু বলেন না। যখন মহাদেব ভাইয়ের কাছে কি পরিমাণ দুধ, ঘি ইত্যাদি মাথাপিছু বরাদ্দ আছে বলতে যাই, প্রথমেই

বলে উঠেন "তাকে কি কেউ ক্লোরোফরম করে খাইয়েছিল ? খায় বা কেন, আবার নালিশই বা করে কেন। এখানে এসে একটু ঠিক মত খাওয়ার পাচ্ছি, এতেও তার আপত্তি।" মহাত্মাজীর খাওয়া অবশ্য পৃথক্ ছিল। প্রচুর রশুনবাটা খেতেন তিনি, রক্তের চাপ কমাবার জন্য। স্থানীয় লোকের বাড়ীতে যে সব ফল জন্মে অথবা স্থানীয় বাজারে যা পাওয়া যায় তিনি তা-ই খেতেন। ছাগলের দুধ, টমাটো ও কমলালেবু ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। বাইরের থেকে আনা আঙ্গুর খেতেন না। নোয়াখালীতে তাঁকে কাঁঠাল খেতেও দেখেছি। যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখিনি। মহাত্মাজী সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার আছে। তার মধ্যে এও একটি যে তিনি দৈনিক তিন আনায় খেতেন। তাঁর কথা ছিল বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সম্মিলনীতে সভ্যদের খাওয়া দৈনিক তিন আনায় হয়নি। আমি পাঁচটি সম্মিলনীতেই উপস্থিত ছিলাম। যে খাওয়া খেয়েছি তা তিন আনায় দেওয়া তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

মালিকান্দায় বহু লোক আসেন মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দুই দল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ উল্লেখযোগ্য। নোয়াখালীর শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী কয়েকজন সঙ্গীসহ সাক্ষাৎ করেন। আলাপপ্রসঙ্গে মহাত্মাজী এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন যে অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে উপায় যার সাধ্যাতীত তার পক্ষে ভীরুতার আশ্রয় না নিয়ে হিংসাত্মক কার্য করাও ভাল। অত্যাচারিত হিন্দুদের রক্ষা করা কি সাম্প্রদায়িকতা এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "অবশ্য নয়। অত্যাচারিত হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক তাকে রক্ষা করা সঙ্গত।"

এক দল তাদের কল্পিত 'চলমান গান্ধীবাদ' সম্বন্ধে আলাপ করেন। আমি উপস্থিত ছিলাম সে সময়ে। সাক্ষাৎকারীরা চলে যাওয়ার পর মহাত্মাজী আমাকে বলেন "এরা কি বলছে বুঝছি না।" আমি বলি "আমিই কি বুঝেছি! আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে, আমি আপনাকে বলে ব্যবস্থা করেছি মাত্র।" কোন মত যদি মনঃপুত না

হয় তাকে স্থিতিশীল বলা এবং নিজের মতকে চলমান বলা মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা।

মালিকান্দায় গান্ধী সেবা সঙ্ঘের শেষ সম্মিলন। সঙ্ঘকে নূতনরূপে ঢেলে সাজা হয় মহাত্মাজীর পরামর্শে। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন দশ জন লোক নিয়ে সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। আর কোন সভ্য থাকে না। চরখা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, হরিজন সেবক সঙ্ঘ ও তালিমী সঙ্ঘ থাকার পর গান্ধী সেবা সঙ্ঘের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নেই। নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হল রচনাত্মক কার্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। আসলে কিন্তু এখানেই হল গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বিলুপ্তি। তা যুক্তিযুক্তই হয়েছিল। প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়তা নেই, দ্বিতীয়তঃ অযথা বিরূপভাব সৃষ্টির সুযোগ হয়। তৃতীয়তঃ সঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ। এ বিষয়ে একান্তে যখন আলাপ হয় বলি, "বাপু, ভক্তদের পরস্পরের প্রতি আচরণে বিরক্ত হয়ে বুদ্ধদেব এক বার জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি ভাগ্যবান, আপনার এখনও সে অবস্থা হয়নি। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ এরূপভাবে আরো কিছুকাল চললে পরে কি অবস্থা হবে জানি না।" বাপু প্রাণভরে হাসলেন। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা তাঁর বৈপ্লবিক মনেরই পরিচায়ক।

১৯৩৪ সালে মহাত্মাজী কংগ্রেসের সভ্যপদ ত্যাগ করেন। তারপর প্রথম কংগ্রেস হয় ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে। সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহেরু। তিনি সদ্য ইউরোপ থেকে ফিরেছেন সোস্যালিজমের ধারণা নিয়ে। মহাত্মাজী শুধু খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের প্রদর্শনী উদ্বোধন করা ভিন্ন কংগ্রেসের অন্য কোন কাজে যোগ দেননি। তার মুখ্য কারণ শারীরিক অসুস্থতা। ১৯৩৫ সালে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম এবং খুব সম্ভবতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাববশতঃ তাঁর রক্তের চাপ আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে যায়। বিশ্রামও নিতে হয় তাঁকে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে এখন সুস্পষ্ট দুই মত। জওহরলালজীর মতাবলম্বী অল্প সংখ্যক। কিন্তু এই দুই দল যাতে একসঙ্গে চলে সেদিকে ছিল মহাত্মাজীর সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা। তাতে সফলও হন।

নূতন শাসন সংস্কার আইন নিন্দনীয় মনে করেও কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করা স্থির করে। কিন্তু আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হবে কিনা তা স্থির করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর। নির্বাচনে কংগ্রেস বিরাট সাফল্য লাভ করে। জওহরলালজী ও সুভাষবাবু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী, রাজেন্দ্র-বাবু ও সর্দার বল্লভভাই তার পক্ষপাতী। মহাত্মাজীরও এই মত। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিকাংশের ভোটে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী গবর্নরদের সহিত আলাপ আলোচনা করে মাদ্রাজ, বোম্বে, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব কায়েম হয়। সর্দার বল্লভভাই চেয়ারম্যান এবং মৌলানা আজাদ ও রাজেন্দ্রবাবুকে সভ্য করে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয় কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু আসলে এই সব মন্ত্রি-মণ্ডলীর প্রেরণার উৎস ছিলেন মহাত্মাজী। হরিজন পত্রিকা ও আলাপ আলোচনার মারফতে তিনি তাঁদের কাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করতেন। এক কথায় মহাত্মা ছিলেন মস্তিষ্ক, আর সর্দার হাত। খাদি ও গ্রাম শিল্পের প্রসার, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও মাদকদ্রব্য বর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করতেন।

১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস অধিবেশন হয় মহারাষ্ট্রের পূর্ব খান্দেশ জিলার ফৈজপুর নামক গ্রামে। এর পেছনে ছিল মহাত্মাজীর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছায়ই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু প্রদর্শনীর সাজসজ্জার ভার গ্রহণ করেন।

এই প্রথম গ্রামে কংগ্রেস। শ্রীশঙ্কররাও দেও অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতি। হাতে কোটা চাউল, জাঁতার আটা, ঘানির তেল, গরুর দুধ ও গরুর দুধের ঘি ব্যবহৃত হয় প্রতিনিধিদের খাওয়ার জন্য। মহারাষ্ট্রের কর্মীদের সেবা ভাব দেখে মহাত্মাজী আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই কংগ্রেসেও খাদি ও গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মহাত্মাজী। ১৯৩৬ সালে দুই বার কংগ্রেস অধিবেশন হয়। ফৈজপুর প্রদর্শনীতে মহাত্মাজীর বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি চান সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। "রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থে আমি ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স বা পার্লামেণ্টের অনুকরণ মাত্র, অথবা রুশিয়ার সোভিয়েট শাসন বা ইটালীর ফ্যাসিস্ট শাসন বা জার্মানীর নাৎসী শাসন চাই না। তাদের প্রতিভা অনুযায়ী তাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা তৈরী। আমরাও চাই আমাদের প্রতিভানুযায়ী ব্যবস্থা।"

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থ প্রত্যেকের জন্য চাই প্রয়োজনীয় বস্ত্র —হাঁটুর উপর কাপড় মাত্র নয়—আর দুধ, মাখন সমেত পর্যাপ্ত খাদ্য। তার জন্য স্ত্রী, পুরুষ প্রত্যেককে প্রচেষ্টা করতে হবে। সমাজবাদ সম্বন্ধে বলেন, "সত্যিকারের সমাজবাদ আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন 'সমস্ত ভূমিই গোপালের'—অর্থাৎ ভগবানের বা সমাজের। জমি এবং সম্পত্তি যে কাজ করবে তারই।" অন্যায়ভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে ভারতে বেকার সৃষ্টি করে। অন্য শিল্পেরও ধ্বংস খানিকটা হয় তার ফলে। দীর্ঘকাল বেকারত্বের ফল আলস্য। আজ অবস্থা তা-ই এবং তা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। সে আলস্য দূর করে চরখা ও বস্ত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই তাঁর কথা।

মহাত্মাজী নিজেকে অহিংস সমাজবাদী মনে করতেন। এবং তা ভারতের নিজস্ব এবং ইউরোপ হতে আমদানী করা সমাজবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরা কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে বন্দিমুক্তির প্রশ্ন নিয়ে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে মন্ত্রিত্ব সংকট উপস্থিত হয়। মন্ত্রীরা চান সমস্ত রাজবন্দীকে ছেড়ে দিতে। ভাইসরয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে গভর্নররা রাজী হন না। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। অবশেষে মহাত্মাজীর প্রচেষ্টায় সংকটের অবসান হয়। সব রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পায়। মন্ত্রিসভা পদত্যাগ প্রত্যাহার করে।

মহাত্মাজীর ইচ্ছা ছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি। তাদের মধ্যে হিংসাত্মক কাজের অপরাধীও ছিল। এদের সবাইকে নূতন ভাবে দেশসেবার সুযোগ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল তাঁর। তাঁরা দেশপ্রেমী, কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত এই ছিল তাঁর ধারণা। বাংলা দেশেই রাজবন্দীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। সেখানে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছিল না। কংগ্রেস বিরোধী দল। মহাত্মাজী বাংলায় এসে বিভিন্ন জেলে বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মহাত্মাজী কঠোর পরিশ্রম করেন। যদিও সমস্ত বন্দী মুক্তি পায় না তথাপি অনেককে মুক্তি দেয় বাংলা সরকার।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৯৩৮ সালে জওহরলালজী মহাত্মাজীর কাছে চিঠি লিখে নিজের দুঃখের অভিব্যক্তি দেন। আজও কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যাবলী সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন কোন চিন্তাশীল লোকের মধ্যে গভীর ক্ষোভ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার অভিব্যক্তি দেওয়ার জন্য মহাত্মার মত কোন লোক আর নেই। হরিপুরা সুরাট জিলার একটি গ্রাম। এই দ্বিতীয় গ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষ-চন্দ্র বসু। সভাপতির শোভাযাত্রায় ৫১ বলদ টানা গাড়ীতে তিনি উপবিষ্ট। সুভাষবাবু পূর্বে সবরমতী আশ্রম ও পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমকে বলদের গাড়ীর মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে অভিহিত করেছিলেন। অথচ তাঁকে নিয়েই বলদের গাড়ীর শোভাযাত্রা!

হরিপুরা কংগ্রেসেও মহাত্মাজীর বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। সর্দার বল্লভভাই সাড়ে সাত লাখ টাকা খরচ করে বিরাট জাঁকজমক সহকারে ব্যবস্থা করেন। মহাত্মাজীর তা মোটেই পছন্দ হয়নি। সর্দার ও তিনি পরস্পরের খুব নিকটবর্তী, তবু তিনি বলেন যে সর্দার পুরাপুরি-ভাবে খাদির অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করেননি। "যদি আমরা খাদি মনোভাবাপন্ন হতাম তা হলে এই সাড়ে সাত লাখ টাকা এখানে খরচ হত না।" খুব জোর সহকারে বলেন যে, খাদি অর্থ বিলাসিতা বর্জন, খাদি অহিংসার প্রতীক। সত্যিকারের খাদিধারী অসত্য আচরণ করবে না। "খাদিতেই নিহিত স্বরাজ, স্বাধীনতা।"

এই কংগ্রেসে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের আসল কথা হল এই ঃ—(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে সাত বৎসরের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা করা হবে, (২) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। এই শিক্ষা সমস্ত সময়ই একটি উৎপাদনশীল শরীরশ্রম মূলক কাজের ভিতর দিয়ে হবে। সে কাজ ঠিক করা হবে শিশু শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে।

মহাত্মাজীর সেবাগ্রামে গিয়ে বাস করার ফল এই শিক্ষা পরিকল্পনা উদ্ভাবন। সেখানকার ছেলেমেয়েদের দেখে গ্রামের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁর মনে উদ্ভাসিত হল এ কল্পনা। বয়স তখন তাঁর ৬৭। এই বয়স পর্যন্তও তাঁর সৃজনী প্রতিভা অটুট ছিল।

হরিপুরা কংগ্রেসের পূর্বে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় এক সম্মিলন হয় বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার জন্য। উপস্থিত শিক্ষাবিদ্‌দের নিকট মহাত্মাজী তাঁর পরিকল্পনা বিশদভাবে বিবৃত করেন। তিনি এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন যে, এটা শুধু কারিগর তৈরী করার শিক্ষা নয়। যদি ইংরেজী সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় তা হলে এই সাত বৎসরে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য ইত্যাদিও বর্তমান ম্যাট্রিকিউলেশন মান পর্যন্ত শিখতে পারবে। তিনি তা-ই

চেয়েছিলেন। সব বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশও সহজ হয় এবং শ্রমবিমুখতা দূর হয়। সূতা কাটাকে শিল্প করলে কোথায় তুলা উৎপন্ন হয়, কেন গুণের তারতম্য হয় ইত্যাদির মারফত ইতিহাস, কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। এর মারফতে অঙ্কও শেখানো যায়। তাঁর নিজের ভাষায় "আমি এ কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই আমি গ্রামের ছেলেদের শুধু হাতশিল্প বা কারিগরী শিক্ষা দিতে চাই না। আমি তাদের হাতের কাজের মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতে চাই।"

মহাত্মাজীর ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষে এক শোষণহীন, শ্রেণীহীন, সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। এই শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলে সেরূপ সমাজ স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠত এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চরখা সঙ্ঘ, হরিজন সেবক সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ এ সবার পরিপূরক এ শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে এ সত্য প্রতিভাত হয়।

ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি যা তাতে সকল বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষার চালু খরচ ছাত্রদের উৎপাদনমূলক শ্রমের আয় হতে মিটাতে হবে এও ছিল তাঁর কথা। উৎপাদনমূলক শ্রমের কথা বলে যদি আয়ের কথা বাদ দেওয়া হয় তবে তা ব্যয়বহুল হওয়া নিশ্চিত অতএব অসম্ভব।

যদি বর্তমান প্রচলিত শ্রমবিমুখ বাবু তৈরী করার শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হত তবে নিঃসন্দেহে দেশের চেহারা ফিরে যেত।

১৯৩৮ সালে সুভাষবাবুর নির্বাচন ছিল সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু ১৯৩৯ সালের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সুভাষবাবু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নির্বাচন প্রার্থী। ওয়ার্কিং কমিটীর অধিকাংশ সভ্য ডাঃ পট্টভিকে সমর্থন করেন। মহাত্মা গান্ধীর

সমর্থনও ছিল তাঁর পেছনে। সুভাষবাবুকে তার করে তিনি তা জানিয়ে দেন। অবশ্য কংগ্রেস ডেলিগেটদের কাছে সে খবর অজানা ছিল। নির্বাচনে ডাঃ পট্টভি পরাজিত এবং সুভাষবাবু জয়ী হন। নির্বাচন ফল ঘোষণার দুই দিন পরে (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯) মহাত্মাজী এক বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, ডাঃ পট্টভির পরাজয় তাঁরই পরাজয়। কারণ তিনিই ডাঃ পট্টভিকে নাম প্রত্যাহার করতে নিষেধ করেছিলেন। কংগ্রেস ডেলিগেটদের এ সব জানা থাকলে নির্বাচনের ফল অন্যরূপ হওয়া সম্ভব ছিল।

মার্চ মাসে অসুস্থ সুভাষবাবুর সভাপতিত্বে ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশন হয়। মহাত্মাজী অনুপস্থিত। তিনি তখন রাজকোটে উপবাস করছেন। এই কংগ্রেসে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক প্রস্তাবিত ও শ্রীরাজাগোপালাচারি কর্তৃক সমর্থিত একটি প্রস্তাবের সারমর্ম হল এই যে, গত বিশ বৎসর যাবৎ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসে যে নীতি চলে আসছে ভবিষ্যতেও সেই নীতিই চলা উচিত। কংগ্রেস গত বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটীর কাজে আস্থা জ্ঞাপন করছে। আগামী বৎসরে সংকটজনক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, অতএব মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অপরিহার্য। তাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যেন কংগ্রেস সভাপতি আগামী বৎসরের জন্য ওয়ার্কিং কমিটী মনোনীত করেন। সুভাষবাবু এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে চান। কিন্তু মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের নাম প্রস্তাব করতে রাজী হন না। কারণ সেটা হবে সুভাষবাবুর উপর চাপিয়ে দেওয়া। তিনি সুভাষবাবুকে ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। ওয়ার্কিং কমিটীর পুরাতন সভ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও এ বিষয়ে কোন সুরাহা হয় না। এপ্রিলের শেষ ভাগে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় সুভাষবাবু সভাপতির পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি নিযুক্ত হন। তারপর ঘটনা প্রবাহ চলে অতি দ্রুত। ৩রা মে সুভাষবাবু

কংগ্রেসের ভিতরে ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটি নূতন দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তারপর জুলাই মাসে সুভাষবাবু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দুইটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তথাপি তিনি নিজের কাজ সমর্থন করেন। ৯ই আগস্ট ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা স্থির করে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট হতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কংগ্রেসের কোন নির্বাচিত পদে থাকতে পারবেন না। ওয়ার্কিং কমিটীর এই প্রস্তাবের মুসাবিদা করেন মহাত্মাজী।

এর মাত্র কিছুদিন পরেই ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। এ অবস্থায় কি কর্তব্য তা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর সভা ডাকা হয় ওয়ার্ধায়। মহাত্মাজীর ইচ্ছানুসারে সেই সভায় সুভাষবাবু নিমন্ত্রিত হন। জাতির সংকটময় সময়ে মহাত্মাজীও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও সুভাষবাবুকে নিমন্ত্রণ করতে বলেন, আর সুভাষবাবুও সভায় যোগ দেন। সবাই সংকটকালে উদার ভাব দেখান। ওয়ার্কিং কমিটীতে ঢুকেই সুভাষবাবু মহাত্মাজীকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করেন। মহাত্মাজীও হাসি মুখে তাঁর পিঠ চাপড়ে দেন। রাজনৈতিক মতভেদের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্ক তিক্ত করেননি কেউ।

মহাত্মাজীর রাজকোটে উপবাসের কথা উল্লেখ করেছি। সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

রাজকোটে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন হয়। চলে নির্মম অত্যাচার। অবশেষে জনগণের পক্ষে সর্দার বল্লভভাই ও রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি যে ভাবে সর্দার ও মহাত্মাজী ব্যাখ্যা করেন, ঠাকুর সাহেব অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে কাজ করতে চান। মহাত্মাজী সেটা বিশ্বাসভঙ্গ বলে

মনে করেন। সমাধানের রাস্তা বের করবার জন্য ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ রাজকোট যান। বৃটিশ রেসিডেণ্টের প্রভাবে ঠাকুর সাহেবের অনমনীয় ভাব। অন্য কোন রাস্তা না পেয়ে ৩রা মার্চ হতে আমরণ অনশন করার সংকল্প করেন। এর পূর্বে কস্তুরবা কারাবরণ করেছেন। ৪ঠা মার্চ তারিখে কয়েকটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভাইসরয়ের কাছে তার করেন। ৫ই মার্চ কোন কোন মন্ত্রী পদত্যাগের সম্ভাবনার কথা জানান। ৬ই মার্চ ভাইসরয় বল্লভভাই-ঠাকুরসাহেব চুক্তির ব্যাখ্যা নির্ধারণের ভার দেন ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ারের উপর। মহাত্মাজী এতে সন্তুষ্ট হয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্ত মহাত্মাজীর অনুকূলে যায়। পরে মহাত্মাজী মনে করেন ভাইসরয়ের দ্বারা হস্তক্ষেপ করানো ঠিক হয়নি। অহিংসার দৃষ্টিতে দোষদুষ্ট। তাই তিনি প্রধান বিচারপতির রায়ের সুযোগ নিতে অস্বীকার করেন। এর দুদিন পরে ঠাকুর সাহেবের বিশেষ নিমন্ত্রণে তিনি রাজকোট দরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঠাকুর সাহেব অত্যাচারমূলক আইন সমূহ প্রত্যাহার করেন, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানার টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং শাসন সংস্কার কমিটী ঘোষণা করেন। কাথিয়াওয়ারের দেশীয় রাজ্যের কুটিল রাজনীতির মধ্যে অহিংসার প্রয়োগ ক্ষুরধার তরবারির উপর দিয়ে চলার মতই দুর্গম। তাঁর শরীর ও মন উভয়ই অস্বাভাবিক রূপে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এক কথায় রাজকোটে মহাত্মাজীর অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গঠনমূলক কাজের একটি প্রধান অঙ্গ। সেদিকে মহাত্মাজীর দৃষ্টি ছিল খুব। কিন্তু কিছু যেন করে উঠতে পারছিলেন না। সেজন্য অন্তরে ছিল গভীর ব্যথা। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ খুব কম সংখ্যক আসনই দখল করতে পারে। কিন্তু লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না সাহেব সে পরাজয়ের গ্লানি দূর করবার জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। সম্বল শুধু মুসলমানের

স্বার্থরক্ষার কথা। ১৯৩৮ সালে বোম্বেতে মহাত্মাজী তাঁর বাড়ী গিয়ে মীমাংসার জন্য আলাপ আলোচনা করেন। বিশেষ কিছু ফল হয় না। ক্রমে জিন্না সাহেবের দাবীর রূপও পরিবর্তিত হয়। মহাত্মাজী ও কংগ্রেস সভাপতি সুভাষবাবুর সঙ্গে আলোচনার সময় প্রথম কথাই বলেন যে, হিন্দুদের প্রতিনিধি কংগ্রেস, মুসলমানদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে মুখবন্ধে এই কথা লিখতে হবে। জাতীয় পতাকার পরিবর্তন করতে হবে, বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে, সরকারী চাকুরিতে মুসলমানদের সংখ্যা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করতে হবে।

এই অসম্ভব দাবী কি করে কংগ্রেস বা মহাত্মাজী মানতে পারেন মহাত্মাজী এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন। জাতীয় পতাকা হিন্দু মুসলমান উভয়েই ১৯২১ সালে গ্রহণ করে। আলী ভাইদের ন্যায় মুসলমানরা তা মেনে নেন। বহু হিন্দু মুসলমান এই পতাকাতলে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করেছে। বন্দেমাতরম্ গান সম্বন্ধেও বলেন যে, বাংলা দেশে এই ধ্বনি মুখে নিয়ে বঙ্গবিভাগ রদের আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান অংশ গ্রহণ করেছে। বন্দেমাতরম্ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনি। এ কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সালে মহাত্মাজীর সম্মতি নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের শুধু প্রথম দুই স্তবক জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গীত হবে এই প্রস্তাব পাশ করে। জানি না কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। অন্ততঃ মুসলিম লীগ সন্তুষ্ট হয়নি।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে মহাত্মাজী এবটাবাদে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন হিন্দু মুসলমান একতার ন্যায় বৃহৎ কার্য সাধনের ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি ক্রমেই অধিকতর ভাবে ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় জিন্না

সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়। পূর্ব হতে স্থিরীকৃত অন্য কাজ আছে, তাই আসেননি। এর পরে ভাইসরয়ের নিমন্ত্রণে যখন দুজনেই সাক্ষাৎ করতে যান তখন মহাত্মাজী তাঁকে বলেন 'চলুন, আমরা একত্রে গিয়ে স্বাধীনতার দাবী করি।' জিন্না সাহেব বলেন 'আমি স্বাধীনতা চাই না।' তাঁর কথার অর্থ এই যে, মুসলমানদের দাবী স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা চাই না। এর পর ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগ 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই প্রস্তাবের পিছনে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং উদ্দেশ্য পাকিস্তান। যদিও প্রস্তাবে দ্বিজাতিতত্ত্ব বা পাকিস্তানের কোন উল্লেখ নেই। এ সবার পেছনে ইংরেজ সরকারের উস্কানি ও প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি থাকা সম্ভব। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, কংগ্রেসের হিন্দু মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মুসলমান জনতাকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করতে পারেননি। কংগ্রেসের ভিতরকার দুর্বলতা তার প্রধান কারণ। এ সময় কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্যই তিনি ছিলেন বেশী চিন্তিত। দুর্নীতি হিংসারই অভিব্যক্তি। অহিংসার ভাব জাগ্রত হলে সব ঠিক হওয়া সম্ভব। খান আবদুল গফ্‌ফর খান মহাত্মাজীকে বলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক লক্ষ খোদাই খিদমৎগার (ভগবানের সেবক) বা অহিংস স্বেচ্ছাসেবক আছে। তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তাই ১৯৩৮ সালে দুই বার ওই প্রদেশে যান। ১৯৩৯ সালেও এক বার যান। ওই প্রদেশে শতকরা ৯৪ জন মুসলমান, অধিবাসী পাঠানেরা দুর্দ্ধর্ষ বীর। তাদের মধ্যে যদি অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সমস্ত ভারতে এক নূতন প্রেরণা আসবে। মহাত্মাজী সেখানে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় এই অহিংসার উপরই জোর দেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। স্পেনে অন্তর্বিদ্রোহ ও ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুদয়, ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ, জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ, নাৎসী জার্মানীর ইহুদীদের প্রতি নির্মম অত্যাচার ও চেক জাতির প্রতি দুর্ব্যবহার, জার্মানী ও

ইংলণ্ডের মধ্যে মিউনিক চুক্তি এবং রুশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি এ সমস্তই এক বিরাট্ ধ্বংস যজ্ঞের আভাস। অত্যাচারিত, উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি অহিংস পন্থা অনুসরণের কথা বলেন। জার্মান নেতা হের হিটলারের নিকট বিশেষ আবেদনও করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোন প্রকারের বুলিও তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। জাপানী পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ তাকায়োকা ১৯৩৮ সালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এশিয়া এশিয়াবাসীদের এই কথার সমর্থনে মত চান। মহাত্মাজী বুঝতে পারেন যে, এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য এশিয়ায় জাপানের প্রভুত্ব কায়েম করা। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনি 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' মতবাদের পক্ষপাতী নন, যদি তা ইউরোপীয় বিরোধী হয়। তিনি মিঃ তাকায়োকাকে স্মরণ করিয়ে দেন বুদ্ধের কথা এবং অহিংসার পথে সমস্ত জগৎকে এক সূত্রে গ্রথিত করার কথা বলেন।

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মহাত্মাজা মনে করেন যে এ জন্য হের হিটলার দায়ী। তাঁর ডানজিগ বা 'পোলিশ করিডর' দাবীর মধ্যে সারবত্তা থাকতে পারে, কিন্তু কোন সালিশের হাতে বিচারের ভার দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যুদ্ধের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। অতএব মহাত্মাজীর সহানুভূতি ইংরেজদের সঙ্গে। অপরিমিত শক্তি নিয়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণের মুখে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও পোল জাতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ তিনি অহিংসার সামিল বলে ঘোষণা করেন। তবে তিনি অহিংসার পূজারী। কাজেই যুদ্ধে ইংরেজদের নৈতিক সমর্থনই মাত্র দিতে পারেন, এর বেশী নয়। বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরই ভাইসরয় ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত জাতি বলে ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন অর্ডিনান্স জারী করেন। ভারতবাসী কি চায় না চায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জোর করেই দেশকে যুদ্ধে জড়িত করা মহাত্মাজী কোন প্রকারে সমর্থন করতে পারেননি।

সব জিনিস বিবেচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা বসল ওয়ার্ধায়। মহাত্মাজী বিনা সর্তে শুধু নৈতিক সমর্থনের কথা বললেন। কিন্তু তা কমিটীর মনঃপূত হল না। কমিটী যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি তথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটেনের ইচ্ছা কি তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে বলল। বৃটিশ সরকার বলছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই। ভারতবর্ষকে বর্তমান অবস্থায় রেখে এরূপ কথা বলা অবাস্তব। এই প্রস্তাবের অর্থ হল এই যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিলে স্বাধীন ভারত বৃটেনকে যুদ্ধে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। মহাত্মাজী মনে করলেন ওয়ার্কিং কমিটীর অহিংসায় পুরাপুরি বিশ্বাসের অভাব। এ কথা তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন।

বৃটিশ সরকার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে বাস্তবে কিছু করতে রাজী হল না। অতএব মহাত্মাজীর মনে এ কথা এল যে, কংগ্রেসকে আরো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং পুনরায় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অপর দিকে সরকারের প্রচেষ্টা শুরু হল সংখ্যালঘুদের সমর্থন পাওয়ার জন্য। সংখ্যালঘুরাও নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে সে টোপ গেলে। জিন্না সাহেবের সমর্থক ভাইসরয়। ডাঃ আম্বেদকারও তাঁর সহানুভূতি পুষ্ট। পুনরায় গোল টেবিল বৈঠকের খেলা। অথচ চারিদিকে হিংসার আবহাওয়া। মহাত্মাজী চিন্তিত। অহিংসা পুরাপুরি পালিত না হলে সংগ্রামের কথা ভাবা নিরর্থক। বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতের ন্যায্য দাবী পূরণ হওয়া সম্ভব নয় এ কথা ক্রমেই স্পষ্ট হল। তখনও কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বিদ্যমান। তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এই সব ভেবে সব কয়টি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা অক্টোবরের শেষের দিকে পদত্যাগ করে। জিন্না সাহেব কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের জন্য ২২শে ডিসেম্বর 'মুক্তিদিবস' ঘোষণা করেন। বৃটিশ সরকার হয়ে উঠল মুসলিম স্বার্থ রক্ষার প্রতিভূ। মুসলিম স্বার্থের নামে ইংরেজের স্বার্থ রক্ষার অপচেষ্টা। মহাত্মাজী সরকারের

প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই এমনকি স্বার্থপর লোকদের উস্কানিতে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধেও হীন আক্রমণ আরম্ভ হল ভারতে ও বৃটেনে। সে সব যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে জানালেন। এরা মিথ্যা জেনেই এ সব লিখেছে কাজেই প্রতিবাদ করে লাভ কি এ কথা মহাত্মাজীকে লিখি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানাই যে, সম্প্রতি এক জার্মান বইতে দেখলাম বুদ্ধদেবের চরিত্র নিয়েও কটাক্ষ। এই পৃথিবী! উত্তরে জানান যে, তাঁরও ধারণা এ সব লেখা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ না করলে কেউ কেউ বলবার সুযোগ পেত যে 'কই তিনি ত প্রতিবাদ করেননি?' যাক, এ জিনিস আর বেশী দূর গড়ায়নি। মহাত্মাজী চরিত্রহীন এত বড় অসত্য ভারতকে গেলানো অসম্ভব ভেবেই এ প্রচার বন্ধ হয়।

১৯৪০ মার্চ মাসে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশন। মৌলানা আজাদ সভাপতি। এই কংগ্রেসে এরূপ প্রস্তাব পাশ হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন কংগ্রেস আর কিছুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এবং স্থায়ী সমাধান কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর (সংবিধান রচনা সভা) দ্বারাই সম্ভব। আর পরিস্থিতি যেরূপ তাতে টাকা পয়সা বা জনবল ইত্যাদি দিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের কথা কংগ্রেস বলতে পারে না।

রামগড় কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের 'বিখ্যাত' স্যার মাইকেল ও'ডায়ার লণ্ডনে এক ভারতীয়ের গুলিতে নিহত হন। মহাত্মাজী এ কাজের তীব্র নিন্দা করেন। এই কাজকে পাগলামি বলে অভিহিত করেন। স্যার মাইকেল পাঞ্জাবে নির্মম অত্যাচারের জন্য দায়ী। কিন্তু তাঁর মতে এরূপ লোকদের জীবননাশও নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর। এই ছিল তাঁর অহিংসার রূপ। তিনি অহিংসা ও গঠনমূলক কাজের উপর খুব জোর দিতে থাকেন। কারণ অহিংস আবহাওয়ায়ই সংগ্রাম সম্ভব। এখন তাঁর মনে এ কথা এক প্রকার নিশ্চিত যে সংগ্রাম অনিবার্য। দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে এবার তিনি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচন সমিতির সভ্য ও প্রতিনিধিদের

কাছে বক্তৃতা দেন। ওয়ার্কিং কমিটীর সকলেরই ধারণা যে, সংগ্রাম পরিচালনা করতে হলে তাঁর নেতৃত্ব অপরিহার্য। তিনি সে নেতৃত্ব দিতে দ্বিধা করেননি। তাঁকে আইন অমান্য পরিচালনা করার সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৯৪০ সালের ১১ই অক্টোবর ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় মহাত্মাজী তাঁর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। এবার তিনি নিজে প্রথম সত্যাগ্রহ করবেন না। প্রথম সত্যাগ্রহী হবেন শ্রীবিনোবা ভাবে। মহাত্মাজী মনে করেন শ্রীভাবে সম্ভাব্য সত্যাগ্রহীদের মধ্যে সর্বাধিক অধ্যাত্মময়। তাই তাঁকে দিয়েই সত্যাগ্রহ শুরু হয়। পরে সব প্রদেশে আরম্ভ হয়। বক্তৃতার স্বাধীনতা লক্ষ্য। যুদ্ধে টাকা দিও না, যুদ্ধের কাজে যোগ দিও না এই বক্তৃতা দিত সব সত্যাগ্রহী। যারা চরখা ও খদ্দরে বিশ্বাসী, সূতা কাটে এবং সম্পূর্ণ অহিংস থাকবে এরূপ লোকের তালিকা মহাত্মাজী অনুমোদন করলে তবে তারা সত্যাগ্রহ করে। এবার সত্যাগ্রহী নির্বাচনে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। তথাপি সারা ভারতবর্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার সত্যাগ্রহী সাজা পায়। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এক বৎসরের উপর চলে। সত্যাগ্রহের খবর ছাপা সম্বন্ধে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তাই মহাত্মাজী ১০ই নভেম্বরের পর হতে হরিজন পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করেন।

এদিকে যুদ্ধের অবস্থা মিত্র শক্তির পক্ষে ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। এই অবস্থায় ভারত সরকার ১৯৪১ সালের ৩রা ডিসেম্বর আইন অমান্য কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করে। মুক্তির পর মৌলানা সাহেব ডিসেম্বরের শেষ ভাগে বারদোলীতে ওয়ার্কিং কমিটীর সভা আহ্বান করেন। মহাত্মাজী অল্প কিছুদিন পূর্বে সেবাগ্রাম হতে সেখানে গিয়েছেন। যাওয়ার পথে 'গঠনমুলক কার্য-ক্রম' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। তার ১৮ দফা কার্যক্রমকে তিনি স্বরাজের ভিত্তি বলে মনে করেন। সত্যাগ্রহের জন্য এই কার্যক্রম

অনুসরণ অত্যাবশ্যক। মহাত্মাজীকে বুঝতে হলে এই পুস্তিকা পাঠ করা কর্তব্য।

বারদৌলী ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বুঝতে পারেন, যে প্রস্তাবের বলে আইন অমান্য পরিচালনা করেছেন তা সম্পূর্ণ অহিংসার ভিত্তিতে রচিত নয়। তাই তিনি নেতৃত্ব ত্যাগ করছেন এ কথা জানান। ওয়ার্কিং কমিটীর অধিকাংশ সভ্য আদর্শ হিসাবে অহিংসাকে গ্রহণ করতে পারেননি! ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন মাত্র। মহাত্মাজী তাঁদের এই অক্ষমতা জানতেন এবং জেনেও যতটা সম্ভব তাঁদের নিয়ে চলতে চেষ্টা করছেন। তাঁরাও যতটা সম্ভব মহাত্মাজীর নেতৃত্ব মেনে চলেছেন, কারণ জানতেন সত্যাগ্রহ সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্ব অপরিহার্য।

এর পর ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসে। এই সময় মহাত্মাজী ঘোষণা করেন যে, জওহরলালজী তাঁর উত্তরাধিকারী। এ কথাও বলেন যে, যদিও তাঁর জীবিতকালে জওহরলালজী তাঁর বিরোধিতা করছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাষাতেই কথা বলবেন অর্থাৎ তাঁর মতের অনুসরণ করবেন। করছেন কি না করছেন তা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে রাজনৈতিক নেতাদের কাউকে উত্তরাধিকারী রূপে ঘোষণা গণতন্ত্রের প্রতি সুবিচার নয় এরূপ ধারণা অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে পুনরায় হরিজন পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানী সৈন্য ব্রহ্মদেশে এসে পৌঁছে। মার্শাল চিয়াং কাইশেক সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের পরই মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করি "কি বুঝলেন?" উত্তরে বলেন "চীনী মন দুর্জ্ঞেয়।"

৭ই মার্চ জাপানী সৈন্য রেঙ্গুন অধিকার করে। জাপান ভারতবর্ষের দুয়ারে। বৃটিশ মন্ত্রিসভা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতবর্ষে পাঠান একটি প্রস্তাব দিয়ে। ২২শে মার্চ তিনি দিল্লী আসেন। সেই প্রস্তাবের সারমর্ম এই :—(১) ভারতে খুব শীঘ্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশ সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে—অবশ্য ইচ্ছা করলে ভারতের কমনওয়েলথের বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা রইল। (২) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একটি সংবিধান রচনা সভা ভারত ও দেশীয় রাজ্য সমূহের জন্য সংবিধান রচনা করবে। বৃটিশ সরকার সেই সংবিধান মেনে নেবে। তবে এক বা ততোধিক প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য যদি এই সংবিধান না মেনে নিজেদের জন্য পৃথক্ সংবিধান রচনা করতে চায় তাদের সে অধিকার থাকবে। (৩) ভারত রক্ষার ব্যাপারে বর্তমানে সমস্ত ক্ষমতা বৃটিশ সরকারের হাতে থাকবে, কিন্তু ভারতের সমস্ত সম্পদ্ এ কাজে নিয়োজিত করবার ভার ভারত সরকারের।

মহাত্মাজী সাক্ষাতের সময় স্যার স্ট্যাফোর্ডকে বলেন "এই প্রস্তাব নিয়ে আপনি কেন এসেছেন? প্রথম প্লেনে আপনাকে দেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।" সাধারণতঃ এ কথা প্রচলিত যে মহাত্মাজী বলেছিলেন "এটি একটি দেউলিয়া হতে যাচ্ছে এমন ব্যাঙ্কের উপর পরবর্তী তারিখের চেক।" এরূপ কোন কথা তিনি বলেননি। তবে একটা মুখরোচক কথা একবার চালু হলে তা মানুষের মন থেকে দূর করা শক্ত। মুখ্যতঃ নিম্ন কয়েকটি কারণে মহাত্মাজী ক্রীপস প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। (১) যদিও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে তথাপি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়—পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। (২) প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে তিন ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। (৩) দেশ রক্ষার দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপর থাকবে না। মহাত্মাজীর আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। নিজ মত খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে তিনি দিল্লী হতে চলে যান। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এখন থেকেই বৃটিশ সরকার ভারত বিভাগ করতে কৃতসংকল্প।

ওয়ার্কিং কমিটীও মহাত্মাজীর অনুপস্থিতিতে কয়েক দিন ধরে আলোচনা চালিয়ে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত করে।

এই সময় মহাত্মাজীর মনে এই ধারণা জন্মে যে, ইংরেজের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ভারত ত্যাগ করা উচিত। বৃটেন ও ভারত উভয়ের স্বার্থই তাতে। স্বাধীন ভারতের উপর জাপানের আক্রমণের আশঙ্কা কম। যদি হয় তবে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে। আক্রমণকারী জাপানীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ নীতি অবলম্বন করার উপদেশ দেন। জাপানের প্রতি তাঁর কোন প্রকারের সহানুভূতি ছিল না। যুদ্ধের সময় ইংরেজ ভারত ত্যাগ করলে চীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিপন্ন হবে এবং জাপান ভারত দখল করে সমস্ত এশিয়ায় মিত্র শক্তিকে অসুবিধায় ফেলবে এই আশঙ্কা দূর করবার জন্য মহাত্মাজী স্বাধীন ভারতে মিত্র শক্তিকে তাদের খরচে সৈন্য রাখার সম্মতি জানান। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে পত্রেও এ কথা স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করেন। এর অল্প কয়েক দিন পরে এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা হয়। মহাত্মাজী আসেননি, কিন্তু এক প্রস্তাবের মুসাবিদা করে পাঠান। ওয়ার্কিং কমিটী তখন সুস্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত। অধিকাংশ সভ্য ইংরেজের ভারত ত্যাগের পক্ষপাতী। কিন্তু কয়েকজন প্রভাবশালী সভ্য তার বিরোধী। কেউ কেউ ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। তাই একটা আপসমূলক প্রস্তাব পাশ হয় এবং চূড়ান্ত প্রস্তাব পরবর্তী অধিবেশনে হবে স্থির হয়। এর পর ওয়ার্কিং কমিটী বসে জুলাই মাসে ওয়ার্ধায়। তখনও প্রভাবশালী সভ্যদের বিরোধিতা ছিল। দেশে হিংসার আবহাওয়া আছে, কিন্তু এ পরিস্থিতিতে চুপচাপ বসে থাকলে লোকে এমনকি ইংরেজ বিরোধী শক্তিকে পর্যন্ত স্বাগত জানাতে পারে। অতএব এ সময় চুপচাপ বসে থাকা হবে মারাত্মক ভুল। তাই মহাত্মাজী বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ইংরেজের ভারত ত্যাগের আন্দোলনের উপর জোর দিলেন। তিনি এতটা নিশ্চিত যে বিরোধী সভ্যদের বলেছিলেন যে, তাঁদের আপত্তি

থাকলে তিনি এ আন্দোলন কংগ্রেসের তরফে করতে চান না, তিনি নিজ দায়িত্বে করবেন—যারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাদের নিয়েই। এর পর ওয়ার্কিং কমিটীর সবাই মহাত্মাজীর মত মেনে নেন।

বোম্বেতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় ৮ই আগস্ট বিখ্যাত 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্থির হয় যে, সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জন-আন্দোলন পরিচালিত হবে। তের জন কমিউনিস্ট সদস্য মাত্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর হতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তাদের মতে জনযুদ্ধে পরিণত হয়। সে মত অযৌক্তিক এই ছিল মহাত্মাজীর ধারণা। মহাত্মাজী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী দুই ভাষায়ই বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি সকলকে এক মন্ত্র দিলেন 'করব না হয় মরব।' হয় স্বাধীনতা লাভ না হয় মৃত্যু। সম্পূর্ণভাবে অহিংস থেকেই এ কাজ করতে হবে। তিনি অবশ্য এ কথাও বলেছিলেন যে, তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শেষ চেষ্টা করবেন। সে চেষ্টা ফলপ্রসূ না হলেই সংগ্রামের নির্দেশ দেবেন। এতে তিন সপ্তাহ খানেক সময় লাগতে পারে।

১৯৪০ সাল হতে 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহাত্মাজীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়—সি, এফ, এণ্ড্রুজ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যমুনালাল বাজাজ।

১৯৪০ সালে এপ্রিল মাসে মিঃ এণ্ড্রুজের মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য মহাত্মাজী পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। এই টাকা সংগ্রহের আবেদনে শান্তিনিকেতনে একটি হাসপাতাল স্থাপন, বীরভূমে দরিদ্রদের জন্য পানীয় জলের কূয়া খনন ও একটি ক্রিশ্চিয়ান হল তৈরী করার কথা উল্লেখ ছিল। অবশ্য শান্তিনিকেতনের সাধারণ কাজের জন্যও এ ফণ্ড হতে টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু মহাত্মাজীর জীবিতকালে প্রথম তিনটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত কাজের

জন্য বিশেষ কিছু করা হয়নি। যদিও তিনি পুরা পাঁচ লক্ষ টাকাই শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রাণে গভীর দুঃখ। বোম্বেতে 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় তিনি উল্লেখ করেন যে, এণ্ড্রুজ ছিলেন ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যোগসূত্র এবং তাঁদের দুজনের মধ্যে ছিল একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

১৯৪১ সালে ৭ই আগস্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি খুব ব্যথিত হন। নিজে আসতে না পেরে অসুস্থ কবিকে দেখতে মহাদেব ভাইকে পাঠান। সমস্ত মানব জাতির উপর প্রেম ছিল দুইয়ের মিলন সূত্র। সে সূত্র কখনো ছিন্ন হয়নি।

১৯৪২ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁর নিতান্ত অনুগামী শ্রীযমুনালাল বাজাজ মারা যান। যমুনালালজী তাঁর প্রখর ব্যবসা বুদ্ধি, ত্যাগ-ভাবনা দ্বারা সর্বতোভাবে মহাত্মাজীর গঠনমূলক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমকে জয়যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। মহাত্মাজী তাঁর মৃত্যুতে প্রাণে দারুন ব্যথা পান।

সপ্তম অধ্যায়

ভারত ছাড় প্রস্তাব হতে মৃত্যু পর্যন্ত

পুনরায় বন্দী মহাত্মাজী। ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ রাত্রিতে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাত্রি ভোর হতে না হতেই অর্থাৎ ৯ই আগস্ট অতি ভোরে মহাত্মাজী, ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণ ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সরকার। মহাত্মাজী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাদেব ভাই ও মীরাবেনকে আটক করে পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে। পরে কস্তুরবা, ডাঃ সুশীলা নায়ার ও প্যারীলালজীকেও নিয়ে আসে এখানে। ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের নিয়ে যায় আমেদনগর ফোর্টে। অবশ্য তাঁদের আটকস্থান সরকার বহুদিন পর্যন্ত প্রকাশ করে না।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় মহাত্মাজী ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। তার কোন গুরুত্বই দেয় না সরকার। সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হল না। পরিবর্তে আরম্ভ হল সারা ভারতবর্ষে পরিকল্পিত ব্যাপক গ্রেপ্তার। ঠিক যেন ১৯৩২ সালের পুনরভিনয়। গান্ধী ও কংগ্রেসকে দমাতে হবে এই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের অভিপ্রায়। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো সে অভিপ্রায়কে রূপ দিতে দৃঢ়সংকল্প। বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছাই নেই। তারপর এই ব্যাপক গ্রেপ্তার। ফলে নেতৃত্বহীন জনগণ এক প্রকার ক্ষিপ্ত হয়ে অনেক জায়গায় অবাঞ্ছিত হিংসাত্মক কার্য করে। সরকার যথেচ্ছভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে দমাবার জন্য। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিও হিংসামূলক কার্যের প্ররোচনা দিয়েছিলেন্। তাদের কাজ দেশের কল্যাণ করেনি এ কথা মহাত্মাজী অতি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।

গ্রেপ্তারের মাত্র কয়েক দিন পরেই ১৫ই আগস্ট মহাদেব ভাই হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। মৃতদেহ বাইরে আত্মীয়দের

হাতে দিতে অস্বীকার করে সরকার। তাই প্রাসাদের ভিতরেই দাহ করা হয়। মহাত্মাজী মৃতদেহ স্নান করিয়ে নিজ হাতে চন্দন মাখিয়ে দেন। আর বলেন "মহাদেব, ভেবেছিলাম তুমি আমার এ কাজ করবে। এখন আমাকেই তোমার এ কাজ করতে হচ্ছে।" কি গভীর দুঃখ মনে! মহাদেব ভাইয়ের স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের কাছে খবর দিয়ে একটি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য মহাত্মাজী জেল কর্তৃপক্ষের হাতে দেন। সরকার তার ত করেই না, চিঠিও বিলম্বে পাঠায়। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে তা পৌঁছে। এতটা নীচতা ছিল অপ্রত্যাশিত। মহাদেব ভাইয়ের সমাধিস্থানে রোজ দুবেলা মহাত্মাজী যেতেন। গীতার ভক্তিযোগ (দ্বাদশ অধ্যায়) পাঠ হত সেখানে। মহাদেব ভাইকে আদর্শ ভক্ত মনে করতেন মহাত্মাজী। যে ভাবে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর তিনি মহাত্মাজীর অনুসরণ ও সেবা করেছেন তা বাস্তবিকই অনুকরণীয়। মহাত্মাজীর যোগ্য সেক্রেটারীই ছিলেন তিনি এবং তাঁর জীবনী লেখবার শ্রেষ্ঠ অধিকারীও ছিলেন। এ বিষয়ে মহাদেব ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপও হয়। লিখতে রাজীও হন। সেই পুস্তকের বাংলা অনুবাদ আমি করব তাও স্থির ছিল। দুঃখের বিষয় সে কাজ আরম্ভ করবার পূর্বেই তিনি চলে গেলেন। অপূরণীয় ক্ষতি হল দেশের। সে পুস্তক বের হলে যে দেশের একটি অমূল্য সম্পদ্ হত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী হওয়ার কিছুদিন পরেই মহাত্মাজী সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করেন। ভাইসরয় ও ভারত সরকার সমস্ত হিংসামূলক কাজের জন্য মহাত্মাজী ও কংগ্রেসকে দায়ী করেন। তাঁদের মতে এ সব কাজ অনুষ্ঠানের জন্য কংগ্রেসের পূর্ব হতে পরিকল্পনা ছিল। ইহা সর্বৈব ভুল ও নিজেদের মনগড়া। মহাত্মাজীও দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, সরকারের অন্যায় অত্যাচারের ফলেই লোক উত্তেজিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হিংসামূলক আচরণ করেছে। অতএব এজন্য কংগ্রেস বা তাঁর কোন দায়িত্ব নেই।

আর সরকারী কর্মচারীদের একতরফা রিপোর্টের উপর তিনি সব কথা বিশ্বাস করতেও রাজী নন জানান। ভাইসরয় ও ভারত সরকার অবশ্য শেষ পর্যন্তও কংগ্রেস, মুখ্যতঃ মহাত্মাজীর উপরই দায়িত্ব এ কথা বলেন। তাই অবশেষে মহাত্মাজী ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভাইসরয়কে একুশ দিন উপবাস করার সংকল্পের কথা জানান। ভাইসরয় উত্তরে খুবই একটি বেদনাদায়ক কথা লেখেন— 'বেরিয়ে যাওয়ার সহজ রাস্তা।' মহাত্মাজী ভুল করছেন এ কথা বলা আর তাঁর উপর দুরভিসন্ধি আরোপ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতে রাজপ্রতিনিধিদের এরূপ মন্তব্য তৎকালীন ভারত সরকারের মনের স্বরূপ খুলে ধরে।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ হতে মহাত্মাজী একুশ দিন উপবাস শুরু করেন। কয়েকদিন পরে অবস্থা খুব খারাপ হয়। ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের তিন জন ভারতীয় সভ্য পদত্যাগ করেন। তিনি নূতন তিন জন মনোনীত করেন। সরকারের মতিগতির সামান্য পরিবর্তনও হয় না। সবাই প্রায় ধরে নিয়েছিল এবার মহাত্মাজীর মৃত্যু নিশ্চিত। সরকারও চন্দন কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রেখেছিল এবং সকল প্রকারের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি বেঁচে গেলেন। কিন্তু সরকার তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁর অবস্থা খুব সংকটজনক। তখন তাঁকে ও কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সরকারী পুস্তিকা 'দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব' বিলি করা হয়।

সরকার অবশ্য যারবাদা জেল হতে ডাঃ গিলডারকে আগা খাঁ প্রাসাদে নিয়ে যায় এবং কলিকাতা হতে আগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কেও উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়।

চার্চিল সরকার যে ভারতের প্রতি সুবিচার করতে চায় না তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময়কার একটি ঘটনা হতে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ভারতে আসেন অবস্থা

পর্যবেক্ষণ করতে। তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে আগা খাঁ প্রাসাদে দেখা করতে চান। ভারত সরকার অনুমতি দেয় না। উপবাস ভঙ্গের পর 'দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব' পুস্তিকা মহাত্মাজী সরকারকে লিখে পান। তিনি তার দফাওয়ারি জবাব দেন। কিন্তু সে জবাব সরকার প্রকাশ করতে রাজী হয় না। তিনি কয়েদী, তাঁর মত প্রচারের সুযোগ সরকার দিতে পারে না জানায়।

এর পর মহাত্মাজী খুব পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' পুস্তকের প্রথম খণ্ড পড়েন। এই পুস্তক তাঁর মনের উপর তেমন গভীর রেখাপাত করে না। "মার্কস ঠিক কি ভ্রান্ত তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, আসল কথা হচ্ছে এই যে দরিদ্ররা নিষ্পেষিত, তাদের জন্য কিছু করতে হবে"—এই হল মহাত্মাজীর উক্তি।

১৯৪৩ সালের শেষ ভাগে কস্তুরবার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। তাঁর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যাপারে সরকারের যতটা উদারভাব অবলম্বন করা উচিত ছিল তা সরকার মোটেই দেখায়নি। মহাত্মাজী লিখে লিখে কিছু সুবিধা আদায় করেছেন। অনিচ্ছা সহকারে যেন তা দিয়েছে সরকার। ক্রমে কস্তুরবার শরীর খুব খারাপ হয় এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ তিনি মারা যান। তাঁর মৃতদেহও আগা খাঁ প্রাসাদে দাহ করা হয়। এবার অবশ্য তাঁর ছেলেদের ও কিছু সংখ্যক আত্মীয়স্বজনকে সে উপলক্ষ্যে প্রাসাদের ভিতরে আসতে দেওয়া হয়।

কস্তুরবার মৃত্যুতে মহাত্মাজী খুবই ব্যথিত হন। "যতটা দুঃখ হবে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বেশী দুঃখ হচ্ছে" এই বলেছিলেন তিনি। এইখানেই তিনি মানুষ। ৬২ বৎসরের জীবনসঙ্গিনী চলে গেলেন। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় বিশ্বস্ত সেক্রেটারী ও সহধর্মিনীকে হারালেন। এর পর সরকারের বিন্দুমাত্র সুবিবেচনা থাকলেও তাঁকে

সেখান হতে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করত। তত্নপরি স্থানটি মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। ম্যালেরিয়া প্রধান।

একে ত মন খারাপ, তত্নপরি ম্যালেরিয়া প্রধান বাসস্থল। এপ্রিল মাসেই তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। অল্পদিন পরেই দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে রক্তাল্পতা ও হুকওয়ার্ম ব্যাধি। ক্রমে অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুও অসম্ভব নয়। সরকার সে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়, তাই ৬ই মে তাঁকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিনাসর্তে কারামুক্তি দেয়। মুক্তির পূর্বে তিনি মহাদেব ভাই ও কস্তুরবার সমাধিস্থান তাঁর হাতে দেওয়ার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি নেবেন এ কথা জানান। বেরিয়ে আসবার সময়ও মোটরগাড়ীতে তাঁদের কথা বলেন। তাঁদের সমাধিস্থ করে বেরিয়ে এলেন এটা কি কম তুঃখের কথা!

মহাত্মাজী বন্দী থাকতেই দেশবাসী কস্তুরবার স্মৃতি রক্ষার্থে ৭৫ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন করে। ১৯৪৪ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মাজীর ৭৫ বৎসর পূর্ণ হবে। তিনি সে সময় বন্দী থাকলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে সংগৃহীত টাকা দেওয়া হবে। তিনি অবশ্য ওই তারিখের পূর্বেই মুক্তি পান। আর টাকাও পাঁচ লক্ষ বেশী অর্থাৎ আশি লক্ষ সংগৃহীত হয়। সেই টাকা সেবাগ্রামে ২রা অক্টোবর মহাত্মাজীর হাতে দেওয়া হয়। পরে আরো টাকা সংগৃহীত হয়ে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি চব্বিশ লক্ষ। গ্রামের মেয়ে (সব বয়সের) এবং ছোট ছেলেদের কল্যাণের জন্য এই টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। কমিটীর সভাপতি হন মহাত্মা গান্ধী, সম্পাদক ঠক্কর বাপা। হরিজন সেবক সঙ্ঘের সম্পাদকের কাজের উপরও বৃদ্ধ বয়সে ঠক্কর বাপার এ কাজে কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অনেক যুবককে হার মানিয়েছেন তিনি।

মুক্তির তিন-চার দিন পরই মহাত্মাজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য জুহুর সমুদ্রতীরে যান। তারপর পুণায় প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ে এবং পরে

পাঁচগনি। কয়েক দিন মৌনী হয়ে ছিলেন, তার পরেও কয়েক দিন অল্প সময়ের জন্য কথা বলতেন। এ ভাবে স্বাস্থ্য অনেকটা শোধরাতে সমর্থ হন।

২৯শে জুন প্রথম বক্তৃতা দেন পুণায় মহারাষ্ট্রের যে সব কংগ্রেস কর্মী জেলের বাইরে ছিলেন তাঁদের কাছে। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, দেশ যতটা সত্য ও অহিংসায় নিষ্ঠাবান রয়েছে ঠিক সেই অনুপাতেই সফলকাম হয়েছি। আমাদের উপায় বা পথ শুদ্ধ বলেই গত পঁচিশ বৎসর জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ এসেছে এবং তার মধ্যে যে পরিমাণ অসত্য ও হিংসা প্রবেশ করেছে সেই পরিমাণ অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

মুক্তির পরও তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন। এখন নূতন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এসেছেন। তাঁর কাছে ২৭শে জুলাই তারিখে পত্রে মহাত্মাজী এক প্রস্তাব করেন। তার সারমর্ম এই ঃ— পরিবর্তিত অবস্থায় ব্যাপক আইন অমান্য করা যেতে পারে না। যদি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার ইচ্ছাধীনে পরিচালিত জাতীয় সরকার গঠিত হয় তবে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে এই উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন যে, কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। সামরিক ব্যবস্থা যা ভারতে চলছে তা চলতে থাকবে, তবে খরচের বোঝা ভারতের উপর পড়বে না।

ভাইসরয় এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ধর্ম ও জাতিগত সংখ্যা-লঘুদের প্রতি কর্তব্যের কথা তাঁরা ভুলতে পারেন না ভাইসরয়ের পত্রে এ কথারও উল্লেখ ছিল। সংখ্যালঘুদের জন্য এই কুম্ভীরাশ্রু ভারতে ইংরেজ সরকারের বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার মনোবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি।

স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে সরকার কাজে লাগাতে ছিল সর্বদা সচেষ্ট। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো এ বিষয়ে প্রধান উৎসাহী। যুদ্ধের প্রারম্ভে ১৯৩৯ সালে কোন

প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ছিল না, কিন্তু ১৯৪৩ সালে লর্ড লিনলিথগোর অবসর গ্রহণ করার সময় বাংলা, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর সমর্থনে। মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এই চারটি প্রদেশ। ভারত খণ্ডিত হওয়ার গোড়াপত্তন এখানে। ইংরেজ সরকার তা চেয়েছিল এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

কিন্তু বাহ্যতঃ সরকার জয়ী মনে হলেও দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে চলছিল এক প্রকার অচল অবস্থা। দেশের ভিতরে ও বাইরে বুদ্ধিমান লোকেরা হয়ে উঠছিলেন চিন্তিত। মুসলিম লীগের বাইরের ও ভিতরের লোক কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে স্বাধীনতার পথ সুগম করার জন্য জিন্না সাহেবের উপর চাপ দিচ্ছিল। ১৯৪৪ আগস্ট মাসের গোড়ায় জিন্না সাহেব একটি বিবৃতি দিয়ে মহাত্মাজী ও তাঁর মধ্যে আলোচনার দ্বারা সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতীতকে সমাধিস্থ করার কথাও বলেন। এই প্রথম জিন্না সাহেব গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করেন আর এই শেষ। আর কখনো তাঁকে 'মহাত্মা' বলেননি। এই বিবৃতির ফলে বৃটিশ সরকার বিচলিত হয় এবং ভাইসরয় এ কথা ঘোষণা করেন যে, সীমাবদ্ধ শক্তি সম্পন্ন অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের কথা ভাববার পূর্বে শুধু হিন্দু মুসলমান নয়, ভারতের অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সমূহেরও ঐক্য চাই। বিলাতের রক্ষণশীল দলের মুখপত্র লণ্ডন টাইমস স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, এদের মিলন হলেও অস্পৃশ্যদের এবং দেশীয় রাজাদের দাবী পূরণ না হলে রাজনৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব। রক্ষণশীল সরকার কিছুতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি।

মহাত্মাজী বন্দী থাকা অবস্থায়ও জিন্না সাহেব ১৯৪৩ সালে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগ অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, গান্ধীজী যদি মুসলিম লীগের সঙ্গে বুঝাপড়া করতে চান তা হলে সে প্রচেষ্টাকে তাঁর চেয়ে বেশী কেউ স্বাগত জানাবেন না। তবে

সরকার ক্ষমতাশালী হতে পারে, কিন্তু মিঃ গান্ধী যদি তাঁকে চিঠি লেখেন তা সরকার আটকাবার সাহস পাবে না। মহাত্মাজী এই ঘোষণা পড়ে জিন্না সাহেবকে চিঠি লেখেন। সরকার তা আটক করে। শুধু চিঠির মর্ম জানিয়ে দেয়। এজন্য জিন্না সাহেব সরকারের উপর রুষ্ট হন না। তিনি যেরূপ চিঠি চেয়েছিলেন সেরূপ চিঠি আসেনি বলে পাশ কাটিয়ে যান।

যা হোক, এবারেও জিন্না সাহেবের বিবৃতির উত্তরে মহাত্মাজী তাঁকে চিঠি লেখেন সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা জানিয়ে। সে সাক্ষাৎ হয় জিন্না সাহেবের বাড়ীতে বোম্বেতে ৯ই সেপ্টেম্বর এবং আঠারো দিন ধরে কথাবার্তা চলে। প্রথম দিন প্রেমালিঙ্গন, একত্র ফটো ইত্যাদি সবই হয়, কিন্তু আলোচনা মোটেই ফলপ্রসূ হয় না। পুনরায় জিন্না সাহেবের সেই পুরাতন কথা। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব মুসলিম বিরোধী, তা প্রত্যাহার করুন; আপনি হিন্দু কংগ্রেসের প্রতিনিধি ইত্যাদি। মহাত্মাজী ভারত ছাড় প্রস্তাব ঠিকই হয়েছিল এবং তা মোটেই মুসলিম বিরোধী নয় বলেন অতএব তা প্রত্যাহারের প্রশ্নই উঠে না। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয় এবং তিনি সমস্ত জাতির প্রতিনিধিত্ব করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। জিন্না সাহেব বলেন যে, হিন্দু মুসলমান দুইটি পৃথক্ নেশন। দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর জোর দেন। মহাত্মাজী বলেন যে, অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান হিন্দু হতে ধর্মান্তরিতদের সন্তান-সন্ততি। অতএব এ দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এখানে এ কথা বলে রাখা ভাল যে, জিন্না সাহেবের পরিবারও দুই পুরুষ পূর্বে হিন্দু ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি-মনীষী স্যার মহম্মদ ইকবালের পূর্বপুরুষও ছিলেন হিন্দু। মহাত্মাজীর কাছে শুনেছি তিনি তা গর্বের সঙ্গে বলতেন। তাঁর কথা ছিল "আমি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ জিনিস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।" ধর্মান্তরিত হলেই যদি পৃথক্ নেশন হয় তবে ভারতবর্ষে কয়টি নেশন এ কথাও জিজ্ঞাসা করেন মহাত্মাজী। মুসলমানরা এক নেশন যদি হয় তবে আফগানিস্তানের মুসলমানেরা

কি ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্ভুক্ত? এ প্রশ্নের জবাবে অবশ্য জিন্না সাহেব পৃথিবীর মুসলমান এক এই জিগিরকে অর্থহীন বলেন। জিন্না সাহেব লীগের লাহোর প্রস্তাব মেনে নিতে বলেন। মহাত্মাজী বলেন যে, তার মধ্যে পাকিস্তান বা দ্বিজাতিতত্ত্বের উল্লেখ নেই। জিন্না সাহেব বলেন, যদিও স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তথাপি উহাই ওই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ভিত্তি বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত। ওই প্রস্তাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথাই আছে। কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে, কিন্তু একযোগে চেষ্টা করে স্বাধীনতা অর্জন করার পরই কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের পৃথক্ হওয়ার কথা উঠতে পারে। যদি তারা চায় তবে গণভোটে তা ঠিক হবে। আর পৃথক্ হলেও প্রচ্ছন্ন শত্রু হিসাবে নয়। ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহের পথ রুদ্ধ করার জন্য দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, বাণিজ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে। শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে পৃথক্ হওয়া দুই অংশের পক্ষেই ক্ষতিকর। জিন্না সাহেব বলেন যে, আগে কংগ্রেস ও লীগ ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তার পরে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচেষ্টা, এবং ভাগ হলে দুইটি অংশই হবে পৃথক্ সার্বভৌম রাষ্ট্র, অতএব দেশরক্ষা ইত্যাদির প্রশ্ন উঠে না। এর অর্থ এই যে, ইংরেজ থাকতেই ভারত ভাগ এবং এক ভাগ ইচ্ছা করলে ভিন্ন দেশের সাহায্য নিয়েও অপর ভাগের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে। মহাত্মাজী ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করেন এবং বলেন যে, সম্মতি নিয়ে এ জিনিস হতে পারে না। গায়ের জোরে হয় ত পৃথক্ কথা।

১৯৪৩ সালে মহাত্মাজীর অনশনের সময় আগা খাঁ প্রাসাদে কিছু কিছু লোক যেতে পারেন। রাজাজী তাঁদের মধ্যে একজন। ভারত ছাড় প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন বলে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি। তিনি ভাবতে থাকেন যে, মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে তবে স্বাধীনতা লাভ হবেই। যদি কংগ্রেস মুসলিম সংখ্যা-

গরিষ্ঠ অঞ্চল সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে তা হলে নিশ্চয় মুসলিম লীগ স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেবে। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি একটি প্রস্তাবের খসড়া করেন। জিন্না সাহেবের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনাও করেন। সেই প্রস্তাবের খসড়া আগা খাঁ প্রাসাদে মহাত্মাজীকে দেখান। মহাত্মাজী তা অনুমোদন করেন। কিন্তু জিন্না সাহেব তা অনুমোদন করেন না। কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন রাজাজী আলেয়ার পেছনে ছুটেছিলেন। খুব বুদ্ধিমান লোকেরও কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রম ঘটে। গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় রাজাজীর প্রস্তাবের কথাও উঠে। জিন্না সাহেব মোটেই তাকে আমল দেননি।

মহাত্মাজী জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন শুনেই হিন্দু মহাসভার একদল খুব ক্রুদ্ধ হয়। মহারাষ্ট্রে তখন হিন্দু মহাসভার প্রভাব বাড়ছিল। এক দল মহারাষ্ট্র যুবক এমনকি জোর করেও মহাত্মাজীর যাওয়া বন্ধ করার জন্য সেবাগ্রামে পিকেটিং করতে আসে। পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করে। দলপতির কাছে একটি বড় ছোরা পাওয়া যায়। পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তার সময় মহাত্মাজীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা এবং সে কাজের জন্য 'জমাদারই' যথেষ্ট বলে। 'জমাদার' হল শ্রীনাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে। সেও ছিল পিকেটারদের মধ্যে। এই গড্‌সেই ১৯৪৮ সালে মহাত্মাজীকে হত্যা করে। এর পূর্বেও মহারাষ্ট্রে দুই বার মহাত্মাজীকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। পুনা মিউনিসিপ্যালিটীর অভ্যর্থনা সভায় যাওয়ার সময়কার ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় বার চেষ্টা হয় ১৯৪৬ সালে জুন মাসে। তিনি বিশেষ ট্রেনে দিল্লী হতে পুণা যাচ্ছিলেন। নিরাল ও করজাত স্টেশনের মধ্যে সেই ট্রেনকে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়। ইঞ্জিন চালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সেবার অল্পের জন্য রক্ষা পান।

মহারাষ্ট্রে আধুনিক যুগেও তিলক ও গোখলের ন্যায় রাজনীতিবিদ্, রানাডের ন্যায় সমাজসেবী, ভাণ্ডারকরের ন্যায় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্, কার্ভের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষাব্রতী জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের ও

পরিতাপের বিষয়, সেই প্রদেশে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করার বিশেষ প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র হয়। কোথাও গোড়ায় গলদ রয়েছে। মহারাষ্ট্রের চিন্তাবিদ্‌দের কোথায় গলদ বের করে তা দূর করবার পথের সন্ধান দিতে হবে। নইলে দেশের আরো কত অকল্যাণ হবে তা কে জানে।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কিছুদিন পরে ভাইসরয় কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইনসভা দলের নেতা শ্রীভুলাভাই দেশাইকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী দলের মধ্যে বুঝাপড়া করে অচল অবস্থা দূর করার জন্য একটা প্রস্তাব দেন। তার ভিত্তিতে শ্রীভুলাভাই মুসলিম লীগ দলের ডেপুটি লীডার লিয়াকৎ আলী খান সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেন। উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। ভুলাভাইজীর ধারণা লিয়াকৎ আলী সাহেব এ বিষয় জিন্না সাহেবকে জানিয়েছেন যেমন তিনি নিজে জানিয়েছেন মহাত্মাজীকে। অবশ্য জিন্না সাহেব ও লিয়াকৎ সাহেব দুজনেই সে কথা অস্বীকার করেন। লিয়াকৎ সাহেব এমনকি চুক্তির কথাও অস্বীকার করেন। বোধ হয় চাপে পড়েই তিনি তা করেছেন। নতুবা যে যুক্তি দেখান তা নিতান্তই খেলো। চুক্তির সর্তগুলি দুইখানা কাগজে লিখে ভুলাভাইজীর সই করা একখানা কাগজ লিয়াকৎ সাহেব রেখে দেন আর তাঁর সই করা কাগজ ভুলাভাইজী রাখেন এবং তাতে ভুলাভাইজী দস্তখতও দেন। লিয়াকৎ সাহেবের কাছে যে কাগজ খানা ছিল তাতে তাঁর নিজের দস্তখত ছিল না। এই যুক্তি দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোন লোক সমর্থন করবে না।

তবে ভাইসরয়ের এই প্রচেষ্টার ভিতরে সদিচ্ছার অভাব ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। কংগ্রেস ও ওয়ার্কিং কমিটীকে ডিঙ্গিয়ে একটা কিছু করা। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমেদনগর ফোর্ট হতে মুক্তি পেয়ে বোম্বে এসেই তা বুঝতে পারি। বন্ধুবর শ্রীবালাসাহেব খের (বোম্বের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী) ও

অন্যান্য কংগ্রেস নেতার কাছে শুনতে পাই যে, মাত্র কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার ফ্রান্সিস মুডি সেখানে এসেছিলেন এবং তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সেই আলাপের লিখিত সারমর্ম আমাকে দেন। তাতে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থীর উল্লেখ করেছেন স্যার ফ্রান্সিস। এমনকি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, জওহরলালজী ও সর্দার বল্লভভাইকে ছেড়ে দিলে মহাত্মাজী যা চান তা হবে না। অতএব সমস্ত জিনিসটাই কূট রাজনীতির খেলা। শরীর একটু ভাল হলেই মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ওয়ার্ধায় আসি (জানুয়ারী ১৯৪৫)। এসে এ বিষয়ের সমস্ত চিঠিপত্র পড়ে ও মহাত্মাজীর কথা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, তিনি প্রথম হতেই এ কথা ভুলাভাইজীকে জানিয়েছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অনুমতি ভিন্ন কিছুই হতে পারে না। সরকার যখন বুঝতে পারল যে মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটীর মত ভিন্ন কিছু করতে রাজী নন, তখন তাদের উৎসাহ কমে গেল। কারণ তখনো বিলাতের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে মুক্তি দিতে রাজী নয়।

বন্দিশালা হতে মুক্ত হওয়ার পর তিনি গঠনমূলক কার্য যে ভাবে চলছিল তা পরিবর্তনের উপর বিশেষ জোর দেন। বন্দী থাকা অবস্থায়ই ভাবেন বিশ বৎসরের উপর খাদির কাজ চলছে, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, হরিজন সেবক সঙ্ঘ, তালিমী সঙ্ঘ প্রভৃতির কাজও চলছে, তথাপি কেন অহিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি হল না। ভারত ছাড় প্রস্তাবের পর গঠনমূলক কর্মীরা ত অহিংসার কার্যকরী রূপের অভিব্যক্তি দিতে পারেনি। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে, খাদির কাজ চলা উচিত স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে—ব্যবসার দৃষ্টিতে নয়। প্রত্যেকে সূতা কাটবে নিজের ও পরিবারের লোকের কাপড় তৈরীর জন্য। শুধু উদ্বৃত্ত কাপড়ই বিক্রী হবে এবং তাও যথাসম্ভব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। গ্রামে খাদি তৈরী আর শহরে বিক্রী এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। আন্দোলনের সময় শহরের খাদি ভাণ্ডার বন্ধ করে দেওয়াতেই খাদির

কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যদি স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে ঘরে ঘরে চরখা চলত, সরকার তা বন্ধ করতে পারত না। তাতে জাতির শক্তিও বাড়ত। এই স্বাবলম্বন দৃষ্টি ছাড়াও যারা খাদি খরিদ করে ব্যবহার করেন তাদের জন্যও স্থির হল যে, কিছু পরিমাণ পরিবারে উৎপন্ন হাতে কাটা সূতা দিতে হবে। নইলে খাদি খরিদ করতে পারবে না।

রচনাত্মক সঙ্ঘগুলির কাজ যাতে একমুখী ও সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেইজন্য এই সব সঙ্ঘের মিলিত একটি সমিতি গঠিত হল। তার নাম 'সম্মিলিত রচনাত্মক সমিতি'। তার সভাপতি মহাত্মাজী আর সেক্রেটারী শ্রীনরহরিভাই পারেখ। এই সব প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হল 'সমগ্র গ্রামসেবা'। গ্রামগুলি খাদ্য বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, ছেলেমেয়েরা চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করবে। গ্রামে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় থাকবে, অস্পৃশ্যতা থাকবে না, মাদকদ্রব্য চলবে না, ইত্যাদি। এরূপ গ্রামগুলি হবে অহিংসার প্রতীক। সমস্ত কাজটাই হবে বিকেন্দ্রীকৃত। স্বাধীনতা লাভের পর যদি গ্রামগুলিকে এ ভাবে গঠন করার প্রচেষ্টা হত তবে দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হত। দুর্ভাগ্য তা হয়নি।

১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হয়। পরাজিত জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু বৃটেনে শ্রমিকদল আর যুক্ত মন্ত্রিসভায় বা জাতীয় সরকারে থাকতে রাজী হয় না। অতএব বাধ্য হয়ে মিঃ চার্চিল সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। নির্বাচনে ভারতীয় সমস্যা একটা বিশেষ বিষয় হয়ে উঠে। শ্রমিকদল অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে চায়। দলের একজন মুখপাত্র এ কথাও বলেন যে, তাঁরা ক্ষমতায় আসীন হলে ইণ্ডিয়া অফিস বন্ধ করে দেওয়া হবে, ঔপনিবেশিক দপ্তরে সে কাজের ভার যাবে। পূর্ণ স্বাধীনতার কল্পনা তখনও তাঁদের ছিল না।

শ্রমিক দলের চাপে চার্চিল সরকারও একটু বিচলিত হয়। এই

সময়ে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল বৃটেনে। সেখানে পরামর্শ করে ভারতে ফিরে এসে অল্প কয়েক দিন পরে ১৪ই জুন এক বিবৃতি দেন। তার আসল কথা হল :—(১) বৃটিশ সরকার কোন শাসন ব্যবস্থা ভারতের উপর চাপিয়ে দিতে চায় না। তা ভারতীয়রাই স্থির করবে। (২) ভাইসরয় ও প্রধান সেনাপতি বাদে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সমস্ত সভ্য ভারতীয় হবে, বৈদেশিক নীতিও একজন ভারতীয়ের হাতে থাকবে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতার জন্য এই ব্যবস্থা। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা সমান হবে। (৩) ভাইসরয় বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে সিমলায় একটি সম্মিলনী ডাকবেন উপরোক্ত উদ্দেশ্যকে রূপ দেওয়ার জন্য।

ঠিক এই সময় ভারতের জন্য স্টেট সেক্রেটারী মিঃ আমেরীর নির্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের মুক্তি দেওয়া হয়।

ভাইসরয় সিমলাতে কনফারেন্স আহবান করেন। একুশ জন লোক নিমন্ত্রিত হন। এগারটি প্রদেশের প্রিমিয়ার বা মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাষ্ট্রসভার কংগ্রেসের নেতাদ্বয়, মুসলিম লীগের আইন সভার ডেপুটি নেতা ও রাষ্ট্রসভার নেতা, কেন্দ্রীয় আইন-সভার জাতীয় দলের নেতা ও ইউরোপীয় গ্রুপ নেতা, অস্পৃশ্যদের ও শিখদের এক জন করে প্রতিনিধি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দুইটি রাজনৈতিক দলের নেতা মহাত্মা গান্ধী ও জিন্না সাহেব।

এই বিবৃতি ঘোরতর আপত্তিকর। প্রথমতঃ স্বাধীনতার কথা কোথাও নেই। দ্বিতীয়তঃ বর্ণহিন্দু কথার উল্লেখ এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সমতা। কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দু প্রমাণ করার অপচেষ্টা। মুসলমান কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে নিমন্ত্রণ না করা। সর্বতোভাবে কংগ্রেসকে হেয় করা ও মুসলিম লীগকে তুলে ধরবার অপপ্রয়াস। এ সবই মহাত্মাজীর কাছে আপত্তিকর মনে হয়। মহাত্মাজী কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না, পারেন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।

এ কথা তিনি ভাইসরয়কে জানাবার পর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ নিমন্ত্রিত হন। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, এই প্রথম কোন সরকারী কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্বমূলক ভিত্তি স্বীকৃত হয়, সরকারী মনোনয়ন নয়। ভাইসরয় এ কথাও জানান যে, প্রতিনিধিরা কনফারেন্সে এসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করতে পারেন। পূর্ব হতে কোন জিনিস তাদের মেনে নিতে হবে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সিমলা কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। মহাত্মাজীও সিমলা যান। তিনি কনফারেন্সে যান না। সব সময়ই পরামর্শ দেন। ভাইসরয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

কনফারেন্সে আলোচনা কয়েক দিন ধরে চলে। শেষ পর্যন্ত ফল কিছু হয় না। এ জন্য দায়ী জিন্না সাহেবের অযৌক্তিক জিদ এবং ভাইসরয়ের তাঁকে অসন্তুষ্ট করবার অনিচ্ছা। জিন্না সাহেব জিদ ধরেন যে, ভাইসরয়ের কাউন্সিলে মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তি ভিন্ন কোন মুসলমান থাকতে পারবেন না। ভারতে ইংরেজ সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতি এর জন্য দায়ী। যুদ্ধপূর্ব সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদেরও খুব সামান্য সংখ্যক ভোট পায়। তাকে ফাঁপিয়ে তুলবার প্রধান কারিগর ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো।

লর্ড ওয়াভেলের এই প্রচেষ্টা ছিল বিলাতের রক্ষণশীল দলের স্বার্থে অর্থাৎ নির্বাচনে সুবিধার জন্য। কিন্তু তা হল না। নির্বাচনে রক্ষণশীল দল পরাজিত হয় এবং শ্রমিক দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় জুলাই মাসে। আগস্ট মাসে জাপানও আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়।

তবে সিমলা যাওয়ার একটা ফল হয়েছিল। সিমলার স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য খানিকটা ভাল হয়।

বন্দিশালা থেকে বের হবার পর মহাত্মাজীর ইচ্ছা ছিল বাংলা দেশে আসবার। বাংলা দেশে ভীষণ ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ জনিত লক্ষ

লক্ষ লোকের মৃত্যু, এবং সরকারী নির্মম দমন নীতির খবর তাঁকে খুবই ব্যথিত করে। কিন্তু এলে যদি কোন বাধা নিষেধ আরোপিত হয় তা তিনি মান্য করতে পারবেন না, অথচ দেশের সে সময়কার পরিস্থিতিতে আইন অমান্য করাও ঠিক মনে করেননি। অতএব তাঁর মনের ইচ্ছা মনেই ছিল। কিন্তু সিমলা সম্মিলনীর সময় বাংলার গভর্নর মিঃ কেসী তাঁকে খবর পাঠান যে, তিনি বাংলায় এলে স্বাগত জানাবেন। তিনি যে কোন জায়গায় যেতে পারবেন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা সাক্ষাৎ করতে পারবেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ১লা ডিসেম্বর বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমেই মিঃ কেসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হবে, স্বাধীনতা আসছে এবং বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে মনস্থির করেছে এ কথা বলেন মিঃ কেসী। মহাত্মাজী তাঁকে বলেন "ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দেখতে চাই। ধরুন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি।" "অনেককে ছাড়া হয়েছে, বাকী স্বাধীন সরকার করবে" মিঃ কেসীর এ কথার উত্তরে মহাত্মাজী বলেন "তাই বা কেন, আপনারাই তাঁদের কাজটা করে রাখুন না।" এর পর অবশ্য অবশিষ্ট বন্দীদের অর্ধেকের বেশী মুক্তি দেন মিঃ কেসী। কিন্তু সবাইকে নয়। সে কাজ করতে হয় স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভাকে। যদিও এই সব বন্দীরা মহাত্মাজীর পথের পথিক ছিলেন না, তবু তাঁদের দেশপ্রেম ও ত্যাগ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল তাঁর। তাই তিনি চাইতেন তাঁদের মুক্তি। বাংলার এই সব বিপ্লবীরাও তাঁর এ মনোভাবের অমর্যাদা করেননি। মহারাষ্ট্রে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিন্তু বাংলার এই বিপ্লবীদের কেউ তা চিন্তাও করেননি।

এই ডিসেম্বর মাসেই কলিকাতায় ভাইসরয়ের সঙ্গে মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ হয়। ভাইসরয় ঠিক তার পূর্বে বণিকসভায় বক্তৃতা কালে বলেন যে, 'ভারত ছাড়' এই বুলি জাদুবিদ্যার কাজ করবে না। ভারতের সমস্যা জটিল। কংগ্রেস সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বটে, কিন্তু

সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা রয়েছে, তার মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী এবং তাদের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ, আর রয়েছেন দেশীয় নৃপতিবর্গ। মহাত্মাজী সাক্ষাতের সময় স্পষ্টভাব বলেন যে, ইংরেজের ভারতে থাকার এবং বানরের পিঠে ভাগ নীতি অনুসরণ করার কোন অধিকার নেই।

কবিগুরুর মৃত্যুর পর এই প্রথম তিনি বাংলায় আসেন। অতএব শান্তিনিকেতনে যান। বোলপুর স্টেশন হতে নেমে তিনি তিন মাইলের উপর হেঁটে যান। গাড়ীতে যেতে অস্বীকার করেন। তীর্থযাত্রা করতে হলে হেঁটে যাওয়াই প্রশস্ত এই যুক্তি দেন। কবিগুরুর স্থান শান্তিনিকেতনকে তিনি তীর্থস্থান বলে মনে করতেন।

এখানে মিঃ এণ্ড্রুজের স্মৃতি রক্ষার জন্য হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু সংগৃহীত টাকা দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে মহাত্মাজীর জীবিতকালে হাসপাতাল গড়ে উঠেনি। এটা ছিল তাঁর কাছে খুব দুঃখের।

শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয় তা তিনি পছন্দ করেননি এবং কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য সূতা কাটার উপদেশ দেন। গুরুদেব চাইতেন সমস্ত বিশ্বে শান্তি ও প্রেম। সেই আদর্শকে কার্যকরী করতে বলেন।

কংগ্রেসকর্মীদের নিমন্ত্রণে ওই বীরভূম জিলার রামপুরহাট নামক স্থানেও যান। সেখানে জনসভায় তিনি গঠনমূলক কাজের উপর বিশেষ জোর দেন। ফিরবার পথে ট্রেনে তাঁর সঙ্গে একান্তে খানিকক্ষণ আলাপ করি। তাঁকে নাম ধরে ধরে ভারতে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গঠনমূলক কাজে ভাসা-ভাসা বিশ্বাস, কোন কোন দফায় অবিশ্বাস, এমনকি বিপরীত আচরণ প্রভৃতির উল্লেখ করি। বলি সাধারণ স্তরে এ সব হতেই পারে, কিন্তু উপরের স্তরে এ অবস্থা হলে স্বাধীনতা আসতেও দেরী হবে, আর যদি বা আসে তাও জনকল্যাণকর হবে না। যাঁদের যাঁদের নাম করি তাঁদের সমর্থন করেন না। কিন্তু

বলেন, "এর চেয়ে ভাল লোক এ কাজে পাচ্ছি কোথায়? তাই ফললাভও আশানুরূপ হচ্ছে না।" এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন তা স্বীকার করলেন। বুঝলাম এজন্য হৃদয়ে গভীর বেদনা।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি মেদিনীপুর জিলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় যান আট নয় দিনের জন্য। এই দুই মহকুমায় ভারত ছাড় আন্দোলন খুব জোর ধরে। পুলিস ও সৈন্যদলের নির্মম অত্যাচার হয়। এমনকি মেয়েদের উপরও অকথ্য অত্যাচার হয়। কংগ্রেস কর্মীরাও জাতীয় সরকার এবং বিদ্যুৎ বাহিনী গঠন করে কাজ করে। কিন্তু তারা সব সময় অহিংস পথে চলেনি। তাদের দাবী তারা কোন লোককে হত্যা করেনি। যদিও স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ তাদের উপর সে দোষারোপও করে। এরূপ যখন চলছিল তখন ৺দুর্গাপূজার সময় (১৯৪২) প্রচণ্ড ঝড়ে, সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে এই দুই মহকুমার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ভীষণ ক্ষতি হয়। বহু লোক ও গবাদি পশু মারা যায়, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়, শস্য নষ্ট হয়, তার পর হয় দুর্ভিক্ষ। আমি সুতাহাটা থানায় কারো কারো মুখে শুনেছি এই ঝড় ও প্লাবন না হলে পুলিশ ও সৈন্যদলের বীভৎস নগ্ন মূর্তি আরো দেখতে হত। এই হিসাবে বিধাতার নিষ্ঠুর তাণ্ডবও খানিকটা বরস্বরূপ হয়েছিল।

মহাত্মাজী কর্মীদের বলেন, "জাতীয় সরকার ও বিদ্যুৎ বাহিনী গঠন করে যা করা হয়েছে তার অনেকটাই উচিত হয়নি। দুঃখের কথা, এত বৎসর পরেও কংগ্রেসের কি নীতি জনগণ তা বুঝতে পারেনি। হত্যা না করলেই অহিংসা পালন করা হল এরূপ ধারণা মস্ত বড় ভুল।" হিংসা, অহিংসার ব্যাপারে তাঁর কথার সারমর্ম হল এই যে, হিংসা চিরকালই অধিকতর হিংসার কাছে মাথা নত করে। "দেখ না দুর্ধর্ষ বীর জাপানী জাতির আজ কি অবস্থা! আর তোমরা এত করেও কি মেয়েদের সম্মান রক্ষা করতে পেরেছ?"

কাঁথিতে যেরূপ শৃঙ্খলা সহকারে প্রায় লক্ষ লোক তাঁর বক্তৃতা শোনে তাতে তিনি মুগ্ধ হন। সারা দেশে এরূপ শৃঙ্খলা বজায়

থাকলে কেউ তাদের স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করতে পারবে না বলেন। এখানে মেদিনীপুর জিলার কর্মীদের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেন। গঠনমূলক কাজ শুধু চরখা ও খদ্দর নয়, যদিও তার স্থান খুব উচ্চে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি আরো সতেরো দফার কথা বলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সামগ্রিক।

এইখানে কর্মীদের সামনে তিনি এরূপ মন্তব্য করেন যে, সুভাষবাবু জীবিত আছেন। পরে অবশ্য তাঁর এ ধারণা বদলায়। ১৯৪৮ সালে সুভাষবাবুর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় তাঁকে 'স্বর্গত দেশপ্রেমিক' বলে উল্লেখ করেন।

এই ডিসেম্বর মাসে মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এই মর্মে এক প্রস্তাব পাশ করে যে, ভীতি প্রদর্শন, রেল লাইন উড়ানো, টেলিগ্রাফের তার কাটা অথবা সাধারণের সম্পত্তিতে আগুন লাগানো কংগ্রেসের অহিংস নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

এর কিছুকাল পরেই সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। মহাত্মাজী নির্বাচন ব্যয়ের প্রশ্ন উঠান এবং বলেন যে, যদি কংগ্রেস বিনা খরচে নির্বাচনে জয়ী হতে পারে তবেই সত্যিকারের জয় হবে। সেই আদর্শে দৃঢ় থেকে কংগ্রেস হেরে গেলেও তিনি দুঃখিত হবেন না। বিনা খরচে ত দূরের কথা, যা খরচ করা আইনসিদ্ধ তার চেয়ে বেশী খরচ করেই অধিকাংশ সভ্য বিধান সভা বা লোকসভায় যান এবং নির্বাচন খরচের মিথ্যা হিসাব দাখিল করেন। এইখানেই গোড়ায় গলদ। তাই দেশে আজ চলছে গণতন্ত্রের প্রহসন। ঠিক জায়গায় ধরেছিলেন মহাত্মাজী।

বাংলায় আসবার পূর্বে নভেম্বর মাসে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে তৈরী আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের বিচার আরম্ভ হয় দিল্লীর লালকেল্লায়। শ্রীভুলাভাই দেশাই মুখ্য ব্যারিস্টার। মহাত্মাজী এদের মুক্তি দেওয়ার জন্য ভাইসরয়ের কাছে আবেদন করেন। তাতে তিনি

বলেন যে, হিংসার পথে তাঁর বিশ্বাস নেই। তথাপি ভারতের জনগণ যাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাদের মুক্তি দেওয়াই সঙ্গত। ভাইসরয় এদের মুক্তি দেন না। পরে কেবিনেট মিশন ভারতে এলে মহাত্মাজী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা বলেন লর্ড পেথিক-লরেন্সকে। দেশ যখন স্বাধীন হতে যাচ্ছে এদের ত আর স্বাধীনতার জন্য হিংসাত্মক কার্য করতে হবে না এ যুক্তি দেন। সেই যুক্তি মেনে এপ্রিল (১৯৪৬) মাসে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের মুক্তি দেওয়া হয়।

বাংলা হতে মহাত্মাজী উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে যান। মাদ্রাজে তখন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। কি করা যায় ভাবছেন। মনে করেন এজন্য প্রত্যেকের কৃচ্ছ্রসাধন করা ও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন। তবে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত সরকারই এ সমস্যার পুরাপুরি সমাধান করতে পারে। ভাইসরয় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ জর্জ আবেলকে ওয়ার্ধায় পাঠান মহাত্মাজীর কাছে। নেতাদের সহযোগিতা কামনা করে একটি পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। সেই সমিতির চেয়ারম্যান ভাইসরয় নিজে, আর মহাত্মাজী, জিন্না সাহেব ও ভূপালের নবাব সাহেব এই তিন জন সভ্য। মিঃ আবেলের কাছে সব কথা শুনে মহাত্মাজী বলেন যে, দেখছি সেই পুরানো সমতার ভূত—হিন্দু-মুসলমানের সমতা, গান্ধী-জিন্না সমতা—আর রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি। এ প্রস্তাবে মহাত্মাজী রাজী হন না।

বাংলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ সফরের সময় হরিজন সেবার জন্য যথারীতি অর্থ সংগ্রহ করেন। বন্দিনিবাস হতে বের হবার পর বাংলায় আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে হরিজন পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়। ১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আবার মহাত্মাজী তা প্রকাশ করা আরম্ভ করেন।

১৯৪৬ সালে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন হয়। কংগ্রেস নেতৃবর্গ

প্রায় তিন বৎসর জেলে ছিলেন। এই সময় মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থন পুষ্ট হয়ে পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে। বাংলা ও সিন্ধুদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা এবং পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির সঙ্গে একযোগে লীগ মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকী আটটি প্রদেশে গঠিত হয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশে লীগ এমনকি অধিকাংশ মুসলমান আসনও অধিকার করতে পারে না। কারণ সেখানে খান আবহুল গফ্‌ফর খানের মত জনপ্রিয় বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন কংগ্রেসে। সেরূপ বলিষ্ঠ মুসলমান নেতৃত্ব বাংলা, পাঞ্জাব বা সিন্ধুদেশে কংগ্রেসে ছিল না। থাকলে ভারত ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ভারত তার নিজের সংবিধান তৈরী করবে। ভারত ডোমিনিয়ন হিসাবে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ স্বাধীনও হতে পারে। তাঁরা সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অগ্রগতি রোধ করে থাকবে তা হতে পারে না। তিনি এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয় নৃপতিবর্গ ভারতের অগ্রগতিতে বাধাস্বরূপ হবেন না।

এই ঘোষণা তিনটি বিষয়েই স্পষ্ট। ভারত স্বাধীন হবে, সংখ্যালঘুরা অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারবে না, আর দেশীয় রাজন্যবর্গও ভারতের অগ্রগতির তালে পা ফেলে চলবেন।

তারপর এই মার্চ মাসেই বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন মন্ত্রী—লর্ড পেথিক-লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও মিঃ আলবার্ট আলেকজাণ্ডার ভারতে এলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ওই ঘোষণাকে রূপ দিতে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং সংবিধান কি ভাবে রচিত হবে এই হুইটি হল আসল প্রশ্ন।

কিছু দিন আলোচনার পরই বুঝতে পারা গেল মিঃ এটলীর

ঘোষণার সঙ্গে এঁদের আচরণের সামঞ্জস্য নেই। লর্ড ওয়াভেল ত স্পষ্টতঃ লীগের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কমিশনের সভ্যগণের মাথায়ও সংখ্যালঘু সমস্যার ভূত। এদিকে জিন্না সাহেব ত তাঁর দাবী চরমে চড়িয়ে রেখেছেন। পাকিস্তান চাই—ইংরেজ থাকতেই দেশভাগ—দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি। বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্তান নিয়ে হবে পাকিস্তান। যুদ্ধের সময় লীগ যতটা পেরেছে সাহায্য করেছে সরকারকে, কংগ্রেসের ভারত ছাড় প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। লর্ড লিনলিথগো ও ওয়াভেল তা ভুলতে পারেননি, কমিশনের মনেও যে তার প্রভাব ছিল না এ কথা বলা যায় না। জিন্না সাহেব এর উপর নির্ভর করেই আবদারে ছেলের মত ব্যবহার করেছেন।

আলোচনা দিল্লী ও সিমলায় প্রায় দেড় মাস ধরে চলে। মহাত্মাজী দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনীতে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যরাও দিল্লীতে। জিন্না সাহেব এবং লীগের কার্যকরী সমিতিও সেখানে।

এই আলোচনা ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাতে মহাত্মাজীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ ছোট পুস্তকে তার পুরাপুরি ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নয়। একটু অসুবিধাও আছে। তার সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ওয়ার্কিং কমিটীর যৌথ দায়িত্ব। সিদ্ধান্তও যৌথ। অতএব কে কি বলেছিলেন এবং কার কোন্ কথা শুনলে ভারত ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত সে সব অবান্তর। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বুদ্ধিমান হওয়া সহজ। যা হয়েছে তার জন্য সবাই দায়ী। তাই যেটুকু সমালোচনা করব, তা ওয়ার্কিং কমিটী হিসাবেই।

আমার মতে ১৯৪৬ সাল হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টা মহাত্মাজীর জীবনের সবচেয়ে গরিমাময় অধ্যায়। এক দিকে জিন্না সাহেবের অন্যায় জেদ ও সাম্প্রদায়িকতা, ইংরেজ সরকারের অযৌক্তিক লীগপ্রীতি,

এমনকি ভারত ছাড় আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসকে একটা শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা ; অপর দিকে দেশের আবহাওয়ায় হিংসা ভাব বর্তমান কাজেই মহাত্মাজী কোন প্রকারের সত্যাগ্রহ করতে প্রস্তুত নন, ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যরা বাস্তববাদী, মহাত্মাজীর আদর্শ পুরাপুরি গ্রহণ করা অবাস্তব মনে করেন, আবার লীগ ও খাকসার আন্দোলনের পাল্টা হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের আন্দোলন। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মহাত্মাজী তাঁর অহিংসাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন। ওয়ার্কিং কমিটীকে যতটা সম্ভব সঙ্গে নিয়ে চলেন। ওয়ার্কিং কমিটীও তাঁর মতকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। জিন্না সাহেবকেও যতদূর সম্ভব মানিয়ে নিতে চান, কিন্তু জিন্না সাহেব এমনকি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে একাকী বসতেও রাজী হতেন না। লীগের মতে কংগ্রেস শত্রু, কিন্তু মুসলিম লীগের বাইরের মুসলমান বিশ্বাসঘাতক।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সুস্পষ্ট মত ছিল যে, ভারতের সর্বাধিক যোগ্য সম্পূর্ণ সৎ লোক নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান সমতা বা কংগ্রেস-লীগ সমতার কথা অযৌক্তিক। তাঁর এই মত ছিল যে, এক জন সৎ ও যোগ্য হিন্দু হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ করতে পারে, তেমনি পারে একজন সৎ ও যোগ্য মুসলমান। তাই এক দিন যখন স্যার স্টাফোর্ড মহাত্মাজীকে বলেন যে, জিন্না সাহেব সেরূপ সরকার প্রতিষ্ঠায় রাজী, তখন কি খুশী তিনি! কিন্তু জিন্না সাহেব পিছিয়ে যাওয়ায় তা হল না।

আলোচনা যত চলতে থাকে ততই স্পষ্ট হয় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষা করার পরম দায়িত্ব যেন ব্রিটিশ সরকারের। মিঃ এটলীর ঘোষণা সত্ত্বেও মিশনের ঘাড়ে এই ভূত চেপেছিল। মিঃ আলেকজাণ্ডার ত প্রাইভেট বৈঠকে এপ্রিল মাসেই বলেন অবিভক্ত ভারতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতি সুবিচার হবে কিনা সন্দেহ। সিমলাতে মিশন যখন কনফারেন্স ডাকে তখন কংগ্রেস ও লীগ

প্রত্যেকের চার জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে বলে। আবার সেই কংগ্রেস-লীগ সমতা। সংখ্যালঘুদের প্রতি এই অহেতুক দরদ মহাত্মাজীর মতে 'সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষ'। মহাত্মাজী চেয়েছিলেন প্রথম ইংরেজ চলে যাক, তারপর যদি ভারতের কোন অংশ পৃথক্ হতে চায় তবে উভয় অংশের সুবিধার ব্যবস্থা করে তা হতে পারে। যদিও তিনি মনে করতেন দেশবিভাগ হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পক্ষে ক্ষতিকর তথাপি কোন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। অবশ্য আত্মনিয়ন্ত্রণ যাতে আত্মহত্যার সামিল না হয় সেদিকে ছিল তাঁর দৃষ্টি।

আলোচনা চলা কালে মহাত্মাজী বা ওয়ার্কিং কমিটীর কোন সভ্য মিশনের কাছে যে সব চিঠি লিখতেন তা পূর্বেই ওয়ার্কিং কমিটীকে জানানো হত। কোন সময় তা সম্ভব না হলে যথাসম্ভব শীঘ্রই জানানো হত। সভ্যরা সবাই উপস্থিত দিল্লীতে। কিন্তু একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ওয়ার্কিং কমিটীর এক জন বিশিষ্ট সভ্য মহাত্মাজী বা কমিটী কাউকে না জানিয়ে মিশনকে একখানা চিঠি পাঠান। তার মর্ম মহাত্মাজী প্রথম স্যার স্ট্যাফোর্ডের কাছে শুনতে পেয়ে বিস্মিত হন। স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভুল হয়নি ত, মহাত্মাজী ঠিক শুনেছেন কিনা এ সব কথাও কারো কারো মনে উঠে। পরে মহাত্মাজী চিঠিখানা দেখতে পান। তাঁর প্রাণে খুব আঘাত লাগে। সাধারণতঃ এরূপ হলে সেই সভ্যের পদত্যাগ করতে হয়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে মহাত্মাজী ও ওয়ার্কিং কমিটীকে তা হজম করে যেতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল মহাত্মাজীকে। প্রশংসা করি তাঁর ধৈর্যের।

মে মাসে প্রথম কেবিনেট মিশন তাদের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে উপস্থিত করে। এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা কিছুই ছিল না। মহাত্মাজীর মত ছিল প্রথম তা গঠন করা। অতি সঙ্গত কথা। পরিকল্পনায় মিশন সার্বভৌম পাকিস্থান গঠনের দাবী অযৌক্তিক বলে।

দেশরক্ষার দিক দিয়ে বিচার করলে কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে তা সম্ভবপর নয়। আর মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ (শতকরা মাত্র ৩৪ ভাগ) প্রদেশ আসাম এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের ওইরূপ অঞ্চলও তাদের মতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না।

মিশন সংবিধান রচনার জন্য দেশকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করার প্রস্তাব করে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগ। এই সব কাজ পরিচালনার জন্য টাকা তুলবার ক্ষমতাও থাকবে। বাংলা, আসাম নিয়ে একটি গ্রুপ, পাঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে আর একটি এবং তৃতীয় গ্রুপ বাকী সব প্রদেশ নিয়ে। পাকিস্তান স্বীকার না করেও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' ব্যবস্থা। আসামকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলার সঙ্গে গ্রুপে যেতে হবে। আর উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশে '৪৬ সালের নির্বাচনে লীগ পরাজিত এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত, তাকেও যেতে হবে পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে এক গ্রুপে। কংগ্রেস লীগ একমত হতে পারেনি তাই হল বানরের পিঠে ভাগ। মহাত্মাজী কোন প্রদেশকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রুপে যেতে বাধ্য করা অযৌক্তিক মনে করেন।

পাকিস্তানের ভিত্তি স্বীকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সার্বভৌম পাকিস্তান স্বীকৃত হবে এই আশা প্রকাশ করে লীগ মিশন পরিকল্পনা মেনে নেয়।

মিশন পরিকল্পনা লীগ এক ভাবে ব্যাখ্যা করে, কংগ্রেস অন্য ভাবে, মিশন আর এক ভাবে। তারপর দেশীয় নৃপতিবর্গ, বিধান সভার ইউরোপীয় দল প্রভৃতি নানা সমস্যা দেখা দেয়।

মহাত্মাজী মিশনের সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারেন যে, আগে সংবিধান রচনা এবং পরে স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারত সংবিধান রচনা করবে না।

কেবিনেট মিশন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে জুন মাসে

ভাইসরয় ও কেবিনেট মিশন চোদ্দ জনের একটি অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করেন। তার মধ্যে সেই বর্ণহিন্দু-মুসলিম সমতা, কংগ্রেস বা জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম বাদ ইত্যাদি। অর্থাৎ লীগের দাবী স্বীকৃত, আর কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অপচেষ্টা। মহাত্মাজী ঘোর বিরোধিতা করেন এ প্রস্তাবের। ওয়ার্কিং কমিটীকে তাঁর মত দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন যে, এক জন কংগ্রেস মনোনীত জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে না রাখলে এবং ভাইসরয় কর্তৃক চাপানো মিঃ ইঞ্জিনিয়ারকে রাখলে কিছুতেই কংগ্রেসের সে সরকারে যোগ দেওয়া সঙ্গত হবে না। ওয়ার্কিং কমিটী উপরোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে, তবে সংবিধান রচনা সভায় যোগ দিতে স্বীকৃত হয়।

কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যেতে রাজী না হওয়ায় জিন্না সাহেব তাঁকে সরকার গঠনের ভার দিতে বলেন। মিশন সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। পুনরায় নূতনভাবে সরকার গঠনের চেষ্টা হবে বলে। সংখাগরিষ্ঠদের উপর চাপ দিয়ে যতটা লীগের জন্য করা যায় তার জন্য মিশন প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। সেরূপ করলে মিশন গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় হাস্যাস্পদ হত। বৃটেনের জনগণও তা সমর্থন করত বলে মনে হয় না।

জিন্না সাহেব প্রত্যাখ্যাত হয়ে অপমানিত বোধ করেন। ফলে তিনি ও লীগ ক্রুদ্ধ। পরবর্তী কালের কাজও করেন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে। তাই দেখতে পাই বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধিহীনতা। জুলাই মাসে লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৬ই আগস্ট দিন ধার্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে মিশন পরিকল্পনাও প্রত্যাখ্যান করে। লীগ অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নয়, প্রয়োজন মত সব কিছুই করবে এরূপ আস্ফালন আরম্ভ হল। ১৬ আগস্ট দেখা গেল সংগ্রামটা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে। কারণ তাতে বিপদ কম। জিন্না সাহেব ও লীগের এই বুদ্ধিভ্রংশের ফল হল খুব খারাপ।

বাংলা দেশে তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী মিঃ শহীদ সুরাবর্দি। লীগ মন্ত্রিসভা যে ভাবে ১৬ আগস্ট গুণ্ডামি, লুঠ ইত্যাদির প্রশ্রয় দিল তা আধুনিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভিনব। তারা ওই তারিখ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। যারা আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা তারা হয়ে উঠল আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের প্রশ্রয়দাতা। সরকার অরাজকতার প্রশ্রয়দাতা। নূতন ইতিহাস সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, পুলিশের মধ্যেও এনে দিল সাম্প্রদায়িক ভাব। দেশের পরম অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হল। কলিকাতায় মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ। হিন্দুরা প্রথম দিন নির্যাতিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় দিন হতে তারাও পাল্টা জবাব দেয়। তৃতীয় দিনে অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার সৈন্য আমদানী করে। দুই সম্প্রদায়েরই বহু লোক হতাহত হয়। সংখ্যা কেউ ঠিক বলতে পারে না। তবে মুসলমানই বেশী মারা যায়। কলিকাতায় যা ঘটল তা আদিম যুগের বর্বরতার নিদর্শন। হিন্দু মুসলমান কারো পক্ষেই গৌরবের নয়। সবচেয়ে অগৌরবের তখনকার লীগ মন্ত্রিসভার। লর্ড ওয়াভেল বা বাংলার গভর্নর এ বিষয়ে কিছুই করেননি। গুরুতর কর্তব্যচ্যুতি। হয় অযোগ্যতা, নয় তো মনে মনে চাইছিল এরূপ কিছুটা।

কলিকাতার হাঙ্গামার কিছুদিন পরে (অক্টোবর মাসে) আবার তাণ্ডব শুরু হয় মৌলানা মৌলবী প্রভাবান্বিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নোয়াখালী জিলায়। গৃহদাহ, লুঠ, হত্যা, নারী নির্যাতন, জোর করে ধর্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি সবই হয়। বাংলার পর বিহার, বিহারের পর পাঞ্জাব, পাঞ্জাবের পর দিল্লী এ ভাবে সৃষ্টি হল সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের এক দুষ্ট চক্র। সব জায়গারই কিন্তু এক ইতিহাস। সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার। সংখ্যালঘুরা ভয়ে ভীত, অর্ধমৃত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সবাই বীরত্ব দেখিয়েছে যখন তারা সংখ্যায় বেশী। সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেই কাপুরুষ। এর ব্যতিক্রম যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে খুবই কম।

কোন সম্প্রদায়েরই গৌরব করবার কিছু নেই। লজ্জিত হবারই আছে।

জুলাই মাসে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণের পর আগস্ট মাসে বৃটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশে ভাইসরয় কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট জওহরলালজীকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। জিন্না সাহেবের সঙ্গে কথা বলার ভারও তাঁর উপরই দেওয়া হয়। জিন্না সাহেব তথা লীগ এই সরকারে যোগ দিতে রাজী হন না। লীগের কোন সদস্য ভিন্নই ২৪শে আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। স্যার সাফাৎ আহম্মদ খানের নাম ছিল। এর পরেই সিমলাতে ছোরা মেরে তাঁকে গুরুতর ভাবে আহত করা হয়। ২রা সেপ্টেম্বর সদস্যরা আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

ভাইসরয় প্রথম হতেই জওহরলালজীকে শান্তিতে কাজ করতে না দিতেই যেন সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। স্যার সাফাৎ আহম্মদ খান ও রাজাজী ওই তারিখে শপথ গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁদের উপর যে সব কাজের ভার ছিল ভাইসরয় তা নিজ হাতে নিতে চান। এ অদ্ভুত আচরণ কোন প্রকারেই সমর্থন করেন না জওহরলালজী। তাঁর দৃঢ়তায় ভাইসরয় নিরস্ত হন। কিন্তু যে ভাবেই হোক ভাইসরয় লীগকে সরকারে আনতে ব্যস্ত। জওহরলালজীকে ডিঙ্গিয়ে তিনি নিজেই জিন্না সাহেবের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেন এবং ১৫ই অক্টোবর ঘোষণা করেন যে, লীগের সদস্যরা মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে। সেই তালিকার মধ্যে পূর্ব বাংলার তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামও ছিল। সবাই অবাক্। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, লীগের সদস্যরা মন্ত্রিসভায় আসেন একযোগে কাজ করার জন্য নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নীতির একটা অঙ্গ হিসাবে। 'লড়কে ল্যায়েঙ্গে পাকিস্তান' এই হল লীগপন্থীদের কথা। অতএব ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বকে আরো তীব্র করার কাজে লর্ড ওয়াভেলের তথা বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভার একটা মস্ত বড় হাত ছিল। দেশ দ্রুত এগিয়ে চলল

দেশবিভাগের দিকে। লীগ চেয়েছিল তা-ই। সরকার সুযোগ করে দিল। এখানে এ কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, লীগের আদরণীয় বন্ধু শ্রীমণ্ডলকে পরে পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়েছে।

মহাত্মাজীর মত ছিল এ ভাবে কংগ্রেসের আর অন্তর্বর্তী সরকারে থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে মত জওহরলালজী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা গ্রহণ করেননি। মনে হয় এইখানেই হয়েছিল মস্ত বড় ভুল। ওয়ার্কিং কমিটীরও ভুল হয়েছিল এখানে।

লর্ড ওয়াভেলের কাজে মহাত্মাজী অসন্তুষ্ট হন। ২৭শে আগস্ট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে তার করেন ভাইসরয়ের জন্য একজন উপযুক্ত উপদেষ্টা পাঠাতে। নইলে কলিকাতার হত্যা-কাণ্ডের চেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। মিঃ এটলী তখন সে কথায় ততটা মন দেননি। কিন্তু যখন একের পর এক সাম্প্রদায়িক বীভৎস কাণ্ড চলতে লাগল তখন বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লর্ড ওয়াভেলের স্থানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠালেন। তখন ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে।

কলিকাতার বিরাট হত্যাকাণ্ড ও তারপর নোয়াখালীর শোচনীয় ঘটনাবলী মহাত্মাজীকে খুবই বিচলিত করে। বিশেষ করে নোয়াখালীর নারী নির্যাতন। আজীবন হিন্দু-মুসলমান একতাকামী যখন দেখলেন যে জীবন সায়াহ্নে তাঁর সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। ২৮শে অক্টোবর দিল্লী হতে রওনা হলেন বাংলায়। রাস্তায় ট্রেনে ভক্ত দর্শনার্থী জনতার অত্যাচারে অশেষ কষ্ট পেতে হয়। এই মহাত্মা হওয়ার শাস্তি !

দীর্ঘ ছয় বৎসরেরও অধিক কাল পরে নভেম্বর মাসে মীরাটে কংগ্রেস অধিবেশন হবে। আচার্য কৃপালানী নির্বাচিত সভাপতি। কিন্তু মহাত্মাজী কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ না দেওয়া স্থির

করেই নোয়াখালী অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। যানওনি মীরাট কংগ্রেসে।

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান। গত কয়েক বৎসর যাবৎই বাংলা দেশে এলে কলিকাতার নিকটবর্তী এই গঠনমূলক কর্মকেন্দ্রে উঠতেন। এর মুখ্য কর্মকর্তা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। আসার পরের দিন সাক্ষাতের সময় বুঝতে পারি মহাত্মাজীর গভীর মর্মবেদনা। তিনি চিন্তাভারাক্রান্ত। কাজ সহজ নয়, খুবই কঠিন তা উপলব্ধি করছেন। বললেন "আমার অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে এবার।" পাতঞ্জল দর্শনের 'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ' উল্লেখ করে বললেন যে এরূপ অহিংসাই তাঁর কাম্য।

৭৭ বৎসরের বৃদ্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্য। এক মহান্ প্রেরণার বশবর্তী হয়ে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে চললেন। ভালবাসা দিয়ে হৃদয় জয় করার অভিযান। সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িত নির্যাতিতদের প্রাণে সাহস দান। মানুষ কত উচ্চ স্তরে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নোয়াখালী রওনা হতে এক সপ্তাহ দেরী হয়। এর মধ্যে বিহারে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার খবর পান। ভারত সরকার ও বিহার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, লিয়াকৎ সাহেব যান বিহারে। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীও হাঙ্গামার খবর পেয়েই ছুটে যান উপদ্রুত অঞ্চলে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ত অনেক দিন পর্যন্তও নোয়াখালী যাওয়ার কোন সময় হয়নি। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আজাদ, আচার্য কৃপালানী এবং পরে খান আবদুল গফ্ফর খানও আসেন বিহারে। মহাত্মাজীও বিহার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু একজন মুসলমান নেতার কাছ থেকে তখনই তাঁর যাওয়ার প্রয়োজন নেই জানতে পেরেই তিনি সেখানে যান না। তবে তিনি আংশিক উপবাস করা অর্থাৎ ছাগদুগ্ধ না খাওয়া স্থির করেন। যদি বিহার শান্ত না হয় তবে আমরণ উপবাস করবেন জানান। নোয়াখালী থাকতে নভেম্বরের শেষ ভাগে বাবু

রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছ থেকে খবর পান যে বিহারের অবস্থা ক্রমোন্নতির দিকে। এর পর স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেন। দুধ বাদ দেওয়ায় তাঁর শরীর এত দুর্বল হয়েছিল যে প্রায় মৃত্যুর দরজায় পোঁছেছিলেন।

বিহার সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ৬ই নভেম্বর নোয়াখালী রওনা হন। সহকর্মী হিসাবে সঙ্গে যান সতীশবাবু, প্যারীলালজী, ডাঃ সুশীলা নায়ার, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও আরো কয়েকজন কর্মী। পরে ঠক্কর বাপাও আসেন। বাংলা সরকারের একজন মন্ত্রীও মহাত্মাজীর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

মহাত্মাজী নোয়াখালী আসবার পূর্বে আচার্য কৃপালানী সস্ত্রীক কোন কোন উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। কিন্তু কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা সর্বভারতীয় মুসলমান নেতা সেখানে যাননি।

মহাত্মাজীর কাজ মোটেই সহজ হয়নি সেখানে। মুসলমানরা নিজেদের অপকর্মকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করে। আর হিন্দুরা ভয়ে ভীত। তাঁর সৈন্য ও পুলিশ সরিয়ে নেওয়ার এবং পূর্ব বাংলায় সাহসের সঙ্গে থাকবার উপদেশ তাদের মনঃপূত হয়নি। মুসলমানদের কেউ কেউ তাঁর নোয়াখালী না থেকে বিহারে যাওয়া উচিত এ মনোভাবও পোষণ করত। এমনকি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন সেই দলে। লীগ মন্ত্রিসভা বাইরে না দেখালেও ভিতরে ভিতরে বিরোধিতা করেছে তাঁর। এর মধ্যে তাঁকে দৃঢ়চিত্তে কাজ করতে হয়েছে। অবস্থা সম্বন্ধে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আজ আমি নিউম্যানের মত গাইতে পারি :—

'রাত্রি অন্ধকার ঘর বহু দূরে রয়,
জ্যোতির্ময়, সম্মুখেতে নিয়ে চল মোরে।' "

হিন্দু মুসলমান যাতে নোয়াখালীতে শান্তিতে একত্র বসবাস করতে পারে তজ্জন্য তাঁর জীবন পণ। প্রয়োজন হলে জীবনের শেষ দিন

পর্যন্ত সেখানে থাকবার ইচ্ছা। এই বয়সে বাংলা শিখতে আরম্ভ করলেন, যেন বাঙ্গালীর প্রাণ স্পর্শ করতে পারেন। সাংবাদিক শ্রীশৈলেন চ্যাটার্জি তাঁর শিক্ষক। বহু পূর্বে লণ্ডনেও একবার বাংলা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তখনকার শিক্ষক শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

প্রথমে নোয়াখালীতে কিছু কিছু উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং এক শিবিরে সহকর্মীদের সঙ্গে একত্র থাকেন। কিছুদিন পরেই সহকর্মীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে একাকী বা দুই জন করে থাকার নির্দেশ দেন। পুলিশের সাহায্য ভিন্নই একাকী যাতায়াত করতে বলেন যেন হিন্দুদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। প্রতিদিন প্রার্থনা সভার ভিতর দিয়ে ভগবানের উপর নির্ভরতার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আরো বলেন যে, জোর করে ধর্মান্তরিত করা ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে না, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ সিদ্ধ নয়, যে সব মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে ফিরিয়ে পেলে হিন্দু সমাজে তাদের গ্রহণ করা উচিত, ইত্যাদি। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পদব্রজে এমনকি দীর্ঘদিন খালি পায়ে হেঁটে হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে প্রেম, মৈত্রী ও নির্ভীকতার বাণী প্রচার করেন। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেতে তাঁকে অনেক সাঁকো পার হতে হয়। ছোট খালের উপর একখানা বাঁশ বা সুপারি গাছের অংশ হল সাঁকো। এর উপর দিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। নূতন লোকের কাছে এক প্রকার সার্কাসের খেলা বলে মনে হবে। এই বৃদ্ধ বয়সে সাঁকো পার হওয়ার অভ্যাসও করলেন। খাওয়া দাওয়ারও হল পরিবর্তন। স্থানীয় জিনিসের উপরই নির্ভর। নিজের মালিশও নিজেই করছেন অনেক সময়। এ এক কঠোর তপস্যা।

এক দিন যাই দেখা করতে। তখন তাঁর সঙ্গে শুধু শ্রীনির্মলকুমার বসু ও আর এক জন। অবস্থান এক বিধ্বস্ত হিন্দু বাড়ীতে। নানা অসুবিধার মধ্যেও কোন অভিযোগ নেই। একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধি। নোয়াখালীতে তাঁর উপস্থিতি কালেও যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে বলে শুনি তার কিছু কিছু বলি। তিনি বলেন যে, তাঁর

অজানা কিছু নেই, অবস্থা স্বাভাবিক হয়নি, তবে তাঁকে কাজ করে যেতে হবে, ভরসা ভগবান। ফিরে এলাম প্রেরণা নিয়ে।

প্রায় চার মাস নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলায় কাজ করার পর বিহারে যাওয়ার জন্য ডাঃ সৈয়দ মামুদের কাছ থেকে অনুরোধ আসে। এতদিন ভাবছিলেন যে নোয়াখালীর সেবা কাজই বিহারকে প্রভাবান্বিত করবে। এখন বুঝলেন তাঁর সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। মার্চ মাসের (১৯৪৭) প্রথম সপ্তাহে এলেন সেখানে।

বিহারে হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে কয়েকটি জিলায় মুসলমানদের খুন ও জখম করে। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। হতাহতের সংখ্যা নোয়াখালীর চেয়ে অনেক বেশী। নোয়াখালীর মত ব্যাপক না হলেও নারী নির্যাতনও হয়েছিল।

বিহারে গিয়েও ঠিক নোয়াখালীর মত সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে ও সংখ্যালঘুদের প্রাণে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই বিহারেই তিনি প্রথম সত্যাগ্রহ করেন। সেখানকার অবস্থা দেখে দারুন ব্যথিত হন। কেউ কেউ তাঁকে বলে বিহারে যা হয়েছে তা কলিকাতা ও নোয়াখালীর প্রতিক্রিয়া। এটাকে তিনি অপযুক্তি বলে মনে করেন। বলেন, অহিংসায় বিশ্বাসী নয় এরূপ ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কৃতকারীকে আঘাত দেওয়ার মধ্যে বীরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু দুষ্কৃতকারীর স্বধর্মাবলম্বী শুধু এই অপরাধে যদি একজন নির্দোষ লোককে আঘাত করা হয় তবে তার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই, আছে চরম কাপুরুষতা। হিন্দুদের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হতে এবং মুসলমানদেরও সাহসের সঙ্গে বসবাস করতে বলেন। তিনি উপদ্রুত অঞ্চলের হিন্দুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য।

বিহারের ঘটনার পর জিন্না সাহেব লোকজনকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ এক দিকে সব মুসলমান, আর এক দিকে সব হিন্দু। দ্বিজাতিতত্ত্বের এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। মহাত্মাজী এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। জিন্না সাহেবও দ্বিতীয় বার



নোয়াখালীতে গান্ধীজী

এ কথা বলেননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন তা হলে তাঁর পাকিস্তান নবাগতদের চাপে ভেঙ্গে পড়বে।

মহাত্মাজী বাংলা ও বিহার তুই জায়গায়ই জজের দ্বারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার কথা বলেন। বাংলার মন্ত্রিসভা রাজী হয় না, বিহার মন্ত্রিসভা রাজী হয়। বিহার গভর্নর ও ভাইসরয় তদন্তের বিরোধিতা করেন। ফলে তা সম্ভব হয় না।

এদিকে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত এগিয়ে চলে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এমনকি উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা অন্তর্বর্তী সরকারের যৌথ দায়িত্ব মেনে চলেন না। মুসলিম লীগ করাচীতে সংবিধান সভায় যোগ না দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এর পর ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) মিঃ এটলী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজ সরকার ভারত ত্যাগ করে যাবে। কিন্তু যদি পুরাপুরি প্রতিনিধি নিয়ে সংবিধান সভা কাজ না করে তবে যে সব অঞ্চলের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে কাজ করবেন, সেই সব অঞ্চলই থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, এবং বাকী সব অঞ্চল তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হবে।

মুসলিম লীগ সংবিধান সভায় আসছে না এ কথা মিঃ এটলী ভাল করেই জানতেন। অতএব এর সোজা অর্থ হল এই যে, ইংরেজ যাবে কিন্তু ভারত ভাগ করে দিয়ে যাবে। পাকিস্তান হবে।

মহাত্মাজী তখন ত্রিপুরা জিলার হাইমচরে। এই বিবৃতির ফলে পাকিস্তান হবে তা উপলব্ধি করলেন।

মিঃ এটলীর ঘোষণা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা ডাকা হয় ৬ই মার্চ। মহাত্মাজীকে যাওয়ার জন্য তার করেন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আচার্য কৃপালানী। বিহারের কাজ ফেলে যেতে রাজী হন না। ওয়ার্কিং কমিটীও উপলব্ধি করে পাকিস্তান

হবে। মুসলিম লীগ চায়, ইংরেজ সরকারেরও সমর্থন পেছনে। তখন পাঞ্জাবে ভীষণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলছিল। ফৌজ আমদানী করতে হয়। এ অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটী পাঞ্জাব ভাগ করার প্রস্তাব করে। মহাত্মাজী তাতে একটু বিস্মিত হন। এটা তাঁর মতবিরুদ্ধ। ওয়ার্কিং কমিটী জেনে বুঝেই তা করেছিল। কমিটীর মতে ভারত ভাগ হলে অর্থাৎ পাকিস্তান হলে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ অনিবার্য। কোন ভাগই ওয়ার্কিং কমিটী চায়নি। অবস্থার চাপে করতে বাধ্য হয়েছিল।

মার্চ মাসের শেষ ভাগে ভারতে এসে নূতন ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মহাত্মাজী ও জিন্না সাহেবকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করেন। মহাত্মাজী দিল্লী পোঁছেন ৩১শে মার্চ। নোয়াখালী ও বিহারে তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করছিলেন। এখানেও সেই একই ব্রত। ভারত বিভাগ তাঁর মোটেই মনঃপূত নয়, কারণ তাতে সকল ভারতবাসীরই ক্ষতি। তিনি ভাইসরয়ের কাছে প্রস্তাব করেন জিন্না সাহেবকে সরকার গঠন করার ভার দিতে। সেই সরকার ভারতের জনগণের স্বার্থে কাজ করবে। যতদিন তা করবে ততদিন কংগ্রেস সেই সরকারকে সমর্থন দেবে। সরকার জনস্বার্থে কাজ করছে কিনা তার একমাত্র বিচারক হবেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তি হিসাবে। প্রথম ভাইসরয়ের মনে প্রস্তাব সাড়া জাগায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করেন না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীও এ প্রস্তাবকে অবাস্তব মনে করে। তাই মহাত্মাজী একাকী, পরাজিত। কিন্তু নিজমতে অচঞ্চল। চলে এলেন পুনরায় বিহারে। আসবার পূর্বে ভাইসরয়ের অনুরোধে জিন্না সাহেবের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতিতে সই করেন। সেই বিবৃতিতে তাঁরা দাঙ্গা হাঙ্গামার নিন্দা করেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিংসাত্মক কার্যের আশ্রয় নেওয়া অনুচিত বলেন। কিন্তু পাঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের লীগকর্মীরা এর বিপরীত আচরণ করে।

ভাইসরয় ভারতে আসার মাসখানেক পরেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, শান্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে ভারত ভাগ অনিবার্য। বৃটিশ মন্ত্রিসভার সম্মতি নিয়ে জুন মাসে ঘোষণা করলেন যে, ভারত হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চল এই দুই ভাগে বিভক্ত হবে। পাঞ্জাব এবং বাংলাও ওইরূপ ভাবে ভাগ হবে। উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের শ্রীহট্ট জিলায় গণভোট হবে।

এর পর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় মহাত্মাজী স্পষ্টভাবে বলেন যে, ভারত ভাগ মেনে নেওয়া উচিত নয়। তাতে যদি স্বাধীনতা লাভ দশ বৎসর পিছিয়ে যায় তাও ভাল। ওয়ার্কিং কমিটী ভারত ভাগ কল্যাণকর নয় মনে করেও তাতে রাজী হয়। কমিটীর মতে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তা চলতে থাকলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কমিটী এ কথাও ভেবেছিল যে, হয়তো দেশ ভাগ হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শান্তিতে দুই রাষ্ট্র নিজ নিজ উন্নতি সাধন করতে পারবে।

জুন মাসেই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। মহাত্মাজী সেখানে বলেন যে, দেশ ভাগ করা ঠিক নয় এ বিষয়ে তাঁর মত অপরিবর্তিত। তথাপি ওয়ার্কিং কমিটী যখন রাজী হয়েছে তা মেনে নেওয়াই উচিত। মহাত্মাজী এ কথা না বললে ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব গৃহীত হত কিনা সন্দেহ।

ভাইসরয় ও ওয়ার্কিং কমিটী যে ধারণার উপর সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শান্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয়নি, শান্তিতে দুই রাষ্ট্র নিজ নিজ উন্নতি সাধনও করতে পারেনি।

মহাত্মাজী ইংরেজ থাকা কালে দেশ ভাগ করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু হল তা-ই। তার অনিবার্য কুফল ক্রমেই মর্মে মর্মে বুঝছে দুই দেশের জনসাধারণ। ইংরেজ শাসকদের আত্মতুষ্টি হয়েছে কিনা জানি

না, কিন্তু তাঁদের এ কাজ উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই শেষ কামড়ের মত হয়েছে। যা আশঙ্কা করেছিলেন মহাত্মাজী। তবে তিনি এজন্য ইংরেজকে দায়ী করতে চাননি। ভারতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় থাকলে ইংরেজের পক্ষে ভারত ভাগ করা সম্ভবপর হত না। কেউ তা চাইতও না।

মহাত্মাজী বুঝলেন ভারত ভাগ নিশ্চিত। ইংরেজ সরকার, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস তিনই সম্মত। এখন দেশভাগের অপকারিতা কিসে কম হয় সে দিকেই হল তাঁর দৃষ্টি। দুই রাষ্ট্রে যদি সংখ্যালঘুরা শান্তিতে ও সসম্মানে বসবাস করতে পারে তবেই তা সম্ভবপর। তাই সে কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। নোয়াখালী হতে তাঁর সহকর্মীরা সেখানকার অবস্থার অবনতির কথা জানান। কাজেই সেখানে যাওয়ার জন্য ৭ই আগস্ট দিল্লী হতে রওনা হয়ে আসেন সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে। তখন বাংলাদেশ ভাগের ব্যবস্থা হচ্ছে। যদিও সুরাবর্দি সাহেব তখনও সারা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথাপি পশ্চিম বাংলা সম্বন্ধে কোন ব্যাপারে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য নির্বাচিত বর্তমান লেখকের মতই কার্যকরী হবে এরূপই ছিল ব্যবস্থা। মহাত্মাজী আসার পরই যাই তাঁর সঙ্গে সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করতে। "ভারতের অন্য জায়গায় যাই হোক না কেন পশ্চিম বাংলায় যাতে মুসলমানেরা শান্তিতে ও সসম্মানে বাস করতে পারে সেরূপভাবে কাজ করতে হবে তোমাকে" এ কথা বলেন। উত্তরে জানাই "আমি সে ভাবেই কাজ করছি, ভবিষ্যতেও করব।" দ্বিতীয় কথা বলেন "পূর্ব বাংলা সরকারের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগাযোগ রাখবে।" আমি বলি "বাংলা ভাগ যে ভাবেই হোক না কেন তা বৈজ্ঞানিক হতে পারে না, অতএব উভয় অংশের নানা অসুবিধা হবে। তাই উভয় অংশের স্বার্থেই যোগাযোগ রক্ষা করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।" তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশ ভাগ হচ্ছে, কিন্তু বুঝলাম তিনি চান দুই অংশেরই সুখ ও সমৃদ্ধি।

১৯৪৬ সালে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর কলিকাতার অবস্থা তখনো পুরাপুরি স্বাভাবিক হয়নি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বর্তমান। কিছু কিছু ঘটনাও ঘটেছে। মুসলমানদের ভয় স্বাধীনতা লাভের দিন হয়তো হিন্দুদের মধ্যে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তারা কিছু একটা করে বসবে। তাই মুসলমান নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীকে নোয়াখালী যাওয়া স্থগিত রেখে কয়েক দিন কলিকাতা থাকতে অনুরোধ করেন। তিনি তাতে রাজী হন। কারণ তিনি মনে করেন কলিকাতায় শান্তি বজায় থাকলে তার প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। নোয়াখালীর হিন্দুদেরও কল্যাণ হবে।

মহাত্মাজী সুরাবর্দি সাহেবকে তাঁর সঙ্গে এক বাড়ীতে থেকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কাজে সহায়তা করতে অনুরোধ করেন। তিনি তাতে রাজী হন। ১৩ই আগস্ট হতে তাঁরা বেলেঘাটায় এক মুসলমান ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত বাড়ীতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। মহাত্মাজীর এ এক নূতন প্রয়োগ। সাহস, উদারতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এর ফল ভালই হয়েছিল বলে আমার ধারণা। প্রথম দিন একদল লোক সুরাবর্দি সাহেবকে নিয়ে বেশ একটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখায়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১৪ই আগস্ট হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে যে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক প্রীতির অভিব্যক্তি দেখেছি সেরূপ আর জীবনে কখনো দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। মানুষের ভিতরে শুভবুদ্ধি এলে কি হতে পারে তা দেখলাম। কি করে এরূপ হল? এ প্রশ্ন তখনো মনে এসেছিল, এখনো আসে। মহাত্মাজীর প্রভাব অবশ্য ছিল। সরকারী ও বেসরকারী কিছু লোকের প্রচেষ্টাও ছিল। কিন্তু তা সবখানি নয়। মহাত্মাজী বলেছিলেন 'ভগবানের অনুগ্রহ'। সে অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই এরূপ হত না বলে আমারও ধারণা। আজকের দিনে শুধু এই প্রার্থনা, ভগবান হিন্দু মুসলমানের প্রাণে সেরূপ শুভবুদ্ধি দিন এবং তা স্থায়ী করুন। ভারত ও পাকিস্তানের বিভেদ ঘুচে যাক।

স্বাধীনতা দিবসকে মহাত্মাজী এক দিক দিয়ে আনন্দের, অপর দিকে দুঃখের মনে করেন। আনন্দের এই জন্য যে, ইংরেজ চলে গেল ; দুঃখের এই জন্য যে, দেশ ভাগ হল। তিনি ওই দিন মহাদেব দেশাই স্মৃতি দিবস পালন করেন। সকালে এ উপলক্ষ্যে প্রার্থনা ও সমস্ত গীতা পাঠ হয়। সারাদিন উপবাস করেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল প্রার্থনা ও সূতা কাটা। রেডিও বক্তৃতা দিতে বা কোন বাণী দিতে অস্বীকার করেন।

সারা শহরে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক প্রীতির কথা জানাই এবং অনুরোধ করি দেখতে যেতে। সানন্দে রাজী হন এবং বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে দেখাই।

কিন্তু এই সময় সমগ্র পাঞ্জাবে ভীষণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয়। কি পূর্ব কি পশ্চিম উভয় পাঞ্জাবেই চরম অমানুষিকতা ও বর্বরতার অনুষ্ঠান হয়। এমনটি ভারত ইতিহাসে পূর্বে কখনো ঘটেনি। ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ হতে হিন্দু শিখ চলে আসতে বাধ্য হয়। সিন্ধুদেশ হতেও অধিকাংশ হিন্দু শিখ চলে আসে। আবার পূর্ব পাঞ্জাব হতেও সমস্ত মুসলমান চলে যেতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপার আধুনিক ভারত ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। কংগ্রেস, লীগ ও ইংরেজ সরকারের সম্মতি নিয়ে দেশ ভাগ হল। দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচারের আশ্বাসও দিলেন। তবু স্বাধীনতা লাভের সূচনা হল এই নৃশংসতা দিয়ে। এর চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারত না।

এ সব খবর যত আসতে থাকে মহাত্মাজী তত চিন্তিত ও ব্যথিত হন। পাঞ্জাব যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে জওহরলালজীর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। এদিকে এই কারণে কলিকাতার আবহাওয়াও গরম হতে থাকে।

আর একটা ঘটনা ঘটে সে সময়ে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সীমানা নির্ধারণ কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ র‍্যাডক্লিফ স্বাধীনতা

লাভের দুই দিন পরেই রায় ঘোষণা করেন। এই নিয়ে উভয় বাংলায় অসন্তোষ বেশ খানিকটা হয়। ১৫ই আগস্ট খুলনা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় পতাকা আর মুর্শিদাবাদ ও মালদহে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলিত হয়। এই রায়ের ফলে দুই দিন পরে তা পরিবর্তন করতে হল। খুবই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। একবার আগুন জ্বললে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। তাই পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমি যুক্ত বিবৃতি দিয়ে সকলকে র‍্যাডক্লিফ রায় মেনে নিতে বলি। আরো বলি দুই পক্ষের সম্মতি নিয়ে যে কোন সময়ে এর পরিবর্তন সম্ভব। তৎকালীন ভারত সরকারের কোন কোন মন্ত্রী এ বিবৃতি অপছন্দ করেন। কিন্তু মহাত্মাজী এ বিবৃতিকে বিজ্ঞজনোচিত কাজ বলেই স্বাগত জানান। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সব জায়গার কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়নি।

১৫ই আগস্টের পর সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য এবং পুলিশ বা সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত শান্তি বজায় রাখবার জন্য চলল তাঁর প্রচেষ্টা। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রার্থনা সভা করতেন ও ভাষণ দিতেন। ক্রমেই তাঁর প্রতিদিনকার প্রার্থনা সভায় অধিক সংখ্যক লোক উপস্থিত হত। ১৮ই আগস্ট ময়দানে বৈকালে ঈদের জমায়েতে পাঁচ লক্ষ লোকের (অবশ্য অধিকাংশই মুসলমান) সভায় ভাষণ দেন। প্রয়োজন মত শহরের উপকণ্ঠে ব্যারাকপুর, কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি স্থানেও তিনি গিয়েছেন। কি কঠোর পরিশ্রমই না করতেন।

দু' এক জায়গায় মসজিদের সামনে বাজনা, গো-কোরবানি ও বাদ্যভাণ্ড সহ হিন্দুদের পূজা ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। যত দিন পর্যন্ত দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী একত্র হয়ে কিছু স্থির না করেন ততদিন পর্যন্ত ইংরেজ আমলে যে প্রথা চলছিল তাই মেনে চলা উচিত এই ছিল তাঁর উপদেশ। দুই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস ও লীগের

সভাপতি একত্র হয়েও সেইরূপ সিদ্ধান্ত করেন ও তা কাজে পরিণত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ফল সন্তোষজনক হয়।

মহাত্মাজীর এই সব কাজের প্রভাব সারা বাংলা দেশের উপর এমনকি বিহারেও পড়ে। কিন্তু পাঞ্জাবের শোচনীয় ঘটনা সমূহের খবর যত আসতে থাকে ততই কলিকাতায়ও একটা উত্তেজনা দেখা দেয়।

মহাত্মাজী পাঞ্জাব যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জওহরলালজী ও সর্দার প্রথম নিজেরাই চেষ্টা করতে চান, পরে প্রয়োজন হলে তাঁকে যেতে বলবেন এরূপ ইচ্ছা ছিল। আর উন্মত্ত নিষ্ঠুর জনতার সামনে মহাত্মাজীকে ছেড়ে দিতেও তাঁদের ভয় ছিল। শেষে যখন জওহরলালজী তাঁকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন তখন ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে, কলিকাতায়ও কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। তখন মহাত্মাজী কলিকাতা ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব মনে করেন। পূর্বে জওহরলালজীর আহ্বান এলে মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে পাঞ্জাবের অবস্থার উন্নতি হত না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে!

কলিকাতায় এক দল লোক ভাবল পাঞ্জাবের প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু তার প্রধান প্রতিবন্ধক মহাত্মাজী। অতএব ৩১শে আগস্ট রাত্রিতে এক দল লোক বেলেঘাটায় মহাত্মাজীর বাসস্থানের সামনে গিয়ে চীৎকার, জানালার কাচ ভাঙ্গা ইত্যাদি আরম্ভ করে। তাঁর আবেদনে মোটেই কর্ণপাত করে না। এমনকি একটি লাঠি ও ইটের টুকরা ছুঁড়ে মারে তাঁকে লক্ষ্য করে। সৌভাগ্যক্রমে কোনটাই তাঁর গায়ে লাগে না। তার পরের দিন নোয়াখালী যাওয়ার কথা ছিল। তা বন্ধ হল। আর কখনো সেখানে যাওয়া হয়নি।

১৫ আগস্ট যে সম্প্রীতির অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল, প্রমাণিত হল সেটা অনেকটা ভাবপ্রবণতা, অন্তরের গভীর প্রীতি নয়। এরূপ অবস্থায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য উপবাস করার সংকল্প করেন। সম্প্রীতি ফিরে

এলে উপবাস ভঙ্গ করবেন। ১লা সেপ্টেম্বর রাত সোয়া আটটার পর উপবাস আরম্ভ হল। এই উপবাসের ফল হল অদ্ভুত। বেলেঘাটার যে সব যুবক তাঁর বাসস্থানে উপদ্রব করেছিল তারা এসে অনুশোচনা প্রকাশ করে। বহু যুবক নানা প্রকারের মারাত্মক অস্ত্র তাঁর কাছে জমা দেয়। সরকারও ঘোষণা করে যে, একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে অস্ত্র জমা দিলে তাদের এই অস্ত্র রাখার অপরাধে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে ৭৩ ঘণ্টা পরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি সোয়া নটায় উপবাস ভঙ্গ করেন। এর পূর্বের চব্বিশ ঘণ্টা কলিকাতা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। সে সময় পশ্চিম বাংলার নেতাদের সঙ্গে গবর্নর রাজাজী ও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট কৃপালানীজীও সম্প্রাতি ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পুনরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু হলে মহাত্মাজী শান্তিসেনাদের উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়ে জীবনের কোন পরোয়া না করে কাজ করতে উপদেশ দেন। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে দেশপ্রেমিক উচ্চশিক্ষিত যুবক শ্রীশচীন মিত্র মৃত্যু বরণ করেন। মহাত্মাজী তাঁর স্ত্রী অংশুরাণীর কাছে চিঠিতে 'শচীন অমর হয়েছে' লেখেন। তারপর আরও তিন জন যুবক (স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর ঘোষ ও সুশীল দাশগুপ্ত) নিজেদের জীবন বিসর্জন দেন। মহাত্মাজী এঁদের আত্মত্যাগের কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এঁদের এই মৃত্যু মহৎ দৃষ্টান্ত রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রদ্ধা জানাই এই মহাপ্রাণদের। ছাত্র-সমাজ তখন যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেছিল তা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি।

উপবাস ভঙ্গের মাত্র দুই দিন পরে ৭ই সেপ্টেম্বর দুর্বল শরীরেই পাঞ্জাব যাওয়ার জন্য দিল্লী রওনা হয়ে যান।

জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তিনি কলিকাতায় প্রায় এক মাস থেকে যে ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করে গেলেন তা

কখনো ভুলবার নয়। বাংলার হিন্দু মুসলমান এজন্য তাঁর কাছে চিরঋণী। তাঁর আদর্শ সবাইকে অনুপ্রাণিত করুক!

৯ই সেপ্টেম্বর সকালে দিল্লী পৌঁছেই সেখানকার শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝতে পারলেন। ভাঙ্গী কলোনীতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়নি, ব্যবস্থা হয়েছে বিড়লা নিবাসে। কারণ ভাঙ্গী কলোনীতে শরণার্থীর ভিড়। দিল্লীর সবজী মণ্ডীতে দুর্ঘটনার জন্য এমনকি বিড়লা নিবাসেও সবজী এবং ফলের অভাব। পুলিশ ও সৈন্য সহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে বটে, কিন্তু সে শান্তি মৃতের শান্তি। দিল্লীর এ অবস্থায় পাঞ্জাব গিয়ে কোন ফল হবে না তাই সেখানে যাওয়া স্থগিত করলেন।

হাজারে হাজারে হিন্দু শিখ শরণার্থী এসেছে পশ্চিম পাঞ্জাব হতে দিল্লীতে। তারা উত্তেজিত। মুসলমানদের ভীতির কারণ। দিল্লীতে হিন্দু শিখ শরণার্থী শিবির, আবার মুসলমান শরণাথা শিবির। তিনি দুই জায়গায়ই গিয়ে তাদের সাহস দিতে, তাদের দুঃখ লাঘব করতে চেষ্টা করেন। দুই রাষ্ট্রেরই প্রধানরা সংখ্যালঘুদের শান্তিতে ও সসম্মানে বসবাস করতে পারার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তবু এরূপ হল। এ তাঁদের পক্ষে গভীর লজ্জার কারণ। শুধু তাই নয়, মহাত্মাজীর মতে পাকিস্তানে ইসলাম ও ভারতে হিন্দুধর্মের শেষ। শরণার্থী শিবিরের অব্যবস্থাও তাঁকে ব্যথিত করে।

তিনি দিল্লীতেও নোয়াখালীর মত 'হয় করব, না হয় মরব' এই পণ করে কাজ আরম্ভ করেন। শরণার্থীদের জন্য কম্বল, কাপড় ইত্যাদির জন্য আবেদন করেন। সে আবেদনে সাড়া পড়ে এবং সকল সম্প্রদায়ের দুঃস্থদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। অপর দিকে জিন্না সাহেব মুসলিম শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য আবেগপূর্ণ আবেদন করেন, কিন্তু পাকিস্তানে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হিন্দু শিখদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন না। এ জন্য ছিল মহাত্মাজীর মনে দুঃখ।

২রা অক্টোবর তাঁর জন্মদিনে অনেকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "দেশের এ অবস্থায় আমার অভিনন্দনের কি আছে! মৃত্যুর পরের শোক প্রস্তাব করার কথা হতে পারে।" কি দারুন ব্যথা তাঁর প্রাণে!

দিল্লীর কাজ কলিকাতার চেয়েও কষ্টসাধ্য ছিল তা তিনি প্রথম হতেই বুঝেছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর শরণার্থী শিবিরে তাঁর একটা প্রার্থনা সভা বন্ধ করতে হয়েছিল। এক দল শিখ শরণার্থী কোরান হতে আবৃত্তি করার জন্য হৈ চৈ আরম্ভ করে। কোরান হতে আবৃত্তি করা নিয়ে আপত্তি অবশ্য এই প্রথম নয়। নোয়াখালীতেও কোন কোন মুসলমান অমুসলমানের কোরান হতে আবৃত্তির ও তার ব্যাখ্যা করার প্রতিবাদ করেছে কিন্তু ব্যাপার এত দূর গড়ায়নি। এর পরেও দিল্লীতে এ নিয়ে আপত্তি হয়েছে। প্রার্থনা বিষয়ে মহাত্মাজীর মত ছিল সুস্পষ্ট। তিনি কারো উপর প্রার্থনা বা কোন জিনিস আবৃত্তি করা চাপিয়ে দিতে চাননি। তবে তিনি বা তাঁর মতাবলম্বীরা কি প্রার্থনা করবেন সে নির্দেশ দেওয়ার অধিকারও অন্য কারো আছে বলে মনে করতেন না। যার ভাল না লাগে তিনি সভায় না আসতে পারেন অথবা তার মতে যা আপত্তিকর তা আবৃত্তি না করতে পারেন। তথাপি তিনি বলেছিলেন যে, একজন লোক আপত্তি করলেও প্রার্থনা হবে না। কখনো কখনো সভায় দুজন একজন লোকও আপত্তি করেছে এবং প্রার্থনা বন্ধ হয়েছে। বলিহারি এসব লোকদের বুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞান!

দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে যায়নি। তাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের দ্বার খোলা ছিল। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু, কিন্তু অধিকাংশ প্রজা মুসলমান। মহারাজা ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি। তাই পাকিস্তানের ইঙ্গিতে উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশের সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলের

হানাদাররা অক্টোবর মাসে কাশ্মীর আক্রমণ করে। উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবদুল কায়ুম খান হানাদারদের প্রকাশ্যভাবে উৎসাহ দেন এবং সমস্ত ইসলাম দুনিয়ার কাছে আবেদন করেন এদের সাহায্য করতে। এর দশ বৎসর পূর্বে ওই প্রদেশে ভ্রমণের সময় কায়ুম সাহেবকে আবদুল গফ্‌ফর খান সাহেবের সহকর্মীরূপে দেখেছি। তিনি শুধু এ কাজ করেননি, গফ্‌ফর খান সাহেবকে কারারুদ্ধও করেন। জিন্না সাহেব তখন পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল, তাঁর সম্মতি ভিন্ন কায়ুম সাহেব এসব কিছুই করতে পারতেন না। হানাদারদের আক্রমণের পেছনে ছিল পাকিস্তান সরকার। পাকিস্তান শুধু পেট্রোল ইত্যাদি সরবরাহ করেনি, কিছু পাকিস্তানী সৈন্যও ছিল এ সঙ্গে।

আরও দুঃখের ও লজ্জার কথা এই যে, হানাদারদের পরিচালনা করেন আজাদ হিন্দ ফৌজের দুই জন প্রাক্তন অফিসার।

কাশ্মীরের মহারাজা ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত না হলে তা করা সম্ভব নয় ভারত সরকার এ কথা জানান। তখন মহারাজা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দলিলে সই করেন এবং জনগণের প্রতিনিধি ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লা সাহেবকে মুক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী করেন। শেখ সাহেবও অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করেন। অতএব রাজা ও জনগণ দুইয়ের ইচ্ছানুসারে হল এই অন্তর্ভুক্তি। এইজন্যই মহাত্মাজী তা সমর্থন করেন। এর পর ভারত সরকার কাশ্মীর রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠায়। মহাত্মাজী সৈন্য পাঠানো অনুমোদন করেন। সরকার যদি সৈন্য রাখে তবে প্রয়োজন মত তাদের কাজেও লাগাতে হবে। যদি পুরা অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে ভারত সরকার সৈন্য মোটে না রাখত তবে সরকারের অহিংস প্রয়োগের কথা উঠতে পারত।

এ সব সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরে পৌঁছবার পূর্বেই হানাদাররা তা দখল করত যদি না তারা লুঠের জন্য ব্যস্ত হত। ওই

উপজাতীয়দের লুঠের স্পৃহা খুব বেশী। তা-ই এ যাত্রায় রক্ষা করেছে কাশ্মীরকে।

হানাদাররা কাশ্মীরে হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপরই অত্যাচার করেছে। দুই সম্প্রদায়ের মেয়েদের নির্যাতন করেছে।

হানাদারদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল কনফারেন্সের ভলান্টিয়ারও যথেষ্ট কাজ করে। বারামুলায় মীর মকবুল সেরওয়ানী সাহেবের সাহস ও আত্মত্যাগ কাশ্মীরের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। বারামুলায় প্রতিরোধের নেতৃত্ব করেন তিনি। তিনি গ্রেপ্তার হন। হানাদাররা তাঁকে আজাদ কাশ্মীর সরকারের অনুগত হতে বলে। অস্বীকার করলে একটি খুঁটিতে তাঁর দুই হাতে পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়, তারপর তাঁর শরীর চোদ্দটি গুলি দ্বারা বিদ্ধ করা হয় এবং নানাভাবে তাঁর শরীর বিকৃত করে। তিনি হানাদারদের বলেছিলেন যে, তাদের জয় সাময়িক, ভারতীয় সৈন্যরা পুনরায় বারামুলা অধিকার করবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়। মহাত্মাজী সেরওয়ানী সাহেবের আত্মদান সকলের গৌরবের প্রার্থনা সভায় এ কথা বলেন।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। ব্রিগেডিয়ার ওসমান কাশ্মীর রক্ষায় জীবন দান করে প্রমাণ করে গেলেন হিন্দু মুসলমান পৃথক্ জাতি নয়।

সাম্প্রদায়িক তিক্ততা, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শত্রুতা ভাব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জওহরলালজী ও সর্দারের মধ্যে অমিল, এই মন্ত্রি-সভার আচরণে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কৃপালানীজীর অসন্তোষ, খাদ্য সমস্যা, খাদ্য বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে মহাত্মাজী এ সময় খুব চিন্তিত।

তিনি বোধ করছেন এবং প্রকাশ্যে বলছেন যে, তাঁর কথার আর পূর্বের মত শক্তি নেই। মনে মনে ভাবছেন তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে। আর ১২৫ বৎসর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা নেই।

দেশে ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগে বেশ খাদ্যসংকট। সে সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল এই যে, দেশে যে সামান্য পরিমাণ খাদ্যের অভাব, একটু চেষ্টা করলেই সে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। অধিকতর চেষ্টা করে যে অঞ্চলে যে ফসল জন্মানো সম্ভব তার উপরই লোক-জনদের নির্ভর করতে বলেন। অবশ্য তাঁর বলার অর্থ এই ছিল না যে, খাদ্যাভাব ঘটলে কোন দেশ যদি স্বেচ্ছায় কিছু খাদ্য দিতে চায় তা গ্রহণ করা হবে না। তিনি খাদ্য ভিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা অনবরত খাদ্য ভিক্ষা করছি। মহাত্মাজী এ জিনিস মোটেই পছন্দ করতেন না। তবে কেন তা করতে হচ্ছে? সরকারের পরিকল্পনার ত্রুটী কোথায়, তাকে কার্যে রূপায়ণে ত্রুটী কোথায় এবং জনগণের ত্রুটী কোথায় এ সমস্ত বিশেষভাবে অনুধাবন করে পথ নির্দেশ দরকার, যেন দেশকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করা যায়। তা ছিল মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য এবং তা সম্ভবপর।

তিনি খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক অবস্থা বানচাল করে দেয়। শুধু তাই নয়, ফলে দেখা দেয় দুর্নীতি। ক্রমে দেশকে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেয়। তখন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের খাদ্যমন্ত্রী। মহাত্মাজী তাঁকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়ে দিতে এবং দেশকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন।

যতদিন পর্যন্ত শুধু প্রদেশে মন্ত্রিসভা ছিল ততদিন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করত। সেই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন সর্দার বল্লভভাই, সভ্য মৌলানা আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। এঁরা সবাই হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজী পূর্বে কয়েক বার কংগ্রেস সভাপতি হয়েছেন। এঁরা হয়ে গেলেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। নূতন কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করার কথা ভাবতেই পারেননি। অথচ দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, কংগ্রেস সভাপতি কিছুই জানতে পারবেন না

এ জিনিস অসহ্য হয়ে উঠল আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন কৃপালানীজীর কাছে। তাই নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে মহাত্মাজীর মত নিয়ে কৃপালানীজী পদত্যাগ করেন। মহাত্মাজী আচার্য নরেন্দ্র দেবকে সভাপতি করার কথা বলেন। মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সভ্যদের তা মনঃপূত হয়নি। তাঁদের অনুরোধে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি হন। মহাত্মাজীর সম্মতি পাবেন না বুঝে রাজেন্দ্রবাবু তাঁর অনুমতি চাইতেও যাননি। এই প্রথম রাজেন্দ্রবাবুর এরূপ কাজ। মহাত্মাজী এমনটি প্রত্যাশা করেননি, কাজেই বেশ মর্মাহত হন।

রাজেন্দ্রবাবু ও সর্দারকে মহাত্মাজী মনে করতেন তাঁর নিতান্ত অনুগামী ও বিশ্বস্ত সহকর্মী। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তিনি বুঝেছিলেন যে সর্দার আর তাঁর কথার সে মূল্য দেন না। তিনি তা প্রার্থনা সভায় বলেনও।

এদিকে সর্দার ও জওহরলালজীর মধ্যে বিরোধ। সর্দার মনে করতেন জওহরলালজী তাঁকে বিশ্বাস করেন না। জওহরলালজী নিজে ভাল লোক হলেও কুপরামর্শদাতাদের দ্বারা পরিবৃত এবং প্রভাবান্বিত এই ছিল তাঁর ধারণা। জওহরলালজীও সর্দারের অনেক কাজে ও উক্তিতে বিব্রত বোধ করতেন। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের লোকদের 'দেশপ্রেমিক' বলে সর্দারের উক্তি আমাদের অনেকের কাছেই খুব খারাপ লেগেছিল। পরে এ বিষয়ে সর্দার মত বদলান, অবশ্য দেরীতে। মৌলানা সর্দারের মধ্যেও ছিল পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। এই সবই মহাত্মাজীকে খুব ব্যথিত ও চিন্তিত করে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেন বিরোধের অবসান ঘটাতে।

কংগ্রেসের ভিতরে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি এবং ক্ষমতা বা সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কাড়াকাড়ি, উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে নভেম্বর মাসের নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর তিনি প্রস্তাব করেন যে, পচন আর বেশী

দূর ছড়িয়ে পড়বার পূর্বেই কংগ্রেস ভেঙ্গে দেওয়া উচিত, কারণ জোড়াতালি দিয়ে কিছু হবে না। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাবিলুপ্তি দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশুদ্ধ করবে। কিন্তু সে উপদেশ গ্রহণ করার মনোবৃত্তি কংগ্রেস প্রধানদের ছিল না।

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে দিল্লীর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে যদি মুসলমানরা নিরাপদে ও সসম্মানে বসবাস করতে না পারে তবে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের সাধনা নিরর্থক হবে। অথচ অবস্থার কোন সুষ্ঠু প্রতিকার মহাত্মাজীর চেষ্টায় হচ্ছে না। অবশেষে ১৩ই জানুয়ারী হতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য উপবাস করা স্থির করেন। মুসলমানরা দিল্লীতে নিরাপদে থাকতে পারবে এরূপ প্রতিশ্রুতি পেলে এবং তা সন্তোষজনক বুঝলে তিনি উপবাস ভঙ্গ করবেন। হিন্দু মুসলমান শিখ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয়দের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ১৮ তারিখে উপবাস ভঙ্গ করেন।

ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার সময়কার সম্পত্তির অংশ হিসাবে পাকিস্তানের ৫৫ কোটি টাকা পাওনা ছিল। দুই রাষ্ট্র ঐক্যমত হয়েই পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কিন্তু কাশ্মীরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এই টাকা দেওয়া স্থগিত রাখা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ মীমাংসা হলে টাকা দেওয়া হবে ভারতের মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত করে। মহাত্মাজীর মত ছিল এ বিষয়ে উদার হলে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মীমাংসা সহজ হবে। তিনি এ বিষয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর মতে এই টাকা না দেওয়া হবে "স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম গর্হিত কাজ"। এই মতও মহাত্মাজীকে প্রভাবান্বিত করে। তিনি উপবাসের দরুন শায়িত। এই অবস্থায় দ্বিতীয় দিনে তাঁর শয্যাপার্শ্বে ভারত মন্ত্রিসভা বৈঠক করে ওই টাকা দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেবিনেটের পক্ষে পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন একটা মস্ত বড় কাজ। এর প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানে যেমন ভাল হয়, ঠিক তেমনি বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় এক দল সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুর মনে। মহারাষ্ট্রের এক দল লোক ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এদের কেউ কেউ পূর্বেও ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের ক্রীড়নক হয়ে মদনলাল নামে একজন পাঞ্জাবী শরণার্থী ২০শে জানুয়ারী মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় তাঁকে মারবার জন্য বোমা ফেলে। তাঁর কোন আঘাত লাগে না। মদনলাল গ্রেপ্তার হয়। গ্রেপ্তারের কথা শুনে মহাত্মাজী বলেন তার উপর যেন কোন অত্যাচার করা না হয়।

এই ঘটনার পরই বোম্বের রুইয়া কলেজের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র জৈন মদনলাল ও মহারাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রকারীদের সম্বন্ধে যতটা খবর জানতেন তা বোম্বের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেন। বোম্বের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে খবর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলকে জানান। কেউ কেউ মনে করেন উপরোক্ত খবর পাওয়ার পর এই দুই মন্ত্রী বিশেষ করে সর্দার প্যাটেল যদি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতেন তা হলে হয়ত মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা পেত। নাথুরাম গডসে প্রভৃতির প্রথম বিচারক সেসন জজ এরূপ মন্তব্য করেন, অবশ্য হাইকোর্টের আপীল জজ সেরূপ মনে করেননি।

উপবাস ভঙ্গের পরও দেশের অবস্থায় তিনি খুব বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন। কংগ্রেস প্রধানদের মধ্যে জাঁকজমক স্পৃহা, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে সেবা ভাবের চেয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ২৬শে জানুয়ারী সাক্ষাতের সময় উপলব্ধি করি তাঁর মনের গভীর দুঃখ। তিনি সেদিন এ কথা বলেছিলেন 'এই কি তাঁর ও কংগ্রেসের স্বপ্নের স্বাধীনতা!'

৩০শে জানুয়ারী সকালে তিনি কংগ্রেসকে 'লোকসেবক সঙ্ঘে' রূপান্তরিত করার প্রস্তাবের মুসাবিদা সেক্রেটারী প্যারীলালজীর হাতে দেন। এই তাঁর শেষ দলিল।

সেই দিনই বিড়লা নিবাসের প্রাঙ্গণে সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় যাওয়ার

সময় নাথুরাম গডসে তিন বার পিস্তলের গুলী করে মহাত্মাজীকে। 'হে রাম' বলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ভারতের ও বাইরের কোটি কোটি লোক শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু দুঃখের ও লজ্জার কথা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভার এক দল উল্লসিত। সংবাদ পাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে। দেখলাম সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে কত নিম্নস্তরে নামাতে পারে। তাকে রুখবার জন্য জীবন দিয়ে গেলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। হল মহাবিসর্জন।

উপসংহার

অবসান হল এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত দীর্ঘ কর্মময় জীবন। সমস্ত পৃথিবীকে দিয়ে গেলেন এক পথের সন্ধান। দরিদ্র ভারতবাসীরও যে কিছু দান করবার আছে তা বুঝল পৃথিবী। জাতি বর্ণ ধর্ম দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ছিল তাঁর প্রেম ও ভালবাসা। ভারতকে সে আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তার ভিতর দিয়েই চেয়েছিলেন ভারত আত্মার পূর্ণ বিকাশ। সে কাজেই দিলেন জীবন আহুতি। সার্থক হোক তাঁর স্বপ্ন!

মানব প্রকৃতি বাস্তবে এক। তা উপলব্ধি করার মধ্যেই নিহিত জগতের কল্যাণ। তাঁর জীবন সে অনাগতের বংশীধ্বনি।

সমাপ্ত

২৪১ পৃষ্ঠায় উপর থেকে একাদশ লাইনে ৩৫ বৎসরের জায়গায় ২৫ বৎসর হবে।

এই গ্রন্থের লেখক ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ভারতের জনজীবনে সুপরিচিত। রাজনীতি ও গঠনমূলক কর্ম এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর দান অসামান্য। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের ডক্টরেট। তাঁর জীবনারম্ভ হয় সরকারী কর্মে, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপনায়। তারপর টাঁক-শালের ডেপুটি অ্যাসে-মাস্টার নিযুক্ত হন। এই উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়ের নিয়োগ এই প্রথম। কিন্তু সরকারী চাকুরীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই মানুষটিকে বেশীদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাতে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি এই উচ্চ পদের সরকারী কর্ম ত্যাগ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কালক্রমে আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা-গুণে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অন্যতম রূপে পরিগণিত হন। দেশসেবার পুরস্কার রূপে একাধিক বার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। মুখ্যমন্ত্রী রূপে তাঁর স্বল্পকালীন স্থিতির মধ্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রশক্তি ও সদ্বুদ্ধির দ্বারা বাংলার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ডক্টর ঘোষ বহু গঠনমূলক সংস্থার সহিত জড়িত। বিভিন্ন সময়ে তিনি হরিজন সেবক সঙ্ঘ, অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, কস্তুরবা ট্রাস্ট, গান্ধী স্মারক নিধি প্রভৃতি সর্বভারতীয় গান্ধী-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যুক্ত ছিলেন। বাংলা দেশের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি বিক্রমপুর মালিকান্দা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও কুমিল্লা অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বয়স ৭২, কিন্তু এই বয়সেও কর্মোৎসাহ অটুট আছে। বর্তমানে মেদিনীপুর জিলার বাড়বাসুদেবপুর গ্রামে বাস করছেন। সেখানকার লোকসেবা পরিষদের তিনি প্রেসিডেণ্ট।

ব্যক্তিগত জীবনে নিরহঙ্কার অমায়িক অনাড়ম্বর। আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ ও চরিত্রবত্তার দিক থেকে বর্তমান বাংলায় দলমত নির্বিশেষে সর্বজনমান্য কোন নেতা থেকে থাকেন তো তিনি ডক্টর ঘোষ। বাংলা দেশে তিনি গান্ধী-ভাবধারার শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন।